সেরা দুই

সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ · সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

লেজার টাইপসেটিং :
কম্প-অ্যাক্ট
সিজি-৮০, সল্টলেক সিটি
কলিকাতা-৭০০ ০৯১

উৎসর্গ

স্নেহের সানায়া (ঝুম ঝুম)
কে

সে এবং তাহারা

পিয়ারী.... পিয়ারী..... এই পিয়ারী

বাসন্তী.... বাসন্তী..... হারামজাদি..... এই বাসন্তী,

উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন কণকলতা। ভালো করে রাতের অন্ধকার কাটার আগেই গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। ফিরেছেনও অন্যদিনের চেয়ে আগে। বাড়ির দুখানা ঘোড়ার গাড়ির একখানা অন্ধকার থাকতে থাকতেই সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কণকলতা নীচে নামার আগেই পিয়ারী ছ'সাতটা বড় বড় পেতলের ঘড়া গাড়ির ছাদে তুলে দেয়। দক্ষ ঝি কাচা মটকার একখানা থান আর গামছা এনে গাড়ির ভেতরে রেখে যায়।

কণকলতা স্নান সেরে ফেরার সময় রোদ উঠে পড়ে। গাড়ির ছাদে গঙ্গা জল ভর্তি পেতলের ঘড়ার গায়ে সেই রোদ্দুরের আলো পড়লে ঘড়াগুলোকে সোনার ঘড়া বলে ভ্রম হয়।

চলন্ত গাড়ির ছাদে বসে থাকা পিয়ারী গুণ গুণ করে আপন মনে গান করে — জয় সীয়ারাম, জয় সীয়ারাম। তুমি ইচ্ছে করলেই পেতলের ঘড়াগুলোকে সোনার বানিয়ে দিতে পারো। আবার সোনার ঘড়া তোমার ইচ্ছেতেই পেতলের ঘড়া হয়ে যেতে পারে।

পিয়ারী আর সুখনন্দন যখন এবাড়িতে এসে প্রথম ঢুকেছিল তখন তাদের বয়েস আট-নয়-এর বেশি নয়। একেবারে হাবাগোবা দুই কিশোর। ভাষা বোঝে না, ইশারা বোঝে না। মাথা ওল করে কামানো। মস্তবড় একটা টিকি মাথার পেছনে। গায়ে চিট ময়লা ধুতি আর গেঞ্জি।

উঠোনে আঁশ [illegible] নিরমিষ রান্নাঘরের মাঝামাঝি ভারী সেগুন কাঠের তৈরী জলচৌকির ও[illegible]বরে বসেছিলেন কণকলতা।

বাড়ির মুহুরী দী[illegible] সঙ্গে করে তাদের দুজনকে এনে কণকলতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, সেজবাবু ভাঁটা থেকে এদুজনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরা এখানেই থাকবে। কাল কলেরায় এদের মা-বাপ দুজনাই একসঙ্গে মারা গিয়েছে।

এক পলকের জন্যে কণকলতার দুচোখের ওপর মমতার ছায়া ভেসে এসেছিল। পরক্ষণে তিনি গলা তুলে ডেকেছিলেন—দক্ষ-দক্ষ কোথায় গেলি—

দক্ষ বড় বৌ অলকানন্দার ঘরের বিছানা তুলছিল। সেখানে হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে এসেছিল দক্ষ, কি বলছো —?

এই ভূত দুটোকে কুয়োতলায় নিয়ে যা। ভালো করে নুরো দিয়ে গা ঘসতে বলবি নইলে ছিরি ফিরবে না। গায়ের গন্ধে ভূত পালায়।

আচ্ছা বলে সেখান থেকে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আঁশ রান্নাঘরে এসে সেজবৌ মেজবৌ-এর সামনে হেসে কুটি কুটি হয়েছিল দক্ষ ঝি।

আ মর, হেসেই মরবি নাকি, সেজবৌ তাড়া দিয়েছিল। কি হয়েছে বলবি তো?

দক্ষ হাসি থামিয়ে বলেছিল, তোমার শাশুড়ির ভিমরতি হতে আর বাকি নেই। ওই দুই মিনসেকে কুয়োতলায় নিয়ে গিয়ে আমায় বলল চান করাতে। ওরা যেন আঁতুড়ে শিশু, আমি বাপু পারবো না।

এবার হাসির বদলে দক্ষর মুখে সত্যিকারের ভয় ফুটেছিল।

মেজবৌ বলেছিল, তুই দিনদিন ন্যাকা হচ্ছিস দক্ষদি। ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গিতে কাপড় কাচা সাবান আছে, তাই একটুকরো নিয়ে ওদের দেগা যা। কুয়োতলায় ওরা নিজেরাই চান করে নেবে।

এ সব কুড়ি বাইশ বছর আগের ঘটনা।

পিয়ারী শুকনন্দন দুজনাই জাতে মুচি। তাদের হাতের জল চলবে না। তা জানার পরেও কণকলতা বলেছিলেন হোগ্‌গে মুচি। গোবিন্দর পেসাদ খাইয়ে আমি ওদের সুদ্ধ করে নেব।

দক্ষ.... দক্ষ.... তুই মর..... মর..... হারামজাদি—বাসন্তী..... এই বাসন্তী মুখপুরী.....

উঠোনে পা দিয়ে ঠাকুরঘরের দিকে যেতে যেতে দাঁড়ালেন কণকলতা। চোখ তুলে দোতলার বারান্দায় পাশাপাশি দুটো খাঁচার দিকে তাকিয়ে বললেন, বড়বৌমা, খাঁচার ঢাকাগুলো খুলে দাওতো।

কে যেন কণকলতাকে বলেছিল ময়নার খাঁচা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে না রাখলে পাখী কথা বলতে শেখে না। সে কথা শোনার পর থেকে কালো কাপড়ের ঘেরাটোপ দিয়ে ময়নার খাঁচা দুটো ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কণকলতার পাখীর খুব সখ।

এ পর্যন্ত কতো পাখী পুষলেন তিনি। ময়না, টিয়া, চন্দনা, ফুলটুসি। এখন সব গিয়ে দুটো ময়না আছে। একটা কথাবার্তা বলে না। শুধু খাবার সময় হলে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয়। অন্যটা কণকলতার ছোট মেয়ে বাসন্তীর নাম ধরে ডাকে আর গালাগাল দেয়।

এসব তাকে শেখাতে হয়নি। আপনিই শিখেছে। আজ সকাল থেকেই কণকলতার মনের মধ্যে মেঘ জমতে শুরু করেছে। বুকের মধ্যেটা অজানা আশঙ্কায় থমথমে হয়ে আছে।

এত বড় সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী তিনি। যা কিছু ঝড়ঝাপটা সব তিনি একা বুক পেতে সামলান। চোদ্দজন নাতি-নাতনী আর সাত ছেলে তিন মেয়ে তার। ছোট আর রাঙা ছেলের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি। কণকলতার ভারী দেহের দুপাশে নাতি-নাতনীরা থাকলে সুখী হন তিনি। ওদের গায়ের উত্তাপে কেমন যেন আপন আপন গন্ধ পান। রক্তের কোনো গন্ধ থাকে কিনা তা তিনি জানেন না তবে একই রক্তের একটা ধারাবাহিকতা থাকে তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কণকলতা। এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই মানুষ নিজের উৎসটিকে খুঁজে পায়।

কণকলতা ঠাকুর ঘরের চৌকাঠে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ ছুটে এলো।

শিগগির চলো, সেজর ব্যাথা উঠেছে।

ভরা পোয়াতি ছিল সেজবৌমা। তবু আজই প্রসববেদনা উঠবে তা ধারণা করতে পারেনি কণকলতা। গত সপ্তাহেও শরৎ ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। শরৎ অনেকক্ষণ ধরে সেজবৌমাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর বলেছিল, এখনো দেরী আছে পিসিমা। এ মাসটা কেটে গিয়ে অমাবস্যার আগে আগে আপনার পনেরো নম্বর নাতির আগমন ঘটবে।

(২)

আজকালকার ডাক্তারগুলো কি যে শিখে আসে। গজগজ করতে করতে ঠাকুরঘরের দরজা থেকে কণকলতা সরে এলেন, বিজলী দাই ডাক্তারের চেয়ে অনেক বড় ডাক্তার। সে পোয়াতির দিকে তাকিয়েই বলে দিতে পারে কবে কখন প্রসব বেদনা উঠবে।

স্নান সেরে ফিরেই কণকলতার নজরে পড়েছিল উঠোনের একপাশে ঘুঁটে ডাঁই করা আছে। দুজন ঠিকে ঝি ঝুড়িতে করে ঘুঁটে খালাস করছে। খালি হলে

ধোঁয়া মোছার পর ঐ ঘরেই আঁতুর হবে। এ বাড়ির যত ছেলে মেয়ে ঐ আঁতুড়েই জীবনের প্রথম আলোর মুখ দেখেছে। আঁতুড় উঠে গেলেই আবার ঐ ঘরেই সংসারের সারা বছরের ঘুঁটে জমা করে রাখা হবে। ঘরখানা একটা লম্বা গলির মতো। সামনে একমাত্র দরজা আর দোতলার সিঁড়ির গায়ে একটু ছোট একটা জানলা। সারাদিনে ওঘরে আলো রোদ্দুর কিছুই ঢোকে না। সারাবছর ইঁদুর বেড়ালের আস্তাকুর হয়ে থাকে।

কিন্তু আঁতুড়ের সাতটা দিন ঐ ঘরের আলাদা মাহাত্ম্য। সন্ধেয় বড় মালসায় আগুন করে ধুনো দেওয়া হয়। সারাদিন ধূপ জ্বলে। বিজলী দাই আঁতুড়ে বাচ্চা আর তার মার নাড়ি সেঁকার জন্যে ঘরের ভেতরে ইঁট পেতে কাঠ কয়লার আগুন করে। বাড়ির সমস্ত বৌ-ঝির চোখ আর মন পড়ে থাকে এ ক'দিন ঐ ঘরখানার দিকে।

কণকলতা অপ্রসন্ন মুখে ঘুঁটে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, আর একটু হাত চালাও বাছারা। তাঁর কণ্ঠস্বরে অধৈর্য আর রাগ ফুটে বেরলো। কাজ হচ্ছে দ্যাখোনা যেন যাদুর গায়ে হাত বোলাচ্ছে।

দক্ষ—এই দক্ষ, এইসব গতর সোহাগী মাগীদের কোথা থেকে জুটিয়ে আনলি, এক ঝুড়ি ঘুঁটে তুলতে রাত পুইয়ে গেল।

নতুন বৌ উঠোনে শাশুড়ির গলা পেয়ে দৌড়ে এলো। মা আপনিও চানে বেরিয়েছেন আজ সেজদিরও ব্যাথা উঠেছে। আমাদের খুব ভয় করছে মা। নতুন বৌয়ের কথা শেষ হবার আগেই মেজবৌ এলো। মা, আপনার পুজোর দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আজ আমার ঠাকুরঘর এখানে বাছা, কণকলতা দুহাত তুলে কপালে ঠেকালেন। অস্ফুট স্বরে সংসারের নিত্য পূজিত বিগ্রহকে স্মরণ করে বললেন, গোপাল, হে মধুসূদন বিপদ থেকে তুমি রক্ষা করো। সেজবৌমার নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেলে তোমাকে সোনার বালা গড়িয়ে দেব, ঠাকুর।

পিয়ারী ঘোড়ার গাড়ির মাথা থেকে সাতঘড়া গঙ্গাজল নামিয়ে এনে এক এক করে জলের ঘরে রাখা বিশাল বিশাল মাটির জালায় ঢেলে রাখলো।

ঠাকুর ঘরের গায়ে লাগা জলের ঘরটা বেশী বড় নয়। ঘুপচি অন্ধকার ঘরটার স্যাতাধরা দেয়ালে অসংখ্য তেলাপোকা। দেখলে গায়ের মধ্যে ঘিন ঘিন করে ওঠে। পিয়ারীর সব জল জালায় ঢালা হয়ে গেলে লক্ষণ ঠাকুর দলা দলা ফিটকিরি এনে জালার মধ্যে ফেলে দিল। ফিটকিরিব গুণেই গঙ্গার ঘোলাটে জলের সব ময়লা কেটে গিয়ে নির্ম্মল তক্‌তকে্‌ হয়ে উঠবে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি এ সংসারে কলসি কলসি গঙ্গাজল লাগে। কণকলতার সমস্ত রান্নাবান্না ছাড়াও তাঁর তৃষ্ণা মেটাতেও এই জল। জলের ঘর ছাড়াও এ বাড়িতে আলাদা আলাদা নামের অনেকগুলো ঘর আছে। এক তলায় পাশাপাশি আলুর ঘর আর চালের ঘর। আলুর ঘরের মেঝেতে গঙ্গার বালির ওপর বড় বড় পুষ্ট সোনালী রং-এর মসৃণ গায়ের নৈনিতাল আলু সাজিয়ে রাখা থাকে। সারা বছর ঐ আলু খরচা হয়। আলুর ঘরেই এক পাশে থাক্ দিয়ে রাখা থাকে কুড়ি পঁচিশ টিন আঁখের গুড়। আমের সময় বাগান থেকে গরুর গাড়ি ভর্তি করে টুকরি টুকরি আম আসে। গোবিন্দভোগ, বোম্বাই, খিরসেপুলি, রাণীপসন্দ্, সুরো চ্যাটার্জ্জী সব রকমের আম। টুকরি খালি করে সেই সব আম ঢালা হয় চালের ঘরের মেঝেয়।

বাড়ির ছেলে-বৌরা যাতে প্রাণভরে ইচ্ছেমতো আম খেতে পারে তার জন্যে বাগান করেছিলেন কর্ত্তা ঠাকুর। লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ থেকে দাম দিয়ে ভাল জাতের আমের কলম আনিয়েছিলেন নিজের বাগানের জন্যে। তাঁর আমলের বুড়ো মালি প্রহ্লাদ এখনো আছে। সারাবছর সেই বাগান দেখাশোনা করে। ফলের সময় দিনরাত্তির জেগে অতন্দ্র প্রহরীর মত ক্যানেস্তারা টিন বাজিয়ে পাখী পাখালি তাড়ায়।

দক্ষ..... দক্ষ......

অস্থির গলায় কণকলতা ডেকে উঠলেন। দক্ষ ঝি নয়, তার ডাক শুনে সেখানে দৌড়ে এলো নরু মুহুরী, কত্তামা? হাত দুখানা পেটের কাছে রেখে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিলেন কণকলতা। নরুর কথা কানে গেলেও তারদিকে মুখ না ফিরিয়ে বললেন, ধীরু কোথায়, ধীরু, তাকে ডেকে দাও শিগগির—

নরু নিরুত্তরে চলে যাচ্ছিল। কণকলতা পেছন থেকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, বিজলী দাইকে আনতে গাড়ি পাঠিয়েছ?

হ্যাঁ কত্তা মা। ভুজঙ্গকে পাঠিয়েছি, বলে দিয়েছি বিজলীকে সঙ্গে করে ধরে আনতে।

আর শরৎ? তার কাছে কে গিয়েছে? তুমি নিজেই যাও শরতের কাছে। তাকে বোলো আমি বলেছি সেজবৌমার প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাকে এখানে থাকতে হবে। আজ দুপুরে এখানে খাবে বাড়িতে যেন বলে আসে।

শরৎ ডাক্তার এ বাড়ির বাঁধা ডাক্তার।

পয়সা নিয়ে চিকিৎসা করার সম্পর্ক এ বাড়ির সঙ্গে ডাক্তারের কোনদিনই

ছিল না। যেবার মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি এ পাশ করে দেশে ফিরেছিলেন শরৎ সেবারই স্টেশনে নেমে সটান কণকলতার কাছে চলে এসেছিলেন। হেঁট হয়ে কণকলতার পা ছুঁয়ে শরৎ বলেছিলেন, পিসিমা আমি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছি।

কণকলতা তাঁর মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করেছিলেন, কি ঠিক করেছ, কলকাতায় যাবে না এখানেই থাকবে?

আপনি বলুন কি করবো?

আমি কেন তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করো। এখানে শুধু মানুষের ভালবাসা পাবে আর কলকাতায় পশার হলে পয়সা যশ সবই পাবে।

শরৎ এক মুহূর্তও ভাবার জন্যে সময় নেননি। বলেছিলেন, আমি এখানেই থাকবো, পিসিমা। আর আপনার টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পারি....

ছিঃ শরৎ, কেমন যেন বিষণ্ণ শুনিয়েছিল কণকলতার গলা, দ্বিতীয়বার তুমি আর এই কথা তুলোনা। এই কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে আমার খুব কষ্ট হবে শরৎ।

বলার আগেই রূপোর ডিসে করে একডিস সন্দেশ এনে সামনে নামিয়ে দিয়েছিল সেজবৌ। ঘোমটার মধ্যে থেকে ইশারায় কণকলতার কাছে জানতে চেয়েছিল আর কিছু দেবে কিনা।

কণকলতা তার দিকে না তাকিয়ে বলেছিলেন শরৎ দুপুরে এখানে খেয়ে যাবে।

এ সংসারে দুবেলায় সত্তর আশিজনের পাতা পড়ে। সেখানে একটা মানুষের খাওয়া কোন সমস্যাই নয়।

কত্তা বলতেন, সব সময় দুজনার মতো বেশী চাল নেবে। যে বাড়িতে অসময়ে এসেও অতিথি দুটো ভাত না পায় সে বাড়িতে অলক্ষ্মীর বাস।

মা, আমায় ডাকছিলেন —

বড় ছেলে ধীরু। ছ ফুটের চেয়ে বেশী লম্বা। পেটা শরীর। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল আর বড় বড় দুটো চোখের জন্যে একটু ছেলে মানুষ দেখায়।

কত্তা মারা যাবার পর ধীরুই এখন কণকলতার ডান হাত। চালকল আর ইঁটভাটা সব কাজ কারবার সেই দেখাশোনা করে। আপদে বিপদে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাকেই ডেকে পাঠান কণকলতা।

পরনে সেনগুপ্ত ধুতির ওপর টুইলের ফতুয়া। পায়ে কলকাতার কলেজস্ট্রিট

থেকে কেনা কে এম দাসের পা ঢাকা চটি। এই পোষাকেই সর্বত্র যাতায়াত তার। শুধু সদরের অফিস কাছারিতে যেতে হলে ফতুয়ার বদলে গায়ে হাফ হাতা সার্ট ওঠে। সেইসঙ্গে কাঁধে মটকার চাদর।

ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকালেন কণকলতা। বললেন, আজ আর বাইরে বেরিও না। কাছাকাছি থেকো। কখন কি দরকার লাগে—

আচ্ছা। আমি কাছারিতে আছি, চলেই যাচ্ছিল ধীরু কি মনে হতে আবার ফিরে এলো, টাকা পয়সা লাগবে কিছু? না, কি যেন একটা চিন্তার ছাপ পড়েছে কণকলতার দুচোখের তারায়। কিন্তু সেটাও বেশীক্ষণ থাকলো না। দরজায় হাত রেখে ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে বললেন, ভালো করে জল ঢেলে আগাগোড়া ধুয়ে দাও। এক তিল ময়লা যেন কোথাও না লেগে থাকে। চাকরদের কাউকে বলো জল ঢেলে দেবে।

ধীরু তখনো দাঁড়িয়েছিল। বলল, মা, কাঁসার থালা আনতে কাউকে বাজারে পাঠাবো?

ছেলে হলে দোতলার বারান্দা থেকে নিচের উঠোনে কাঁসার থালা আছড়ে ভাঙ্গার নিয়ম এ বাড়িতে। এ প্রথা সেই কোন কাল থেকে চলে আসছে। কণকলতা এর ব্যতিক্রম করেননি কখনো।

গলায় সোনার তারে গাঁথা রুদ্রাক্ষের হারে হাত রেখে কণকলতা বললেন, নতুন থালা সিন্দুকে আছে, বড় বৌমাকে বার করে দিতে বলেছি। তুই একখানা বরং ভালো পাড়ওলা শাড়ি এনে দে। বিজলীকে দেব।

ধীরু নিঃশব্দে চলে গেল।

আঁশ রান্নাঘরের উনুনে আগুন পড়েছে। বলবলিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছে জানলা দিয়ে। অন্যদিন এ সময়ে কয়লার দুটো রাক্ষুসে উনুনে গণগনে আঁচ উঠে যায়। পেতলের তোলো হাঁড়িতে উনুনে জল বসিয়ে লক্ষ্মণঠাকুর গামলায় চাল মাপতে থাকে। বার বার হাত দিয়ে কচলে কচলে চাল ধুতে হয় তা না হলে ময়লা থেকে যায় চালে। সাদা ধবধবে হয় না ভাত। ময়লা রং-এর ভাত দুচক্ষে দেখতে পারেন না কণকলতা। বড়বৌ মেজবৌ বকুনী খায় অনর্থক। নিরামিশ রান্নাঘরের উনুনে আঁচ পড়ে কণকলতা নিত্য পূজো শেষ করে ঠাকুরঘর থেকে বেরোবার পর। নবৌ অরুন্ধুতি সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলা থেকে নেমে এলো। মাথায় এক ঢাল কোঁকড়া চুল। এক মেয়ের মা হয়েছে দু বছর আগে। তারপর থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

নবৌয়ের বাবা পুলিশের বড় অফিসার। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনার পর বিয়ে হয়েছে তার।

এ বাড়ির অন্য বৌ-ঝিরা অরুন্ধুতিকে হিংসে না করলেও তাকে তারা নিজের কাছেরজন বলে বিশ্বাস করে না। কণকলতাও তাকে মনে মনে এড়িয়ে চলতে চান। তিনি নিজে তাকে পছন্দ করে আনলেও অন্য বৌদের মত অরুন্ধুতিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন না।

মা।

বলো মা।

সেজদিকে কি নীচে নামিয়ে আনবো?

না। বিজলীকে ডাকতে পাঠিয়েছি, ও আগে এসে দেখুক।

ডাক্তারবাবুকে ডাকবেন না?

অরুন্ধুতির কথা কানে যেতেই কণকলতার মুখে অপ্রসন্নতার ছায়া পড়লো। শরৎ এ বাড়ির শুধু ডাক্তারবাবু নয়। তার চেয়েও বেশী। নবৌয়ের একথা অজানা নেই তবু তাকে হেয় করার চেষ্টা কেন তার?

মা।

কণকলতা বললেন, তুমি এ ঘরের উনুনেও আগুন দিতে বলো। ডেকচি ডেকচি গরম জল লাগবে।

ঘাড় কাত করে নিঃশব্দে সরে গেল নবৌ।

সেজবৌমা দোতলায় তার নিজের ঘরে। সকালে গঙ্গায় যাবার আগে একবার ভেবেছিলেন তার খবর নিয়ে যাবেন। খবর নিতে পারেননি। ঘরের বন্ধ দরজার সামনে থেকে ফিরে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন যতক্ষণ পারে ঘুমিয়ে নিক। সামনে কষ্টের সময় আসছে তখন দুচোখের পাতা এক করতে পারবে না।

দক্ষ, এই দক্ষ—

দোতলার দালানের জানলা থেকে মুখ বাড়ালো দক্ষ, কি বলছো বলো।

তুই দোতলায় বসে কি করছিস?

আমার পিন্ডির ব্যবস্থা করছি—কথাটা মনে মনে বলে দক্ষ মুখে বলল, তোমার নাতি নাতনীদের ইস্কুলে পাঠাতে হবে না, বেলা এক প্রহর হতে চলল। দক্ষর গলায় এতটুকু বিনয় নেই উল্টে চাঁচাছোলা জবাব। এক এক সময় কণকলতার মনে হয়, দক্ষ দিন দিন মাথায় চেপে বসতে চাচ্ছে। এ বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী তিনি এক এক সময় তাঁকেও ভ্রূক্ষেপ করে না সে। মনের রাগ মনে চেপে রেখে কণকলতা বললেন, নীচে নেমে আয়।

দক্ষর মুখ জানলার পাশ থেকে সরে গেল।

সেজবৌ-এর প্রসব বেদনার কষ্ট এখান থেকে টের পাচ্ছেন না তিনি। নিজে এগারোটা ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছেন। তাদের জন্ম দিয়েছেন। মানুষ করেছেন। তারপরেও তাঁর শরীরের কোথাও এতটুকু ভাঙ্গনের ছাপ পড়েনি।

কণকলকতার ঠোঁটে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটলো আবার মিলিয়েও গেল। আজকালকার মেয়েদের ননীর শরীর। একটা বাচ্চা পেটে ধরলেই শরীর ভেঙ্গে যায়। সন্তান প্রসবের পর বছর কেটে যায় আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে।

কি বলছিলে বলো?

দক্ষ সামনে এসে দাঁড়াল। কণকলতা তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। একটু আগে এই নারীর ওপর তাঁর বিবাগ জন্মেছিল এখন আবার ঠিক উল্টো মনের অবস্থা।

আঁটো সাটো শরীর দক্ষর। ছোট্ট কপালের ওপর পবিশ্রমে লেপটে থাকা খুচরো চুল। চোখ দুটোতে নিজেকে সমর্পণের দীনতা।

মায়া নয়, দক্ষর জন্যে এক ধরনের স্নেহ কণকলতার রক্ত কণিকায় উৎরোল হয়ে উঠলো।

আজ পুজোটা বাদ গেল, বুঝলি, কণকলতা বললেন।

তোমার গোপাল সারাদিন উপোষ করে থাকবে তাহলে? দক্ষর গলা বিষ্ময়ে কেঁপে গেল, কি জানি বাপু সেজবৌয়ের ব্যাথা উঠেছে। ছেলে হবে কি মেয়ে হবে, কখন হবে তা ভগবান জানেন। তুমি তাই বলে ঠাকুর ঘরেই ঢুকলে না। আদিখ্যেতা।

কি বললি তুই?

আমি আবার কি বলবো? দক্ষ খরখরিয়ে উঠলো। আমি এ বাড়ির ঝি মাগী, বললেই বা আমার কথা শুনছে কে?

তোর আজকাল খুব মুখ হয়েছে।

দক্ষ তাঁর কথার জবাব না দিয়েবলল, যাও ওপরে যাও, সেজবৌদি কান্নাকাটি করছে। এখানে দাঁড়িয়ে আঁতুড় পরিষ্কার না করালেও চলবে।

(৩)

মিথ্যে বলেনি দক্ষ। এই সময়টাতে মেয়েদের মন একটু স্নেহের জন্যে কাঙাল হয়ে ওঠে। জীবন মরণের অগ্নি পরীক্ষার মতো দুঃসহ একটা ভয় এই সময় সমস্ত চেতনার ওপর চেপে বসে।

এই সংসার, স্বামী, সন্তান, আত্মীয় পরিজন, প্রতিদিনের অসংখ্য মুহূর্ত তার কাছে পরম কামনা হয়ে তাকে বেঁচে থাকার জন্যে লোভী করে তোলে। একদম একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় দুজ্ঞেয় রহস্যের মুখোমুখি হয়ে তাকে আনকোরা নতুন একটা জীবনকে ছিনিয়ে আনতে হয়। সেখানে পৌঁছনোর জন্যে তার মনকে দুঃসাহসী করে তুলতে পারে একমাত্র সংসারের ভালবাসা। প্রসূতি নারী গর্ভগৃহে বার বার প্রার্থনা জানিয়ে বলে হে জীবন মৃত্যুর দেবতা, আমি মা হতে চেয়েছিলাম এই সংসারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যেই। আমার সুখ নয় আমার কামনা ছিল তোমার প্রাণ নদীর প্রবাহকে বইয়ে নিয়ে যাওয়া। তুমি আমার প্রাণের সঙ্গে আর একটা নতুন প্রাণকে যুক্ত করে আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলো ঈশ্বর।

মা, আস্তে করে ডাকলো অরুন্ধুতি। আর তাতেই সম্বিত ফিরলো কণকলতার। এতক্ষণ কি যে সব ভাবছিলেন। এসব ভাবতে নেই এই সময়। মন দুর্বল হয়ে পড়ে। গোপাল আছেন তিনিই সব ঠিক রাখবেন।

নবৌমা, চলো সেজবৌমাকে দেখে আসি।

দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বাধা পেলেন কণকলতা। উঠোনের আর সদর গলির মাঝখানে রাখা কাঠের সার্সি দেওয়া পর্দ্দার আড়াল থেকে বিজলীর মুখ দেখতে পেলেন তিনি। সামনে এসে বিজলী মাটিতে মাথা ঠেকালো। কেমন আছ গো, কত্তামা?

ভালো, তুই কেমন আছিস বল?

তার প্রশ্নের উত্তরে হেসে উঠলো বিজলী। বলল, এবার কিন্তু আমায় একখানা ঘড়া দিতে হবে কত্তামা। তুমি যদি রাজ্জি হও আমি তোমার সেজবৌয়ের কোলে তোমার আর একটা নাতি এনে দেব।

সব্বাই বলে বিজলী দাই এর হাতে যাদু আছে। সে যা বলে তাই হয়।

বেঁটে কালো মোটা সোটা চেহারা বিজলীর। বয়স চল্লিশ না পঞ্চশ বোঝার উপায় নেই। শরীরের তুলনায় হাত দুখানা একটু বেশী শক্ত সমর্থ। সেমিজের ওপর লাল পাড় মিলের মোটা খ্যাস শাড়ি পরনে। আঁচলে বাঁধা খৈনির কৌটো।

বিজলীর মাও দাই ছিল। তারকাছ থেকেই বিজলীর দাইগিরির হাতে খড়ি। ছোট থেকেই প্রসব করানোর ডাক এলেই মার সঙ্গে সঙ্গে যেত বিজলী।

যখন কুমারী ছিল তখন জন্ম রহস্য তার কাছে এক আশ্চর্য কৌতূহলের বিষয় ছিল। এখন নেহাৎ একটা মামুলী কাজের চেয়ে বেশী কিছু নয়। সংসারে

একখানা এঁটো থালা মেজে তুলতে যতক্ষণ সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে প্রসব করাতে পারে বিজলী।

সারা শহরের মেয়েরা চায় তাদের প্রসবের সময় বিজলী দাই যেন তাদের আঁতুড়ে উপস্থিত থাকে। তবু সে কটা জায়গাতেই বা যেতে পারে? তার বাঁধা যেকটা ঘর আছে তা সামাল দিতেই তার বছর ঘুরে যায়। শহরের শেষপ্রান্তে স্টেশন রাস্তার ধারে একটা আম বাগানের মধ্যে বিজলীর মাটির ঘর। লোকে বলে মাটির ঘরে থাকলেও বিজলীর হাতে সোনা দানা কম নেই। তার এইভাবে থাকাটা লোক দেখানো। বিজলীর ঘরের মেঝে খুড়লেই কলসী ভর্তি সোনা আর রাণীর মুখের ছাপ দেওয়া কাঁচা টাকা পাওয়া যাবে। তার ঘরে বিজলী একা থাকে না। তার সঙ্গে যে পুরুষটি থাকে তার বয়েস বিজলীর অর্ধেক।

এতক্ষণে তোর আসার সময় হলো, কখন লোক পাঠিয়েছি তোকে আনতে। কণকলতা বললেন, যা, সেজবৌমা ওপরে আছে। সাত সকালেই ব্যাথা উঠেছে।

(৪)

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দালানের গায়ে প্রথম ঘরখানায় সেজবৌ মেহগনীর পালঙ-এ শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। তার চারপাশে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বসে অন্য বৌরা। বড় বৌ অলকানন্দার কোলে সেজ বৌ-এর মাথা। বড়বৌ সেজবৌয়ের মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তোর কি ভাগ্য রে সেজো, এক ঘন্টাতেই ব্যাথার এতো তেজ, এই দ্যাখ না এখনি রেহাই পেয়ে যাবি। আমার তো মনে হচ্ছে বিজলী আসার তর সইবে না। বড়বৌয়ের কোলে মুখ গুঁজে সেজ বৌ অবিচ্ছিন্নভাবে কাঁদছিল।

কণকলতা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই অলোকানন্দা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, মা।

কণকলতা বিনাবাক্যে সেজ বৌয়ের পাশে বসে পড়ে পরম মমতায় বললেন, ভয় কি মা, ভয় কি, আমার কথা একবার ভাবো, এই যন্ত্রণা আমাকে এগারোবার সহ্য করতে হয়েছে। যে আসছে সে যে মহারাজা মা, জানান না দিয়ে চুপি চুপি এলে তোমরা শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে তাকে বরণ করবে কেমন করে, মা।

সেজ বৌ শাশুড়ির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে সাপটে ধরে একমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো পরক্ষণে হু হু করে কেঁদে উঠলো।

বিজলী বলল, সোহাগ পরে কোরো গো, এবার বৌকে আমার কাছে ছাড়ো কত্তামা।

বড় হাঁড়িতে টগবগিয়ে ভাত ফুটছে। ঝিঙেশাল চালের ভাতের গন্ধে সারা ঘর মৌ মৌ করছে। লক্ষ্মণ ঠাকুর একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল। এ সংসারে তার কমদিন হলো না। যে বছর ধীরুর বিয়ে হলো সে বছরই প্রথম এই বাড়িতে এসে ঢুকেছিল লক্ষ্মণ। তারপর থেকেই এ সংসারের সঙ্গে সে বাধা পড়ে গিয়েছে।

পাশের উনুনে আঁচ বয়ে যাচ্ছে। আজ অন্যদিনের মতো নয়। অন্যদিন হলে এতক্ষণ কাঁসিতে গামলায় ভাগ ভাগ করা কাটা তরকারি, ভাজা সব পৌঁছে যেত রান্না ঘরে।

মাছ আসবে একটু বেলায়। ইঁটভাটার পুকুর থেকে মাঝ ধরে পাঠাতে পাঠাতে সেই বেলা নটা। তার আগেই লক্ষ্মণের এক হাড়ি ভাত ডাল আর দুপ্রস্থ তরকারি নেবে যাবে।

লক্ষ্মণদা,

রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ব্যস্ত মুখ বাড়ালো দক্ষ।

বড় বৌদি বলল ছোলার ডাল হবে নারকোল কুচি দিয়ে। ডালের মধ্যে আলু সেদ্ধ দিয়ে দিও কটা। বাচ্চারা আজ তাই খেয়ে ইস্কুলে যাবে।

লক্ষ্মণ উঠলো। বলল, আলুর ঘরের চাবিটা খুলে দিয়ে যাও দিদি, নইলে আলু নেব কেমন করে। আ আমার মরণ। দক্ষ যেতে যেতে দাঁড়াল, এখনো ভাড়ারের চাবিই খোলা হয়নি। হবে কোথা থেকে.... বাড়ি সুদ্ধু সব আহ্লাদে হাবুডুবু খাচ্ছে..... ছেলে যেন আর কারুর হয় না।

দক্ষদি..... দক্ষদি কোথায় তুমি —

ওপরের দালান থেকে একটা চিকেন মেয়েলী গলা ভেসে এলো। নতুন বৌ ডাকছে দক্ষকে।

যাও দিদি যাও, তোমার খোঁজ পড়েছে। লক্ষ্মণ ঠাকুর বলল, আমি চাবি খুলে নেব....। ঠিক তখনি বালিশ কাঁথা চাদর পাটি সব দিয়ে পরিপাটি করে ঘুরিয়ে একটা বিছানা হাতে করে মেজ বৌ এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল। বলল, ঠাকুর ভাজা মুগের ডাল হবে। সঙ্গে বেগুন ভাজা আলু ভাজা। আলু চাকা করে কেটে নিও। এর মধ্যে মাছ এসে গেলে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের ভাতের সঙ্গে মাছ ভেজে দিও।

কথার পর মেজ বৌ হাতের বিছানাটা আঁতুড়ের দরজায় নামিয়ে রাখলো। দক্ষকে বলল, আঁতুড়ের বিছানা পত্তরগুলো বড়দি তোমায় দিতে বললেন। শাড়ির আঁচল তুলে মুখ মুছছিল দক্ষ। মুখ মোছা বন্ধ করে বলল, আমাকে বিছানা দিতে বলল....? আমি বিছানা দিয়ে কি করবো, ছেলে কি আমার হবে? না আমি আঁতুড়ে পোয়াতি?

মেজ বৌ এ সংসারে সকলের চেয়ে আলাদা। হাল্কা ছোটখাটো চেহারা। গায়ের রং ময়লা হলেও একটা মসৃণ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা টলটল করে সর্বদা। মেজ বৌ কথা বললে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকলেও শোনা যায় না।

দক্ষর কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেলল মেজ বৌ। তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলল, ওমা তোমার মুখে কিছু আটকায়না দক্ষদি। যাই মাকে গিয়ে বলিগে তোমার আঁতুড়ে ঢোকার সাধ হয়েছে। কথাটা শেষ করেই পা বাড়ালো মেজ বৌ তার আগেই পেছন থেকে তাকে দুহাতে সাঁপটে জড়িয়ে ধরে দক্ষ বলে উঠলো, তোমার পায়ে পড়ি বৌদি... আমার ঘাট হয়েছে... এমন কথা আর কক্ষনো বলবো না।

(৫)

কণকলতা সেজবৌকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভালো করে দ্যাখ বিজলী। পেটেরটা তাড়াতাড়ি খালাস হলে সেজবৌয়ের কষ্ট কমে। বিজলী কণকলতার কথার জবাব না দিয়ে ঘরের ভেতরের ভিড়কে লক্ষ করে বলে উঠলো, যাওগো সব বাইরে যাও এবার। এখানে কি ঠাকুর উঠেছে নাকি যে এত ভিড় করেছ।

অলকানন্দা বললেন, ওরা সবাই তোমাকে দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

কেন, আমি কি এমন মনিষ্যি যে আমায় দেখার জন্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

কণকলতা ঘর থেকে চলে গিয়েছেন দেখে একজন অল্প বয়সী মেয়ে বলে উঠলো, আমরা তোমাকে কেন দেখতে যাবো গো। আমরা সেজদির ছেলে হওয়া দেখবো।

বিজলী চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখে নিয়ে অলোকানন্দাকে জিজ্ঞেস করলো, ছুড়ি কে গো বড় বৌদি, ভাতার দেখার আগেই ছেলে হওয়া দেখতে চাচ্ছে। যা ভাগ এখান থেকে, ভাগ সবাই —

কথা বলতে বলতে বিজলী একটানে সেজ বৌয়ের পরণের শাড়িটা কোমড়ের ওপর তুলে দিল তারপর অভিজ্ঞ একখানা হাত দিয়ে চেপে চেপে আসন্ন প্রসবা নারীর দেহের অভ্যন্তরে অন্য একটি প্রাণের সম্ভাবনাকে খুঁজে বেড়াতে থাকলো।

কেমন দেখলে গো বিজলীদি? বড় বৌ-এর কথাগুলো শোনার পরেও জবাব দিল না বিজলী। তারপর সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে সেজ বৌয়ের চোখের স্থির অপলক হয়ে থাকা মণিতে ভয়ের ছায়া দেখতে দেখতে বলল, খোকা হবে মনে হচ্ছে গো, নধর পুরুষ্টু দেহ...। পোয়াতিকে আঁতুড়ে নে যাও। জল ভাঙ্গার সময় হয়ে গেছে। তোমার শাশুড়িকে বলো এবার কিন্তু আমায় একখানা ঢাকাই দিতে হবে। এত্তো চওড়া আঁচলা ওলা —।

আঁতুড়ে ঢোকার আগে সেজ বৌকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন কণকলতা। থুতনীতে হাত রেখে চুমু খেয়ে বললেন, ভয় পেওনা মা গোপাল আছেন, তিনি দেখবেন।

কণকলতার মুখ থেকে কথাগুলো এমন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হলো যে সেজ বৌয়ের মনে হলো তারদেহে এই মুহূর্তে আর কোন কষ্ট নেই। তার মনের সমস্ত ভয়কে ছাপিয়ে একটা অপার্থিব আনন্দ তার রক্তের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভয়হীন নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আঁতুড়ে ঢুকে গেল সেজ বৌ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের সদর থেকে একটা খড়মের খট্ খট্ শব্দ উঠোনের ঠিক মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াল।

সেজ বৌ আঁতুড়ের মধ্যে থেকে মাথা তুলল তাঁকে দেখবে বলে। বিজলী তাঁর উদ্দেশ্যে দুহাত তুলে প্রণাম করলো। খড়মের শব্দ এই মুহূর্তে থেমে থাকলেও তার ধ্বনি বাতাস বাহিত হয়ে একটা অলৌকিক আনন্দের মত প্রতিটি হৃদয়কে শিহরিত করে দিয়ে আসার আগেই একটা ভরাট কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, দিদি, তোমার ঘরে আবার নাতি আসছে। আমি কাল সঞ্চারক্ষণে গণনা করে দেখেছি। প্রসবের সময় বৌমার কষ্ট হলেও প্রাণের আশঙ্কা নেই। মা বেটা দুজনাই সুস্থ থাকবে। শাঁখ বাজাতে বলো। কণলকতা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মানুষটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

কালো দশাসই চেহারা। মাথায় টাক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চোখ দুটি বন্যার নদীর মতো ভাসালো। পরনে পট্টবস্ত্র। গায়ে টকটকে লাল সিল্কের চেলির ফাঁক দিয়ে ত্রিনাথের চওড়া রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে।

দিদি, কণকলতার মুখের সামনে এগিয়ে এলেন ত্রিনাথ। হাত তুলে একটি ছোট পুঁটুলি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, বৌমার মাথায় ছুঁইয়ে দাও দিদি, মায়ের পায়ের ফুল আছে এতে।

ফুলগুলো হাত পেতে নিয়ে কণকলতা বড় বৌকে বললেন, ত্রিনাথকে এখানেই আসন পেতে দাও, বৌমা।

তারপর মুখ ফিরিয়ে সামনের মানুষটিকে বললেন, বসো, আমার কাছে একটু বসে যাও ত্রিনাথ। কতোদিন পর তুমি এলে বলতো।

খড়ম ছেড়ে রেখে আসনে বসলেন ত্রিনাথ। বসতে বসতে বললেন, আমি না এলেও তোমার সব খবর রাখি, দিদি। আমারও বয়েস হচ্ছে। আজকাল আর হুটহাট করে বেরতে পারিনে। সংসারের জট যতো ছাড়াতে চাচ্ছি সংসার তত দশহাতে কাছে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে। বড্ড কষ্ট হয় এক এক সময়, বড্ড কষ্ট হয়।

ত্রিনাথের বড় বড় চোখদুটিতে এক ধরণের যন্ত্রণা ফুটে উঠলো। সে যন্ত্রণা তাঁর মনের গভীর থেকে উঠে আসা। কিন্তু তবু তা যেন তাঁকে ছুঁতে পারলো না। ত্রিনাথের কণ্ঠস্বরে যতটুকু কষ্ট ব্যক্ত হলো চোখে মেঘের ছায়া তত ঘন হলো না।

কণকলতা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এতক্ষণ। হাসলেন শব্দ না করে। তারপর বললেন, শুনেছি আজকাল সকালের খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ। রাতেও শুধু দুধ আর ফল ছাড়া কিছু খাওনা। বৌমাকে বলবো গঙ্গাজলে আদা দিয়ে ফুটিয়ে চা করে দেবে তোমায়?

না দিদি, গলার রুদ্রাক্ষে হাত রাখলে ত্রিনাথ, না দিদি, ওসব অনাসৃষ্টি আজকাল শরীর নিতে চায় না। দুবেলা অন্ন আহার বন্ধ করেছি একযুগ হলো। এখন বাকিটুকু ছাড়তে পারলে বোধহয় শরীরটাকে জব্দ করা যেত।

আঁতুড়ের দরজা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে কণকলতা বললেন, তুমি নিজেকেই বড্ড বেশী ভয় পাও ত্রিনাথ। এই আমায় দ্যাখো। সবচেয়ে আগে ত্যাগ করেছি যে নিজেকে। এই সংসারের হাজার এক ঝামেলা, নাতি-নাতনীর দল, ব্যবসা পত্তর ছেলেমেয়ের নিত্য-নৈমিত্তিক অভিযোগ অনুযোগ এই সব নিয়ে বেশ আছি। যেদিন ডাক আসবে ওরে চলে আয় এবার বলে। একমুহূর্তও বিলম্ব করবো না তুমি দেখে নিও, ত্রিনাথ।

অল্প অল্প হাসছিলেন ত্রিনাথ।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে অকপটে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বললেন, সত্যি বলেছ দিদি। তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাই। এত্ত বড় বড় ঝড় ঝাপটা মাথায় নিয়েও কেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছো তুমি। আমরা হলে কবে ঘাড় ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়তাম।

একটু দাঁড়াও ত্রিনাথ। যে কথাটা মনে এসেছিল সেটা বলতে গিয়েও বললেন না কণকলতা। তাঁর মনে পড়ে গেল, ত্রিনাথ গাড়িতে চাপবেন না। এতদূর রাস্তা হেঁটেই যাবেন তিনি। অদ্ভুত মানুষ ত্রিনাথ। জীবনে এতখানি বয়স হলো রেলে চড়েন নি। যানবাহনে চাপতে হবে বলে কখনো এ শহরের চৌহদ্দির বাইরে যাননি। জীবনে একবার মাত্র সদরে জেলা শহরে গিয়েছিলেন তাও আট মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে। কলকাতায় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পর মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যাত্রার সময় বলেছিলেন, তুমি নিজে যদি যোগাযোগ রাখতে পারো তাহলেই যোগাযোগ থাকবে। আমি কোনোদিন তোমার বাড়ি যেতে পারবো না। সে কথার খেলাপ করতে হয়েছিল ত্রিনাথকে। মেয়ে মৃত্যুশয্যায় খবর পয়ে বাপের প্রাণে ঝড় উঠেছিল। ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন, একখানা ছইওলা পালসী নৌকো ভাড়া করে দাও আমাকে।

কলকাতা এখান থেকে নৌকোতে সাতদিনের পথ। দুদিন যাবার পর মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন রাস্তাতেই। ছেলেকে বলেছিলেন, নৌকো ফেরাতে বলো, পবন।

যাবেন না ওখানে?

গিয়ে কি করবো বলো। প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

অনন্তলোক থেকে তোমার দিদি জানতে পারবে না আমি তাকে দেখতে এসেছিলাম।

বাড়ি ফিরে ত্রিনাথ তিনদিন কারুর মুখদর্শন করেননি। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন। জপ-তপ নিত্যকার পূজো আহ্নিক তাও করেননি।

তিনদিন পর খবর পেয়ে কণকলতা গিয়েছিলেন ত্রিনাথের বাড়ি। দরজা খুলে বাইরে এসেছিলেন ত্রিনাথ, তাঁকে দেখে কণকলতা একটু অবাক হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল হৃদয়হীন এই মানুষটির চোখে অশ্রুর চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা বৃথা।

সংসার ত্যাগ করা যায় না, দিদি, ত্রিনাথ বলেছিলেন। আমি আগেই গণনা করেছিলাম মান্তুর আয়ু ওকে কিছুতেই তিরিশের ওপরে নিতে যেতে পারবে না। এসব জানার পরেও তার বিয়ে দিয়েছিলাম। তার গর্ভে সন্তান আশা

করেছিলাম। বিয়ের পর তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেছিলাম সুখী হয়ো। সদরের কাছাকাছি যাবার আগেই একটি সুদর্শন যুবক হেঁট হয়ে ত্রিনাথের পায়ে প্রণাম করলো, মামা কতক্ষণ এসেছেন আপনি?

এই মাত্র, কথা বলে ত্রিনাথ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার মুখ লক্ষ করতে থাকলেন। তারপর প্রায় নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস মোচন করে বললেন, তোমার মনে কি কোন অশান্তি আছে জগৎ?

না।

তোমার চোখে তোমার মনের ছায়া পড়েছে দেখছি। সেখানে অনেক জটিল চিহ্ন। সেগুলোর পাঠোদ্ধার এত তাড়াতাড়ি করতে না পারলেও বুঝতে পারছি তোমার সামনে সংকট।

মামা, আপনি বোধহয় ভুল বলছেন।

সস্নেহে একখানা হাত তুলে ত্রিনাথ জগতের কাঁধে রাখলেন। তারপর অকপটে বলে উঠলেন, যে নারীর প্রতি তোমার লিপ্সা জন্মেছে সে রাহুবৃত্তি সম্পন্না। তাকে তুমি ত্যাগ করো। অবিলম্বে ত্যাগ করো।

ত্রিনাথ —

পেছনে কণকলতার ডাক শুনে দাঁড়ালেন ত্রিনাথ। মুখ তুলে বললেন, আবার আসবো, অশৌচ মিটলেই আসবো।

চলে যাবার আগে জগতের দিকে আবার তাকালেন তিনি। দেখলেন জগতের তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল কপালে কয়েকটা রেখা এই মুহূর্তে প্রকট হয়ে উঠেছে। মনে মনে ভাবলেন, কণকলতার সাতটি ছেলের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সুন্দর ও সুপুরুষ। এখন যৌবনের স্পর্শে রমণীমোহন হয়ে উঠেছে। একে রক্ষা করা কঠিন।

(৬)

উঠোনের পরেই একটা গলিপথ। সদর রাস্তা থেকে তিনধাপ সিঁড়ি ওঠার পর স্প্রিং দেওয়া কাঠের জালি গেট। জালি গেটের পর বড় বড় লোহার বল্টু দেওয়া সিং দরজা। গলি আর উঠোনের মাঝামাঝি অন্দরকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাঠের জাফরি। উঠোনের দুদিকে বাড়ির দুটি মহল। দোতলায় ওঠার পর আঁশ রান্নাঘরের ছাদ দিয়ে এ মহল থেকে ও মহলে যাতায়াতের পথ।

গলি পথটুকু পার হয়ে এসে ত্রিনাথ রাস্তায় নামলেন। মনের মধ্যে একটা কিন্তু ভাব এই মুহূর্তে তাকে অস্থির করে তুলেছে। জগতকে তার নারী-লিপ্সার

কথাটা এত স্পষ্ট করে না বললেও হতো। তিনি কটুভাষী একথা সকলেই জানে। সেই সঙ্গে তিনি এ সংসারের মঙ্গলাকাঙ্খী তাও ঠিক। তিনি বুঝতে পারছেন কণকলতার সংসারে জগতের হাত ধরেই পাপের প্রবেশ ঘটবে। এ সংসারকে রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। আর এই কর্তব্যের কথা মনে রেখেই তাকে কটুভাষী হতে হয়েছে।

কে—রাস্তার মধ্যে থমকে দাঁড়ালেন ত্রিনাথ। কে যেন তাঁর পায়ে হাত দিয়েছে। অন্যমনস্ক হয়েছিলেন বলেই তিনি তার মুখ দেখতে পারেননি।

অলোক—কণকলতার তৃতীয় পুত্র।

ও তুমি, সরাসরি অলোকের মুখের দিকে তাকালেন ত্রিনাথ,

কোথা থেকে এলে?

ইঁট ভাটা থেকে এলাম, মামা। নতুন কুলির দল এসেছে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করে এলাম।

যাও বাড়ি যাও, ত্রিনাথ তার মুখ থেকে দৃষ্টি সরালেন না, এ সময় তোমার বাড়িতেই থাকা উচিত। আমি গণনা করে দেখেছি বৌমার পুত্র হবে। উভয়েই কুশলে থাকবে।

ত্রিনাথ জানেন নারী তার নিজের গর্ভে সন্তান ধারণ করে। সমস্ত কষ্ট তাকেই সহ্য করতে হয়। তাই বলে সন্তানের পিতার মানসিক যাতনা কিছু কম হয় না। এই মুহূর্তে অলোককে পিতা হবার গর্ব এবং লজ্জা ার স্পর্শে সামান্য বিহ্বল দেখাচ্ছে। তার দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করার জন্যে ত্রিনাথ আবার বললেন, অনর্থক দুশ্চিন্তা কোরো না তুমি। দুশ্চিন্তা করার মত কিছু ঘটবে না।

মামা —

ত্রিনাথ তখনো পা বাড়ান নি। বললেন, কিছু বলবে?

তারপর উত্তর না শুনেই বললেন, কাল সকালে সূর্য ওঠার পর সোনার মোহর দিয়ে পুত্রের মুখ দেখবে। যাও, আমার আশীর্বাদ থাকলো।

বিজলী আঁতুড়ের দরজা সামান্য ফাঁক করে হেসে বলল, কই গো গরমজল হয়েছে?

দক্ষ আর নতুন বৌ একসঙ্গে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর একটা বড় তোলো হাড়ি ভর্তি গরম জল গামছা দিয়ে ধরে এনে আঁতুড়ের দরজার বাইরে থেকে দক্ষ বলল, গরমজল এনেছি বিজলী দিদি, নাও।

কণকলতা নীরবে জলচৌকির ওপর বসেছিলেন। তাঁর দুটি চোখ মুখোমুখি দোতলার বারান্দায় পাশাপাশি দুটি ঝুলন্ত খাঁচার ওপর স্থির হয়ে আছে। খাঁচার মধ্যে ময়না ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারপাশটা লক্ষ করে। রোজ তিনি নিজে হাতে গাওয়া ঘি দিয়ে ছাতু মেখে পাখী দুটোকে খেতে দেন। আজ এখনো পাখীদুটো অনাহারে রয়েছে।

মনে মনে বিরক্ত হলেন কণকলতা। বাড়িতে পাঁচটা বৌ। তারমধ্যে একজন না হয় আঁতুড়ে ঢুকেছে, বাকি চারজনতো এ কাজটা করতে পারে।

কণকলতার পাশ দিয়ে একটা হাল্কা পদশব্দ চলে যাচ্ছিল। সেদিকে না তাকিয়ে তিনি বললেন, নতুন বৌমা, পাখীদুটো এখনো উপোষ করে রয়েছে, এটা কি আমাকেই দেখতে হবে?

নতুন বৌ সামনে এসে দাঁড়াল, আমি নিজে হাতে ওদের ছাতু মেখে দিয়েছি মা। আপনার ময়না দুটো ভীষণ হিংসুটে, ছাতু আপনি দেননি বলে ছুঁয়েও দেখেনি। ছাতুর বাটি তেমনি পড়ে আছে।

তার কথা শুনে হেসে ফেললেন কণকলতা। পাখী বড্ড হিংসুটে হয় তা তিনি নিজেই দেখেছেন। দুটো পাখীকে এক খাঁচায় রাখলে নিজেরা কামড়া কামড়ি করে মরে।

কিন্তু এ ময়নাটা খুব লক্ষ্মীমন্ত।

ছমাস আগে নরু মুহুরী দুটো ময়না এনে তাঁকে দিয়ে বলেছিল, এ দুটো ভালো জাতের পাখী। কথা শেখালে কথা বলবে।

সেই থেকে এদের কথা শেখানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন কণকলতা। প্রতিদিন নিয়ম করে খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, গৌর বলো, নিতাই বলো....। গোপাল গোপাল বলো। রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলো।

ময়না দুটোর মধ্যে একটা কিছুই বলতে শেখেনি। আর একটা কেমন করে যেন গালাগালি শিখেছে। দিনের মধ্যে হাজারবার বসান্তীর নাম করে গালাগাল করে। দক্ষকে ডেকে সাড়া না পেলে বলে দক্ষ হারামজাদি.... দক্ষ হারামজাদি.... কোথায় গেলি.... কোথায় গেলি হারামজাদি—

পাখীদুটোর কথাই ভাবছিলেন কণকলতা। হঠাৎ তার কানে একটা ক্ষীণ ওঁয়া শব্দের মতন ভেসে এলো যেন। তাঁর বুকের মধ্যে একসঙ্গে সহস্র বীণার ঝঙ্কার বানডাকা নদীর মতন উত্তাল হয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেল।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে কণকলতা কান পাতলেন। না, আর কোন শব্দ নেই।

বড় বৌমা দেখতো একটা কান্নার শব্দ শুনলাম যেন।

অলোকানন্দা দ্রুতপায়ে আঁতুড়ের দরজার বাইরে গিয়ে বন্ধ দরজায় হাতের ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলো, বিজলী, বিজলী কিছু হয়েছে নাকি—?

ভেতর থেকে কোনো সাড়া এলো না।

শরৎ ডাক্তার সকালে এসে একবার ঘুরে গিয়েছে। ভেতরে যেতে চেয়েছিল সে। বিজলী রাজি হয়নি। তার আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছিল। দুদিনের ডাক্তার বলে কিনা বিজলী দাই আঁতুড়ে উপস্থিত থাকতে ছুরি চালিয়ে প্রসূতির পেট কেটে বাচ্চার জন্ম দেবে। বিজলী দাই এর এতকালকার শিক্ষা, হাত যশ তাহলে যে ধূলোয় লুটোবে। মরার পর তার মৃত মা স্বর্গ অথবা নরক যেখানেই থাকুক তাকে মুখ দেখাবো কি করে।

বড় বৌ মেজ বৌ মুখ কালো করে কাছাকাছি ঘুরছে।

ধীরু কাছারি থেকে একবার ভেতরে এসেছিল। আবার সেখানে ফিরে গিয়েছে। যাবার আগে বলেছিল, মা, বৌমা খুব কষ্ট পাচ্ছে। বিজলীকে বলো ও না পারলে ডাক্তারকে ভেতরে যেতে দিক।

কণকলতা হ্যাঁ অথবা না কিছুই বলেননি। তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা টাইমপিস ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দের মধ্যে ডুবে ছিলেন তিনি। স্মিথ কোম্পানীর এই বেঢপ টাইমপিস ঘড়িটা এ সংসারের সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্মের মুহূর্তটিকে নিখুঁত হিসেব করে বলে দিয়েছে। ঘন্টা মিনিটের সেই সময়কে ধরেই ঠিকুজি করেছেন ত্রিনাথ।

নতুন বৌ শুকনো কাপড় তোলার জন্যে বারান্দায় গিয়েছিল। সেখানে দেখতে পেল সেজঠাকুর বারন্দার রেলিং-এ বুক দিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। সেজ ঠাকুর অর্থাৎ অলোক। নতুন বৌ যেমন নিঃশব্দে গিয়েছিল তেমনিই নিঃশব্দে ফিরে এলো। নীচে নেমে এসে ফিসফিস করে দক্ষকে বলল, দক্ষদি, সেজঠাকুর বোধহয় চা খাবেন।

তোমাকে বললে বুঝি দিতে?

না—না। নতুন বৌ তোতলাতে সুরু করলো।

আমার দেখে মনে হলো। তুমি এককাপ চা করে দিয়ে এসো না, ওপরের বারান্দায় আছেন।

দক্ষঝি মাথা ঝাঁকি দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল, ভাত খাবে না, জলখাবার খাবে না। দিনরাত্তির চা। বাপ যেন আর কেউ হয় না।

কিরে দক্ষদি, বক্ বক্ করছিস কেন?

লক্ষ্মণ ঠাকুরের কথার কোন জবাব না দিয়ে দক্ষ তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো।

মেজ বৌয়ের ঘরের দেয়াল আলমারি খুলে স্টোভ বার করে নিল। তারপর দালানের এককোণে স্টোভ ধরিয়ে তাতে বাটি করে চায়ের জল বসিয়ে দিল।

সেজদাদা এ বাড়িতে চায়ের ভক্ত। দিনে রাতে কতো কাপ চা খায় তার হিসেবে নেই।

সুন্দর ফুলকাটা কাপে গলানো সোনার মত এককাপ চা নতুন বৌয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দক্ষ বলল, যাও গো, চাটা তুমিই নিয়ে এসো।

আমি, ওমা... না... না। নতুন বৌ নিমেষে রক্তিম হয়ে উঠলো। কিন্তু আপত্তি সত্বেও চায়ের কাপ হাতে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

আঁতুড়ের দরজার বাইরে বসে বসে অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলেন কণকলতা। কেন যেন তাঁর নিজেরই ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল খুব সহজ কাজটাকে জটিল করে তুলে তাঁর ভাগ্য তাঁকে জব্দ করতে চাইছে।

শরৎ ডাক্তার একপাশে একটা ছোট টুলের ওপর পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। তার পায়ের কাছে পেট মোটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা নামানো। হঠাৎ প্রয়োজনে লাগার মতো ওষুধ আর ইনজেকশন হিসেব করে নিয়ে এসেছে শরৎ। ওপর থেকে তাকে দেখে বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

বিজলীর মতো অশিক্ষিত গ্রাম্য একটি মেয়ের হাতে সন্তান প্রসবের মত জটিল ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাটা তার মতে নির্বুদ্ধিতা।

আঁতুড়ের ভেতরে বিজলীর বুকের মধ্যেটায় একটা নিঃশ্বাস ঘন আঠার মতো হয়ে আটকে গেছে। তার শক্তসমর্থ হাত দুখানা সেজ বৌয়ের কুঁকড়ে থাকা শরীরটাকে বেষ্টন করে থাকলেও তাতে এই মুহূর্তে ভয়ের শিহরণ লেগে অল্প অল্প কাঁপছে।

বিজলী হেরে যাচ্ছে... হ্যাঁ সে হেরে যাচ্ছে। সেজ বৌয়ের গর্ভস্থ সন্তান নয় আসলে মৃত্যু হচ্ছে বিজলীরই।

হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এলো বাইরে।

কণকলতা দৌড়ে এসে হাতের ধাক্কায় আঁতুড়ের বন্ধ দরজাটা হাট করে খুলে দিলেন।

বিজলী মুখ তুলে তাকাল। সারা মুখ ঘামে ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে। দুচোখে অশ্রুধারা। তারমধ্যেই হেসে উঠলো বিজলী, তোমার নাতি হয়েছে কত্তামা। শাঁখ বাজাতে বলো শিগগির।

বড় বৌ একছুটে গিয়ে ঘড়িটা মাটি থেকে তুলে নিল। শরৎ ডাক্তার যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। তারপরেই ওপরের বারান্দা থেকে একখানা কাঁসার থালা নীচের উঠোনে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

গোপাল গোপাল, হে ঠাকুর—কণকলতা আঁচল তুলে চোখে চাপা দিলেন।

অনেকক্ষণ থেকে বারান্দার রেলিং-এ বুক রেখে একইভাবে দাঁড়িয়েছিল অলোক। একের পর এক সিগারেট পুড়ে যাচ্ছিল তার হাতে। পেছন থেকে নরম গলার ডাক শুনে মুখ তুলে তাকাল।

সেজ ঠাকুর, আপনার চা। চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সরে এলো নতুন বৌ।

অলোক পেছন থেকে অনেকক্ষণ তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ভ্রাতৃবধু। সদা অবগুণ্ঠনবতী এই মেয়েটির অস্তিত্ব এই সংসারে সব সময়েই সকালের আলোর মত নিঃশব্দ, কিন্তু উজ্জ্বল এবং পবিত্র।

(৭)

জগতের জন্যে মেয়ে পছন্দ করার সময় কণকলতা তাকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কণকলতা তাঁর পঞ্চম পুত্রের বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁর পছন্দমতো মেয়ের খোঁজ পাচ্ছিলেন না। খবর দিয়ে ত্রিনাথকে বাড়িতে ডেকে এনে নিজের মনের দুশ্চিন্তার কথা বলেছিলেন, আমার এই ছেলের ভাগ্যে কি বিয়ে নেই? তুমি গণনা করে দেখ ত্রিনাথ।

বিবাহ সময় না হলে হয় না।

জগৎ বাইশে পড়েছে, আর কবে সময় হবে?

ত্রিনাথ কণকলতার মনের গোপনে লুকোনো ভয়ের কথা জানতেন। দিনকাল আর আগের মতো নেই। এখন বংশ, গোত্র, জাত কিছুই না মানার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কোন্‌দিন জাতকুলহীন একটি মেয়েকে সঙ্গে করে বাড়িতে এনে তুললে কিসের শক্তিতে তাকে প্রতিরোধ করবেন কণকলতা।

অরক্ষণীয়া কন্যা নয় বিবাহযোগ্য পুত্রকে নিয়েও মায়ের হৃদয় ভাবিত হয়।

গোঁসাইদের একটি মেয়ে আছে, ত্রিনাথ বলেছিলেন, কথাবার্তা বলে দেখতে পারো দিদি।

মেয়েটি কেমন বলো শিগগির।

পরম সুন্দরী।

তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়, কণকলতা ব্যস্ততা প্রকাশ করেছিলেন। ত্রিনাথ কয়েকমুহূর্ত চুপ করে বলেছিলেন, মেয়েটির বাবা দরিদ্র!

আমি শাঁখা সিঁদুর ছাড়া কিচ্ছু চাইনে। মেয়ে পছন্দ হলে সোনায় মণিমাণিক্যে মেয়েকে মুড়ে ঘরে তুলবো।

তাঁর কথা শুনে চিন্তিতভাবে মাথা নেড়েছিলেন ত্রিনাথ।

সেখানেই গন্ডগোল দিদি। তোমার এই উদারতাকে তারা অহংকার বলে মনে করতে পারে।

কণকলতা দেরী করতে চাননি। পরদিনই বড় ছেলে ধীরুকে পাঠিয়েছিলেন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। সন্ধের পর ধীরু এসে বলেছিল, না মা, ওঁরা বিয়েতে রাজি নয়।

কথাটা খট্ করে এসে কণকলতার বুকে বিঁধেছিল। অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল তাঁর দুকান। এমন অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

তীক্ষ্ম গলায় প্রশ্ন করেছিলেন, কেন, বিয়েতে রাজি নয় কেন? আমি তো বলেছি শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে ওঁরা মেয়ে দেবেন আমি আমার মনের মতো সাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসবো।

অমতের আসল কারণটা কিন্তু প্রহ্লাদ গোঁসাই ধীরুর মুখের ওপরেই বলেছিলেন, শুনেছি তোমার ভাইয়ের স্বভাব ভালো নয়।

আপনি নিশ্চয় কোন বাজে লোকের কাছে খবরটা শুনেছেন, ধীরু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রহ্লাদ বলেছিলেন, তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো—আমরা খুব গরীব তাহলেও আমার মেয়েকে আমি জলে ফেলে দিতে পারবো না।

ঠিক আছে, কণকলতা বলেছিলেন, কাল আমি নিজেই যাবো, অলোককে বলেদিও সে আমার সঙ্গে যাবে। আর নরু যেন সকালবেলাতেই একখানা গাড়ি গঙ্গা পাড় করিয়ে ওপারে যাবার ব্যবস্থা করে রাখে।

ভুজঙ্গ কচুয়ানকে বলে দিচ্ছি সে গাড়ি নিয়ে যাবে।

আচ্ছা।

ষোল ক্রোশ রাস্তা। ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলে আবার ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে। নদীর ওপারে ছোট ট্রেন আছে। খেলার ট্রেনের মত ঝিক্ ঝিক্ শব্দ করে কালো-ধোঁয়া উড়িয়ে যখন ছোট লাইনের ওপর দিয়ে ছোটে তখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাশে পাশে দৌড়তে থাকে অল্পবয়সী ছেলেরা। ইঞ্জিনের জানলা দিয়ে মুখ বার করে ড্রাইভার হাসে আর ঘনঘন সিটি বাজাতে থাকে।

একবার সেই ছোট ট্রেন কেষ্টনগরে গিয়েছিলেন কণকলতা। ট্রেন ছাড়ার পর তাঁর মনে হয়েছিল নিশ্বাস আটকে আসছে। ভিড়ে হট্টগোলে আর গাড়ির প্রচন্ড দুলুনীতে কণকলতা তাঁর গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ট্রেন থেকে নেমে হাফ ছেড়ে বলেছিলেন, খুব শিক্ষা হয়েছে। আর জীবনে এমন ট্রেনে উঠছিনে।

(৮)

সাদা ধবধবে থানের ওপর রেশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিজেই সবকিছু তদারকি করেছিলেন কণকলতা।

নরু বাজারে গিয়ে দেখেশুনে পাঁচ সের ওজনের দুটো রুই কিনে এনেছিল। তাছাড়া দুঝুড়ি ভর্ত্তি বাগানের শাক-সবজি আর বড় দুহাড়ি ভর্ত্তি রাজভোগ।

মাছ আর তরকারি গাড়ির ছাদে তুলে দিয়ে মিষ্টির হাঁড়ি দুটো নিচে নিজের পাশে রেখেছিলেন তিনি।

কণকলতা যে বাড়িতে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে এখনো কোনো সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও শুধু হাতে কারুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তাঁর রুচিতে বাধে।

মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে তিনি থাকবেন না। তাও মনের মধ্যে উথাল পাতাল হচ্ছে। মনে নানারকম চিন্তার ঝড়।

বড় মৌ দৌড়তে দৌড়তে এসে বলেছিল, দাঁড়ান মা, মাছদুটোর মাথায় সিঁদুর দিয়ে দিই। বিয়ের কথা বলতে যাচ্ছেন, লক্ষণ করে দিই।

ধীরু বলেছিল মাছ বাজার থেকে কেনার কি দরকার? পুকুর থেকে দুটো বড় মাছ ধরিয়ে দেব।

কণকলতা রাজি হননি।

নরু বাজার খুঁজে মাছ দুটো ভালোই এনেছে। দাম অবশ্য একটু বেশী পড়েছে। দুটো চার টাকা।

ব্যাটারা বড় ধরিবাজি। যেই তোমার গরজ বুঝেছে অমনি দুটাকার মাছ চারটাকা হেঁকেছে, ধীরুর খুঁতখুতুনী দেখে বড় বৌ বলেছিল, আমাদের পুকুরে এতবড় মাছ আছে নাকি? মা বাজার থেকে মাছ কিনতে বলে ঠিকই করেছেন। তুমি আর এই নিয়ে খুঁত খুঁত করো না।

দিনকাল কি হয়ে গেল বড় বৌ, নিশ্বাস ফেলেছিলেন। ধীরু, শুধু মাছ কেন, সব কিছুই আগুন দর হয়ে গেল।

শৈলেন ময়রার দোকানে বায়না দিয়ে রাজভোগ করতে দিয়েছিলাম, বলেছে পাঁচ আনা সেরের কমে রাজভোগ দিতে পারবে না।

আগামী দিনের আকালের কথা চিন্তা করেই বোধহয় ধীরু চুপ করে গিয়েছিলো। আর কথা বাড়ায় নি।

ভরদুপুরে দরজায় গাড়ি দাঁড়াতে দেখে প্রহ্লাদ নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন, আসুন আসুন, আমার কি সৌভাগ্য।

কণকলতা ভেতরে যাবার আগেই শুকনন্দন মাছ মিষ্টির হাঁড়ি আর তরকারি বোঝাই দুটো ঝুড়ি গাড়ি থেকে নামিয়ে বারান্দার ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছিল।

এখানে নয়, কণকলতা অলোকের দিকে চোখ রেখে বলেছিলেন, জিনিসগুলো ভেতরে তুলে দিতে বলো।

প্রহ্লাদ না বললেও কণকলতার আগমণের কারণ বুঝতে দেরী লাগেনি প্রহ্লাদের। ভেতরে ভেতরে নিজেকে খুব দুর্বল মনে হয়েছিল তাঁর। প্রতিপক্ষ এত শক্তিশালী হলে তার সঙ্গে লড়াই করে জেতা সহজ নয়। তবু তিনি মনে মনে যুদ্ধকৌশল ছকে নিয়েছিলেন।

কার্পেটের ভারী আসনে বসে গায়ের চাদর আলগা করার পর কণকলতা বলেছিলেন, এত কষ্ট করে এতদূর এলাম যার জন্যে তাকে তো কোথাও দেখছি নে?

কী আশ্চর্য, এ বাড়িতে পা দেবার অনেক আগে থেকেই তাঁর বুকের প্রতিটি ধমনীতে একটা স্নেহের দুর্বহ নদী কলকলিয়ে বইতে সরু করেছে। কেন এমন হলো? যাকে এখনো চোখের দেখাও দেখেননি সে কি করে তার মনের এতখানি জায়গা দখল করে বসলো?

কণকলতা বুঝতে পারছিলেন এটিই ভবিতব্য। গোপাল গোপাল, আবার কোন্ মায়ায় জড়ালে ঠাকুর।

প্রহ্লাদের স্ত্রী সুধা এসে কণকলতাকে প্রণাম করল। ভরদুপুর বাড়িতে অতিথি আর এমন অতিথি সুধা সামান্য সময় বিভ্রান্ত হতভম্ব হয়ে থাকলো। তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, এইমাত্র এলেন, একটু বিশ্রাম নিন। তারপর—আমি বাইরে কোথাও কিছু খাইনে—কণকলতা বললেন, সঙ্গে আমার ছেলে আছে। অন্য লোকজন আছে তারা খাবে। কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দিতে হবে—

মনে মনে এই মুহূর্তটার জন্যেই কাঁটা হয়েছিলেন প্রহ্লাদ।

কণকলতা নিরস্ত্র হয়ে আসেননি। তার বৈভব আর অহংকারকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন। হয়তো এ পরিবারের এই রীতি। প্রহ্লাদের ভয়টাও এখানেই। ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য মানুষকে অমানুষ করে দেয়। তাঁর নিজের সংসারে অভাব নিত্যসঙ্গী। এখানে থেকে ঠিক বিপরীত মেরুতে গিয়ে তার মেয়েটি কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারবে না।

এত ভাবনা চিন্তার পরে প্রহ্লাদের কেন যেন মনে হলো কণকলতার বিরুদ্ধে তিনি বোধহয় জিততে পারবেন না। এটি আমার সেজ ছেলে। কণকলতা বললেন, স্বরূপগঞ্জে রায় মশাই-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি।

এ জেলাতে রায় মশাইকে চেনে না এমন মানুষ কম আছে। সেজ বৌকে তার বাপের বাড়ি দেখে পছন্দ করেছিলেন কণকলতা। বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি দুই নিয়েই মেয়েরা সম্পূর্ণ। যার বাপের বাড়ির পরিচয় নেই তার শ্বশুর বাড়ির হাজার পরিচয়েও তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে না। সেজ বৌ রূপসী নয়।

রূপ তো দুদিনের। তিনি নিজেও রূপসী ছিলেন না। কিন্তু নিজের এ হিসেব নিয়ে এখন তার নিজেরই ধন্দ হয়। মনে হয় অলোক বোধহয় অন্যরকম চেয়েছিল।

কেউ জানে না, এখনো তিনি গভীর রাতে উঠে এক একদিন অলোকের ঘরের বাইরে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে কোনো বিলাপের ধ্বনি ভেসে আসে কিনা নিজের কানে শুনতে চান।

কণকলতার বুকের মধ্যে তখন অলোকের মায়ের সঙ্গে কণকলতার তর্কাতর্কি সুরু হয়ে যায়।

সারারাত কণকলতা দুচোখের পাতা এক করতে পারেন না। নিজের অপরাধ বোধটাকে জোর করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কণকলতা বললেন, সামনের অঘ্রাণে ভালো দিন আছে। আপনার মেয়েকে ডাকুন। আমি আশীর্বাদ করে যাবো।

অলোক সবে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে কণকলতার কথাগুলো কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

(৯)

সেজবাবু—

দীননাথ মুহুরী। পকেট থেকে এক প্যাকেট পাসিংশো সিগারেট বার করলো দীননাথ, আপনার সিগারেট।

গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবীর পকেটে সিগারেটের প্যাকেটটা ঢুকিয়ে রেখে দীননাথকে কিছু বলতে গিয়ে বলল না অলোক। কয়েক মিনিট আগে এ বাড়িতে একটা নতুন প্রাণের আগমন ঘটেছে। অলোকের ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের ভাগীদার সে।

কণকলতা খুশি হয়েছেন। তাঁর বংশের আর একজন বাড়লো। তারমানে শাখা-প্রশাখায় এই নবজাতক আর একটি নতুন প্রশাখা। তার মধ্যে বেঁচে থাকবেন কণকলতা। একেই মানুষের অমরত্ব বলে। এমনিভাবেই মানুষ অনন্তকাল অনন্ত প্রবাহ নদীর মত প্রবাহিত হতে থাকে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে।

দীনু—

কিছু বলবেন সেজবাবু।

এইটে নাও—রাজার মুখের ছাপওয়ালা একটা দশটাকার নোট তার হাতে দিল অলোক। তোমার বৌদির ছেলে হয়েছে।

এতটাকা আমি নিয়ে কি করবো—দীননাথের বিভ্রান্ত চোখদুটো থিরথির করে কেঁপে উঠলো।

আহ্—কি অদ্ভুত এই দীননাথ লোকটা কোনো লোভ নেই, ইচ্ছে নেই, উদ্বেলিত হওয়া নেই....। এক এক সময় মনে হয় দীননাথ বোধহয় পাথরের তৈরী একটা মানুষের অবয়ব।

মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা পায়ের নীচে চেপে দিয়ে অলোক বলল, মিষ্টি খেও—

কথাটা বলেই তার মনে পড়লো একটা অবাস্তব অসম্ভব কথা বলে ফেলেছে। দশ টাকায় ঋষি ময়রার দোকানে একমন সন্দেশ পাওয়া যাবে।

আমি তাহলে যাই এখন, দীননাথ বলল, আজ মেজবাবু বলেছেন ভাঁটায় যাবেন। আপনাকে যেতে হবে না।

দশ বারো বছর আগে কোথা থেকে যেন এসে এ সংসারের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল দীননাথ। তিরিশ বত্রিশ বছরের পেটানো শরীর। সব সময়েই একটু পরিচ্ছন্ন ছিমছাম হয়ে থাকার অভ্যেস। মাথার চুল কখনো এলোমেলো থাকে না। দাড়ি রোজ কামানো চাই। গলায় তুলসীর মালা।

তবু দীনুর বাছবিচার নেই। খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো খুঁত খুঁতনী নেই।

কাছারিতে বসে কত্তা গড়গড়া টানছিলেন। সটান তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দীননাথ, একটা কাজ দেবেন। খাতা লিখতে জানি। হিসেব পত্তর জানি। তাছাড়া—সবটা না শুনেই কত্তা প্রশ্ন করেছিলেন, বাড়ি কোথায়?

নেই। ছিল।

কোথায় ছিল?

চব্বিশ পরগণায়।

কোথায়?

আজ্ঞে এর বেশী আর জিজ্ঞেস করবেন না। কাজ দিলে কোনদিন আপনার সঙ্গে তঞ্চকতা করবো না। কত্তা তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল মানুষটির মুখে সারল্যের সঙ্গে একটা গোপন দুঃখের ছায়াও যেন মিশে আছে।

আর কিছু জানতে চাননি। বলেছিলেন, ঠিক আছে। আমার ইঁটভাটার কাজ দেখাশোনা করবে। মাসে তিনটাকা করে পাবে। আর খাওয়া পরা সবকিছু। যাও ভেতরে যাও, ওরা তোমার থাকার ঘর দেখিয়ে দেবে।

সেই থেকে দীননাথ এ সংসারের একজন। সব সময় হাসিমুখ, বিনয়ী। কিন্তু একটা ব্যাপারে তার ভয়ানক জিদ। নিজের অতীতের কথা, পরিবার পরিজনের কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানাতে চায় না।

আপনাকে আজ বলতেই হবে, বাড়ির বৌরা একসঙ্গে এক একদিন চেপে ধরে দীননাথকে, আমরা শুনেছি আপনার বাড়িতে বৌ ছেলে আছে আপনি তাদের সঙ্গে রাগারাগি করে সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছেন। বলুন, বলুন আমাদের কি হয়েছিল?

দীনু তাদের কথায় একটুও রাগ করেনি। বলেছে, লক্ষ্মণ ঠাকুর আজ বড়ির ঝালটা ফাস্টক্লাস রেধেছে, আর দুটো ভাত দেবেন, বৌদি।

(১০)

ঠাকুরপো—

অলোক চোখ তুলে দেখল বড় বৌ অলকানন্দা। তার মুখেচোখে হাসি উপচে পড়ছে।

ঠাকুরপো, ছেলের বাবা হয়েছ আমাদের কি দেবে বলো?

কি নেবে বলো। অলোক হাসলো।

বড় বৌ একটুও না ভেবে বলল, ঠিক আছে, আমাদের সবাইকে একদিন নিমাই সন্ন্যাস পালা দেখাতে হবে।

মার মত নিয়েছ?

ও মা, সে যখন যাবো তখন তো নেব।

ঠিক আছে, নিয়ে যাবো।

বড় বৌ সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাচ্ছিল তাকে পেছন থেকে ডাকতে গিয়েও অলোক ডাকলো না। তার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে তা জানার।

সে না ডাকলেও বড় বৌ খানিকটা দূরে গিয়ে সেখান থেকেই ঘুরে বলল, কই জানতে চাইলে না তো সেজ বৌ কেমন আছে। তোমরা পুরুষরা সবাই একরকম। নিজের কাজটি মিটে গেলেই হলো আর কিচ্ছু চাইনে।

কৃত্রিম রাগের উত্তাপ ছড়িয়ে বড় বৌ চলে গেল।

এ বাড়িতে আজ যে সেজ বৌ সবকিছুর কেন্দ্রে। তাদের নিয়েই আলোচনা তাদের নিয়েই উৎসব। তারা দুজনা মিলে এই বৃহৎ সংসারকে তার ভাবী উত্তরাধিকারী উপহার দিয়েছে।

সাতদিন আঁতুড় মিটলেও অলোক জানে চঞ্চলাকে সে আরো পরে একলার করে পাবে। তার আগে পর্যন্ত সেজ বৌ এ বাড়ির সকলের। তার মাতৃত্ব এ বাড়ির আগামী দিনকে নিশ্চিন্ত করেছে।

আজ আঁতুড়ের কাজকর্ম্ম মিটিয়ে চা আর মুড়ির বাটি নিয়ে বসেছিল বিজলী। নতুন বৌ সামনে দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়াল। বিজলীদি, গুড় নেবে নাকি?

বিজলী তার দিকে অন্য একরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কিগো, এ বছরেই আমাকে আবার আসতে হবে মনে হচ্ছে।

যাঃ, নতুন বৌ তার ইংঙ্গিতটা বুঝে লজ্জায় সারা মুখ লাল করে পালাতে চেষ্টা করলো।

দাঁড়াও দাঁড়াও বৌদি, পালাচ্ছ কেন, বিজলী একমুঠো মুখের কাছে তুলে অম্লান বদলে বলে উঠলো, ভাতারকে আঁচলে বাধতে চাও তো তাড়াতাড়ি পেটে একটাকে নিয়ে এসো। ছেলেমেয়ে আসলে ওদের পায়ে ছেঁকল। আমার পোড়া কপাল দ্যাখো, আমি সারা রাজ্যের মেয়েদের পেট খালাস করে বেড়াই অথচ পোড়ার মুখো ভগবান আমার পেটটাই খালি রেখে দিল চিরকাল।

নতুন বৌ কি বলবে ভেবে পেল না। বিজলীর অন্ধকার দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরপায়ে সেখান থেকে সরে গেল।

ছেলেকে এক পলক দেখেছিল অলোক।

একদলা মাংসের পিন্ডের মতো ছোট্ট শিশুকে কাঁথায় মুরিয়ে তার সামনে এনেছিল বড় বৌ, এই নাও তোমার ছেলে দ্যাখো ঠাকুরপো।

পুতুলের মত ছোট্ট মুখে. ছোট ছোট চোখ কান মুখ আশ্চর্য সব কিছুই আছে—ভগবানের কি অদ্ভুত সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টি রহস্যে নয় অন্য কি এক কারণে অলকের সমস্ত চেতনায় বাধাভাঙ্গা একটা সুখের মত কিছু উথলে উঠেছিল।

পকেট থেকে একটা মোহর বার করে অলোক ঘুমন্ত শিশুটির বুকের ওপর টপ্ করে ফেলে দিয়েছিল।

ওমা, তুমি ছেলের মুখ দেখবে বলে পকেটে মোহর নিয়ে ঘুরছো নাকি?

না না, ছিল এমনি—তাড়াতাড়ি পা ফেলে সিঁড়ির দিকে এগোলো অলোক। সিঁড়ির শেষ ধাপে নামার পরেও বড় বৌয়ের খিলখিল হাসির শব্দ কানে ভেসে এলো তার।

(১১)

মা।

কণকলতা পূজোর আসন থেকে নীরব মুখ ফিরিয়ে বড় ছেলের দিকে তাকালেন। পূজো শেষ হতে এখনো দেরী আছে।

ধীরু একথা জানেন। তাও এসে পূজোর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে।

কণকলতার সাত ছেলের সকলেই সুন্দর। কিন্তু কণকলতা নিজে বলেন, ধীরুর সঙ্গে কারুর তুলনা করো না তোমরা। ও সকলের চেয়ে আলাদা।

প্রথম সন্তান বলে কণকলতার তার ওপরেই দুর্বলতা বেশী। কর্তার হঠাৎ মৃত্যুর পর আঠারো বছরের ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন এখন থেকে তোমার

ওপরেই সব দায়িত্ব। এ বাড়ির উন্নতি হলে তোমার হাতেই হবে। পতন ঘটলে তাও তোমার জন্যেই। তুমি তাই বলে নিজেকে একলা মনে করোনা। আমি সব সময় তোমার সঙ্গে থাকবো।

সেদিন তিনি যা বলেছিলেন আজ পর্যন্ত তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছেন।

কত্তার অবর্তমানে এ সংসারের আরও বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। চাল কল আর ইঁটভাটা আগে থেকেই ছিল। এখন সুরকি কল বসানো হয়েছে। পাঁচ বিঘের একটা বাগান কেনা হয়েছে শ্মশানে যাবার রাস্তার ধারে।

একতলা বাড়ি দোতলা হয়েছে। একখানা ঘোড়ার গাড়ি ছিল, দুখানা হয়েছে। একটা গাড়িতে বাড়ির মেয়েরা তারা সুন্দরী বিদ্যামন্দিরে পড়তে যায়। অন্যটা ব্যবসার কাজে ছেলেদের নিয়ে নানা জাগয়ায় যাতাযাত করে। বাড়ির পেছন দিকে দুবিঘে জায়গা কিনে আস্তাবল করা হয়েছ। কচুয়ান দুজন আর একজন সহিস সেখানেই থাকে।

জপ শেষ করে মাটিতে গড় হয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে কণকলতা উঠে পড়লেন। ভারী শরীরে মটকার চাদরখানা জড়াতে জড়াতে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কি বলছিস ধীরু?

খুব খারাপ খবর মা। এবার বোধহয় আর পয়লা বৈশাখে হালখাতা করা যাবে না।

কেনরে, তোর ঠাকুরদাদার আমল থেকে প্রতিবছর হালখাতা হয়ে আসছে সেটা বন্ধ করে দিবি?

ধীরু বলল, না দিয়ে উপায় কি বলুন! মানুষের না খেতে পেয়ে মরার অবস্থা হয়েছে। বেগুন দু পয়সা থেকে পাঁচ পয়সা সেরে উঠেছে। গত মাসে যে চাল ছিলো দুটাকা মন তার দাম এখন চার টাকা। কুটুমবাড়ি পাঠানোর জন্যে শৈলেন ময়রার দোকানে সন্দেশের বায়না দিয়ে পাঠিয়েছিলাম বলেছে কাঁচাগোল্লা আট আনা সেরের কমে দিতে পারবে না। এই অবস্থায় কে আমাদের পাওনা ধার শোধ করতে আসবে বলুন। আর মানুষই যদি না আসে কার হালখাতা করবো?

বাজারে জিনিষপত্রের দাম দিন দিন আগুন হচ্ছে তার আঁচ কণকলতাও টের পাচ্ছিলেন। তিনি চার দেওয়ালের মধ্যে থাকলেও বাইরের হাওয়া কোনদিকে কেমনভাবে বইছে তার সব খবরই রাখেন।

মাথার চুলে আঙুল ডোবালেন কণকলতা। এটি তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। ছেলেদের মত করে তার মাথার চুলও ছোট করে ছাঁটা। কোমড় পর্যন্ত একঢাল কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল মাথায়। স্বামী মরার পর অশৌচ মেটার আগেই নিজে হাতে সেই চুলের রাশি মুড়িয়ে কেটে ফেলেছেন। তারফলে মুখখানা এখন চৌকো ধরনের দেখায়। মনে হয় এই মুখখানা একটি উদাসীন মানুষের মুখ। কিছুটা রুক্ষ এবং কঠোরও।

মা, কি ভাবছেন?

নরুকে বলো বাজারে কতোটাকা পড়ে আছে তার একটা হিসেব যেন আমাকে দেয়।

আচ্ছা, ধীরু বলল, ত্রিনাথ মামা এসেছেন।

মেজ বৌমা আপনার ঘরে বসিয়েছে।

ত্রিনাথকে আসার জন্যে তিনিই খবর পাঠিয়েছেন। কত্তার বাৎসরিক এসে পড়ল। তার আগেই একটা জোড়া সত্যনারায়ণ করার ইচ্ছে। তিনি নক্ষত্র দেখে প্রশস্ত দিন বলে দেবেন ত্রিনাথ। সেই মতোই সব আয়োজন হবে।

খাও ঠাকুর খাও — ঠাকুর ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দিলেন কণকলতা। তারপর দোতলার সিঁড়িতে পা রাখলেন।

এত তাড়াতাড়ি কোনদিনই তাঁর ওপরে ওঠা হয় না। ভালকরে সকাল হবার আগেই নীচে নেমে আসেন। তারপর সংসারের ঝক্কি ঝামেলা মিটে যাবার পর বৌরা আঁশ রান্নাঘরের মেঝেয় গোল হয়ে খেতে বসলে তিনি ওপরে ওঠেন। সেদিনের মতো আর ওপর থেকে নামেন না। এতবড় সংসার। দুবেলায় একশোটি মুখে অন্ন জোগাতে হয়। তার আয়োজন বড় কম নয়।

দোতলায় উঠে নিজের ঘরে পা রেখে কণকলতা দেখলেন ত্রিনাথ একটা কার্পেটের আসনে মুখ নামিয়ে বসে আছেন।

ত্রিনাথ, ভালো আছো?

তার প্রশ্নের জবাবে এপাশ ওপাশ মাথা দোলালেন ত্রিনাথ। রক্ত চন্দনের তিলক আঁকা কপালে ডান হাত রেখে বললেন, তোমার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। কাল জগৎ গিয়েছিল। সে বলে এসেছে আজই আসতে হবে। তোমার কি নাকি জরুরী দরকার।

কণকলতা ত্রিনাথের মুখের ওপর চোখ রেখে কিছু ভাবছিলেন। সেই অবস্থাতেই মাথায় ঘোমটা টানলেন। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার

খুব বিপদ ত্রিনাথ। তাঁর গলায় কথাগুলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

তুমি পুজো আহ্নিক সেরে এসেছ ত্রিনাথ?

হ্যাঁ দিদি।

তাহলে আগে একটু সরবৎ দিক তোমাকে। তারপর আমার কথা বলছি।

দক্ষ দক্ষ—দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে কণকলতা ডেকে উঠলেন, বড় বৌমা—মেজ বৌমা—

তার ডাক শুনে ওপারের মহল থেকে ছাদ পেরিয়ে দৌড়ে এলো বাসন্তী। বৌদিরা নীচে, কি বলছো?

ত্রিনাথকে সরবৎ দিতে বল্।

আচ্ছা—বাসন্তী যেমন দৌড়ে এসেছিল সেইভাবেই ছুটে চলে গেল। সে যাবার পর ত্রিনাথ হেসে বললেন, দিদি, তোমার এই ছোট মেয়ে অন্য সব মেয়ের চেয়ে আলাদা। হ্যাঁ। কণকলতা নিজের মনের অসন্তোষ লুকোনোর চেষ্টা না করে বললেন, এত বয়স হলো ছেলেমানুষী গেল না। দিনরাত ধিঙ্গিপনা করে বেরাচ্ছে।

ইস্কুলে যাচ্ছে না?

নাহ্, এতবড় মেয়ে আর স্কুলে গিয়ে কি শিখবে? পাঁচ ক্লাস ওঠার পর ওর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আজকাল মেয়েরা দু-একটা পাশটাশও করছে কিন্তু—কণকলতা ত্রিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথায় কোনো তিরস্কার নেই বুঝে নিয়ে বললেন, মনোরঞ্জনের কাছে গান শিখছে।

গান। ত্রিনাথ একটু থেমে বললেন, তোমার ছোট মেয়ে দীর্ঘায়ু এবং বিবাহিত জীবনে সুখী হবে।

ত্রিনাথ—

হ্যাঁ দিদি। ওর মুখে আমি আমৃত্যু সুখের আলো দেখতে পেলাম। ওকে তুমি তিরস্কার কোরো না। যেমনভাবে থাকতে চায় থাকতে দিও।

মেজ বৌ অরুন্ধতি পাথরের গ্লাসে সরবৎ আর পাথরের ডিসে একদলা কাঁচা সন্দেশ এনে ত্রিনাথের সামনে রেখে মাথায় স্খলিত ঘোমটা টেনে একপাশে সরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো।

অরুন্ধতির বাঁশির মতো নিটোল নাকে হিরের নাকছাবিতে আলো না লেগেও দপ্ দপ্ করছে। অরুন্ধতিকে দেখলেই কেন যেন কণকলতার বুকের মধ্যে স্নেহ উথলে ওঠে। ন বছর বয়সে মেজ ছেলে স্নেহাংশুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তখন

কোনো বুঝসুঝও হয়নি। ফ্রকের ওপর শাড়ি জড়িয়ে সারা বাড়ি দৌড়ে বেরাতো। এক একদিন কত্তার কাছে গিয়ে দু হাতে বুকের সঙ্গে জড় করে ধরা শাড়িটা ফেলে দিতে বলতো, বাবা শাড়িটা খুলে গিয়েছে পরিয়ে দিনতো। মুখ থেকে গড়গড়ায় নল সরিয়ে হাসি মুখে পুত্রবধুর মাথায় হাত রাখতেন কর্ত্তা। বলতেন, তোমার শাশুড়ির কাছে যাওমা। তিনিই তোমায় শাড়ি পরিয়ে দেবেন। কি বুঝতো কে জানে, শাড়িটা তুলে নিয়ে আবার একছুটে কণকলতার কাছে গিয়ে হাজির হতো সে।

হাত ধোবার জল এনে দেব মা?

দাও।

ত্রিনাথ স্মিত মুখে বসেছিলেন। মনে মনে বললেন, দিদি তোমার সৌভাগ্য দেখে হিংসে করতে ইচ্ছে করে। এমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত বৌ যে বাড়িতে থাকে, সে সংসারের ঘরদোরে দিনরাতে অসংখ্যবার তার পদচিহ্ন পড়ে সে সংসারের বাড়বাড়ন্ত হবে নাতো কোথায় হবে।

বিয়ের আগে আত্মীয়স্বজন সবাই বলেছিল স্নেহাংশুর সঙ্গে এই মেয়েকে মানাবে না। কণকলতা কারুর কথা শোনেন নি। তিনি বুঝেছিলেন, এই মেয়েই স্নেহাংশুকে সুখী করতে পারবে। মেয়েদের বাইরের রূপের চটক্ কতদিন থাকে? পেটে একটা এলেই বেশীরভাগ মেয়েরই তোবরানো বোগনোর মত দশা হয়ে যায়। তখন আর তার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করে না।

সরবতের গ্লাসটা খালি করে নামিয়ে রাখলেন ত্রিনাথ। মিষ্টি ছুঁলেন না। বললেন, এবার বলো দিদি কেন্ ডেকেছ?

এতক্ষণ নিজের মধ্যে ডুবেছিলেন কণকলতা। ত্রিনাথের কথায় তাঁর ঘোর কাটলো।

বললেন, আমি ভাবছি পারুলকে এনে আমার কাছে রাখবো।

কেন?

ওর ওপর বড় অত্যাচার হচ্ছে।

সেকি, পারুলের বিয়ের আগে আমিই ওর ঠিকুজি গণনা করেছিলাম। কই অশুভ কিছুতো নজরে পড়েনি? তাহলে?

কণকলতার বড় মেয়ে পারুলের দোজবরে বিয়ে দিয়েছেন। বড় জামাই প্রণবেশ অতি সজ্জন মানুষ। নিরীহ এবং সৎ। প্রণবেশের বাবা ছিলেন একটা রাজ স্টেটের দেওয়ান। একমাত্র ছেলে প্রণবেশের বিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতার

নামকরা কবিরাজের মেয়ের সঙ্গে। দুটি অল্পবয়সী মেয়ে রেখে প্রণবেশের প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর পারুলের সঙ্গে প্রণবেশের বিয়ে দিয়েছিলেন কণকলতা।

পারুলকে অনেকটা তাঁরই মতো দেখতে। কথায় কথায় হাসে পারুল। আর যখন হাসে মুক্তোর মত দাঁতে একটা অপূর্ব শ্রী ফুটে ওঠে তার সারা মুখখানি জুড়ে।

প্রণবেশ নিজে বিয়ের আগে মেয়ে দেখতে এসেছিল। পারুলকে দেখার পর তার পছন্দের কথা জানাতেও দ্বিধা করেনি।

তবু বিয়েটা চট করে হয়নি। মনের মধ্যে অনেকগুলো কিন্তু ছিল কণকলতার। মনে মনে ভেবেছিলেন, থাক্‌গে, দুদিন পরে পারুলের বিয়ে হলেও সংসার আটকে থাকবে না।

ধীরু ঠিক উল্টো কথা বলেছিলেন, মা, ভেবে দেখুন। পারুলের পর আরো দুজন আছে। তাদেরও পার করতে হবে। ব্যবসাপত্তরের অবস্থা কখন কি হয় কে বলতে পারে। সোনার ভরি বাড়তে বাড়তে আঠারো টাকায় উঠেছে।

ধীরুর সব যুক্তি অকাট্য। তবু পারুলকে দোজবরের হাতে তুলে দিতে মন চায়না তাঁর। মেয়েটা বড্ড সরল। তার মনের মধ্যে একটা ছেলে মানুষীর জগৎ লুকানো আছে। এমন মেয়ে বিয়ের পর অসুখী হলে মনের দুঃখ কোথায় লুকোবেন কণকলতা। অনেক ভাবনা চিন্তার পর ত্রিনাথকে ডেকেছিলেন। তাঁর সামনে পারুলের ঠিকুজিটা ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, গণনা করে বলো, ও ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে পারুল সুখী হবে?

(১২)

সেই পারুলের জন্যেই আজ আবার ত্রিনাথকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি।

এ ঘরটা কণকলতার। পাশাপাশি পাতা চারখানা তক্তাপোষ জুড়ে রাতে তোষোক পেতে টানা বিছানা করা হয়। দুপাশে সব কজন নাতি নাতনীকে নিয়ে শুয়ে থাকেন তিনি। ছোট মশারীতে তাঁর দম আটকে আসে বলে হেঁসেদের দোকানে অর্ডার দিয়ে বিলিতি নেটের ছাদসমান উঁচু মশারী করানো হয়েছে। মশারী খোলা যায় না গুটিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

ত্রিনাথ সেইদিকে তাকিয়েছিলেন আর মনে মনে অন্য কথা চিন্তা করছিলেন।

পারুলের জন্ম কুন্ডলীতে ভরা ঐশ্বর্যের চিহ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাহলে কি ঐশ্বর্য আর সুখ এক বস্তু নয়? দুমহলা বাড়ি, প্রচুর বিত্ত আর সংসারের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব—এর ওপর সুখী হতে হলে মেয়েদের আর কি লাগে?

পারুলের পর পর দুটো মরা ছেলে হলো। কণকলতা ধীরে ধীরে বললেন, আমার বংশে অন্য কারুর বেলায় এরকম হয়নি।

ত্রিনাথ সরাসরি প্রশ্ন করলেন, আর কি কষ্ট পারুলের? কণকলতা বললেন, সতীন মেয়েটা মরার পরেও জ্বালাচ্ছে। দিনেরাতে যখন তখন সামনে চলে আসে। পায়খানার দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। খেতে বসলে ভাতের থালায় নোংড়া ফেলে দেয়।

অবিশ্বাস্য, এরকমও হয় নাকি দিদি?

ত্রিনাথের দুচোখের মণিতে দ্বিধার ছায়া দুলতে থাকলো, যা বললে তা সত্যি?

সত্যি।

মেয়েটার জন্যে গয়ায় পিন্ডদান করা হয়নি?

হয়েছে। পারুল ওখানে থাকলে বাঁচবে না। গভীর একটা নিশ্বাস ফেললেন কণকলতা, কথা বলতে বলতে, সতীন এরকম করে আমি আগেও শুনেছি।

সত্যিই দুশ্চিন্তার বিষয়। ত্রিনাথ কয়েকমুহূর্ত চুপ করে বললেন, পারুলের কুষ্ঠি আমি আবার গণনা করে দেখবো। আমার মনে হয় এ বিপদ কেটে যাবে। আপনি ভাববেন না।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখার আগে একটু দাঁড়ালেন ত্রিনাথ। মুখ তুলে বললেন, পারুল আবার সন্তান-সম্ভবা। এ অবস্থায় ওকে এখানে এনে রাখাই মঙ্গল। অমাবস্যা কেটে গেলে আমি আবার আসবো দিদি।

একবার সময় করে আজই দিদি স্বর্ণলতার কাছে যেতে হবে। দুহাত দূরে থাকেন স্বর্ণলতা তাও কতোদিন হলো তার কাছে যাবার সময় পাননি।

কণকলতা উঠে পড়লেন।

বসে থাকলে চলবে না তাঁর। ভারী শরীর বার বার ওপর নীচ করতে কষ্ট হয়। হাতে আর দু পায়ে বাত। অমাবস্যা পূর্ণিমায় এমন যন্ত্রণা হয় বিছানায় শুয়ে সারাক্ষর কাৎরাতে থাকেন।

কিছুদিন হলো অলোক কলকাতা থেকে ব্যাটারী লাগানো একটা মেশিন এনে দিয়েছে। বাতের যন্ত্রণা বাড়লে হাতে পায়ে তার জড়িয়ে চাকা ঘুরোলে সারা শরীরে একরকম বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্যে কষ্টের উপশম হয় তখন।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে কণকলতা মনে মনে হিসেব করে দেখলেন আজ অমাবস্যা পূর্ণিমা কিছুই নয়। তবু সকাল থেকে হাত পা কন্ কন্ করছে।

নীচে নেমে এসে তিনি দেখলেন দালানে নবৌ মেয়ে কোলে করে দাঁড়িয়ে

আছে। পর পর দুটোই মেয়ে হলো ন বৌয়ের। নতুন মেয়েটার দুমাসের মতো বয়স হলো। গোল গাল পুতুলের মতো দেখতে হয়েছে। রংটা চাপা হলেও জন্মের সময়েই একমাথা চুল হয়েছে।

নাক মুখ রং এখনই অবশ্য বোঝা যাবে না। দিনে দিনে বদলাতে থাকবে। হাত বাড়িতে নবৌয়ের কোল থেকে শিশুটিকে নিজের বুকের মধ্যে নিলেন কণকলতা। নাতনীর মুখ আগেই দেখেছেন কণকলতা।

ছোট্ট ছোট্ট দুটো হাত থাবা দিয়ে বুকের কাপড় হাতড়াচ্ছে বাচ্চাটা। কণকলতার বুকের মধ্যে একটা সীমাহীন তৃপ্তির স্বাদ কলকলিয়ে ছলছলিয়ে বান ডাকার মতো তাকে গ্রাস করে অবশ করে ফেলল।

এই সদ্যজাত শিশুসন্তান যখন বড় হবে, সংসারের নিত্য প্রবাহে একজন শরিকের দাবীতে জীবনের ছকবাধা রাস্তায় সময়কে সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যাবে তখন তিনি এই পৃথিবীর কোথাও থাকবেন না। শুধু ক্ষণকালের জন্যে এই শিশুটির হৃদয়ে একটি মন কেমন করা বাতাস হঠাৎ হঠাৎ উৎরোল হয়ে উঠে বিস্মরণের ধুলো মুছে তাঁকে নিজের স্মৃতিতে তুলে আনবে।

শুধু সেইটুকু..... সেইটুকুর জন্যেই তাঁর পুতুল খেলার মতো করে সংসার সংসার খেলা। সেইটুকুর জন্যেই তাঁর প্রার্থনা। বেঁচে থাকা।

কত্তামা—নরু মুহুরীর ডাকে সম্বিত ফিরলো কণকলতার। চোখ তুলে দেখলেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নরু।

স্যাকরার বাড়ি পাঠিয়েছিলেন তাকে।

পাতলা কাগজের একটা মোড়ক বাড়িয়ে ধরলো নরু।

কণকলতা তার হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে খুলে ফেলেন। দুটো সোনার ছোট মিছড়ি কাটা বালা। আর একছড়া হার। সকালের রোদ্দুর লেগে ঝক্‌ঝক্ করছে। কণকলতা বললেন, নাও বৌমা, তোমার মেয়েকে পড়িয়ে দাও। মেয়ে হয়ে সংসারে এসেছে গলা খালি হাতে থাকতে নেই।

নিজের বুক থেকে শিশুটিকে তার মার কোলে দিয়ে কণকলতা জিজ্ঞেস করলেন, গহনার ফর্দ্দ দিয়েছে?

হ্যাঁ, কত্তামা। চার ভড়ি সোনা কুড়ি করে আশি টাকা। আর মজুরী চার টাকা। মোট একশো টাকা।

সোনার দাম আঠারো থেকে কুড়িতে উঠে গেল। একটু চিন্তিত দেখাল কণকলতাকে। ঘরে এখনো দুটি আইবুড়ো মেয়ে আছে। আত্মীয়স্বজনের বিয়ে

পৈতে মিলিয়ে সোম বচ্ছর তাও কম সোনা দিতে হয় না। এসব দেওয়া থোওয়া কি শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে হবে। না প্রাণ থাকতে তা তিনি হতে দেবেন না। এ বংশের যে রীতি এতকাল ধরে চলে আসছে তা ভাঙ্গার অধিকার কারুর নেই।

নরু—

কত্তামা।

বাজারে চাল কতো করে জানো?

হ্যাঁ কত্তামা। ঝিঙেশাল পাঁচ টাকা, গোবিন্দভোগ সাত টাকা মন।

তুমি এক কাজ করো নরু। সুধীরকে খবর দিয়ে দিও যেন বিশ বস্তা চাল কালই পাঠিয়ে দেয়। ঘরে চাল আর নুন থাকলে ভয় থাকে না।

সুধীরকে খবর দিচ্ছি কত্তামা।

নরু চলে যাবার আগেই দীননাথ এলো। আটপৌরে মোটা ধুতি আর টুইলের পাঞ্জাবী পরনে। এ বাড়ির কেউ নয় দীননাথ। ব্যবসার হিসেবের খাতা দেখে। খদ্দেরকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাওনা গন্ডা আদায় করে। দরকার হলে ভাঁটায় গিয়ে কুলিও খাটায়।

তার দিকে তাকিয়ে কণকলতার মনে হলো অনেকদিন আগে যেন তার দীননাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারপর কয়েকটা বছর কেটে গেছে..... দীননাথের চাবুকের মত সটান শরীরটায় বয়সের ছায়া পড়েছে। দুচোখে ক্লান্তি।

আহারে—

দীনু।

কত্তামা। বড়কত্তার বাৎসরিক-এ কাকে কাকে বলা হবে ধীরুবাবু জানতে চাইলেন।

কণকলতা তার কথা কানেই তুললেন না। বললেন, দীনু, তুমি আজই হেঁসেদের দোকানে গিয়ে একসঙ্গে চারটে পাঞ্জাবী করিয়ে নেবে। তুমি ছেড়া জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াও আমার দেখতে ভালো লাগে না।

দীনু কুণ্ঠিত হেসে বলল, ধীরুবাবু বলেছেন কাজে যত দই মিষ্টি লাগবে ঈশ্বর ময়রার দোকানে আজই বলে দিতে।

দীনুর মুখে একই পরিচিত হাসি। বিনয়ী মানুষ যেরকম করে হাসে। সংসারে কতো রকমের না মানুষ দেখেছেন কণকলতা। তাদের কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। দীনুর কারুর সঙ্গে তুলনা হয় না। তবু চেনা দীননাথকে এক এক

সময় খুব অপরিচিত মনে হয়। একতলার কাছারীঘরের পাশে একটা খুপরিতে থাকে সে। দুবেলা রান্নাঘরের বারান্দায় মাটিতে পিঁড়ি পেতে বসে একলা খেয়ে চলে যায়। কণকলতা লক্ষ্য করে দেখেছেন দীননাথের খাওয়ার মধ্যেও কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব আছে। কণকলতা কোনদিন তাকে বলতে শোনেননি, ঠাকুর আর একহাতা ভাত দাও।

দীনু চলে যাবার পর সরবতের গ্লাসটা কণকলতা সবে মুখে তুলেছেন এমন সময় চিৎকার করে কারুর কেঁদে ওঠার শব্দটা তাঁর কানে ভেসে এলো।

কে কাঁদছে গো অমন করে, ...ও মেজ বৌমা, মেজ বৌমা শিগগির দ্যাখোতো দোতলায় কে কাঁদছে.... সরবতের গ্লাসটা ভর্তিই নামিয়ে রাখলেন কণকলতা। চেঁচিয়ে দক্ষকে ডাকলেন.... দক্ষ... এই দক্ষ.... হারামজাদী কোথায় যে মরতে যায়, ডাকলে সাড়াটা পর্যন্ত দেয় না।

কান্না তখনো থামেনি। বরং বেড়েই চলেছে—ও মাগো আমার একি সব্বোনাস হলো গো... আমি মরলে আমার মাগ ছেলের কি হবে গো.... তোমরা কে কোথায় আছো বাঁচাও গো....

দক্ষ রান্নাঘরে কি যেন করছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে একদৌড়ে দালান পেরিয়ে সিড়ির মুখে কণকলতাকে দেখে বলল, তোমার আর ওপরে উঠতে হবে না, আমি দেখছি কি হয়েছে।

সে সিঁড়িতে ওঠার আগেই বাসন্তী ওপর থেকে নেমে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

কি হয়েছ রে, অতো হাসছিস্ কেন এই বাসন্তী—

দক্ষ গজগজ করতে লাগলো, কি জানি বাপু, বাড়িসুদ্দু সব পাগল হয়ে গেল নাকি?

বাসন্তী উঠে বসে কথা বলতে গিয়েই আবার হেসে গড়িয়ে পড়লো। অত হাসি যে তার দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। সারামুখ হাসির দমকে সিঁদুর বর্ণ। চোখে জল।

দক্ষ তার অবস্থা দেখে তাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল, চুপ কর। চুপ কর বলছি... হাসতে হাসতে শেষে একটা অনর্থ ঘটে যাবে।

বাসন্তীর হাসি বন্ধ হবার আগেই অরুন্ধুতি নীচে নেমে এসে শাশুড়িকে বলল, আপনি ওপরে যান মা, দেখুন গিয়ে কি কান্ড।

লক্ষ্মণ ঠাকুর রান্না ছেড়ে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। সরষে পিষতে

পিষতে কাজ অর্দ্ধেক ফেলে রেখে উধাও হয়েছে দক্ষ। সরষে না হলে সুক্তো সম্বরা দিতে পারবে না।

কান্না এখনো থামেনি। বিলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে এসে কণকলতা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ওপরের দালানে পা ছড়িয়ে একটানা কেঁদে চলেছে বিশু গাড়োয়ান। তার ইস্পাতের মতো ছ ফুটের পেটানো শরীরটা কুঁকড়ে গেছে। তাকে ঘিরে বাড়ির মেয়ে বৌ-ঝিদের ভিড়।

কি হয়েছে রে বিশু, কাঁদছিস কেন চুপ কর, চুপ কর। অলকানন্দা মুখে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুখটা শাড়ি সরিয়ে বলল, আপনার ছেলে ওকে দিয়ে দই মিষ্টি পাঠিয়েছিল। মাথায় করে সে সব নিয়ে দোতলায় উঠে এখন আর সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারছে না। আমরা সবাই ওকে কতো বোঝাচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও কিচ্ছু হবে না, ততই ও চিৎকার করে কাঁদছে। বলছে ওখান দিয়েও কিছুতেই নামতে পারবে না। নামলে নাকি মরে যাবে।

কণকলতা বললেন, তোমার যাও, আমি দেখছি। ভুজঙ্গ কোথায়?

বোধহয় গাড়ীতে বসে আছে। তাকে আসতে বলবো মা?

ভুজঙ্গ কচুয়ান। এ বাড়ির দুখানা ঘোড়ার গাড়ির একখানা চালায় সে। পালোয়ানের মত চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা কদমছাট চুল। গলায় কালো কারে বাধা রূপোর তক্তি।

দু তিন মিনিট পরে ভুজঙ্গ এসে দাঁড়াল, মাইজী।

কণকলতা বিশুকে দেখিয়ে বললেন, ওকে তুলে নিচে নামিয়ে দাও। ভয় পেয়েছে।

বিনাবাক্যে বিশুর দশাসই দেহটা ভুজঙ্গ অক্লেশে দুহাতে করে তুলে নিল। তারপর হাসতে হাসতে নীচে নেমে গিয়ে তাকে উঠোনে নামিয়ে দিল। কণকলতা দোতলার ছাদের আসলে থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন বিশু উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

দক্ষ—এই দক্ষ—কণকলতা চেঁচিয়ে দক্ষকে ডাকতে থাকলেন।

দক্ষ এসে বললেন, বলি কানে কালা হয়েছিস নাকি, কখন থেকে চিৎকার করতে করতে গলা চিরে যাবার যোগার।

কি বলবে বলো না।

ওর গামছায় এককাঠা মুড়ি ঢেলে দে। সঙ্গে দুটো মোন্ডাও দিস্। এতক্ষণ ধরে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে ওর খিদে পেয়ে গিয়েছে।

দিচ্ছি। দক্ষ গজগজ করতে করতে চলে গেল, এ সংসারের সবই বিচিত্তির। অতোবড় মিনসে মেয়েদের বাড়া ন্যাকা। দোতলায় উঠে ওনার প্রাণটাই বেরিয়ে গেল...। তারজন্যে আর একজনের আবার কতো দরদ। ও দক্ষ ওকে মুড়ি দে.... মন্ডা দে। পাখায় বাতাস কর... যতো আস্তাকুঁড়ের ছাই ফেলার জন্যে এই দক্ষমাগী আছে—। যাই মুড়ি দিইগে—

ভাড়াঘরের দরজায় ছেকল তুলে দিয়ে পেছন ফিরে দক্ষর চোখে পড়লো দুটি চোখ তারদিকেই অপলক তাকিয়ে আছে।

ওমা। তুমি এখানে কি করছো গো। দক্ষ হেঁট হয়ে শিশুটির গাল টিপে দিল, তোমার মাকে খুঁজতে এসেছ বুঝি? চলো আমার সঙ্গে চলো।

দক্ষ তাকে কোলে তুলে নিল।

শিশুটি রিনরিণে গলায় বলল, মোটেই আমি মাকে খুঁজতে আসিনি।

তবে কাকে খুঁজছিলে?

বাসন্তীকে।

বাসন্তী তোমার পিসি হয়, নাম ধরে ডাকতে নেই।

যাঃ বাসন্তী তোমার পিসি হয়।

অলোকের ছেলে টুটুল। এই সবে চারে পড়েছে। বাড়ির সব কজন বাচ্চা বাসন্তীর ভক্ত। দিনরাতের আটপ্রহর বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আছে সে। এখন স্কুল ছাড়িয়ে দেবার পর তার আরও সুবিধে হয়েছে।

চোখে দেখলেই কণকলতা ছোট মেয়েকে শাসন করেন; বলি দিনরাত্তির ধিঙ্গি হয়ে নেচে বেরালেই চলবে, পরের সংসারে যেতে হবে না?

কণকলতার কথা শেষ হবার আগেই বাসন্তী উধাও। পারতপক্ষে মাকে এড়িয়েই চলে বাসন্তী। কখনো মুখোমুখি হয়ে গেলে পালিয়ে বাঁচে।

একদম বাড়ি ছাড়া হয়েছে কণকলতার এই মেয়েটা। বাঁশপাতার মতন ছিপছিপে হাল্কা চেহারা। মুখে এমন একটা মিষ্টি ভেসে আছে যার জন্যে বোঝা যায় না ষোলোয় পা দিয়েছে। ছোট কপাল, সামান্য চাপা থুতনী আর ফর্সার দিকে রং।

যে দ্যাখে সেই বলে, তোমার এই মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না।

তাও ভাবেন কণকলতা। তিনি জানেন, এ সংসারে মেয়েরা অনন্তকাল ধরে

ছোট হয়ে থাকতে পারে না। তার শরীরের গঠন তাকে অবশ্যম্ভবী রূপে একদিন শিশু থেকে নারীতে পরিণত করে দেয়। এবং সেইক্ষণ থেকেই অগণিত শ্বাপদসঙ্কুল জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তের দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হয়ে হয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হয়।

রোজ সন্ধ্যায় গৌর মাস্টার আসে বাসন্তীকে গান শেখাতে। দোতলার দালানে মাদুর পেতে বসে হারমোনিয়ামের রীডে আঙ্গুল চেপে চেপে বাসন্তী গৌর মাস্টারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে—"আমায় চাকর রাখো জী—"

এ বাড়ির মেয়েরা আটে পা দিয়েই ফ্রক ছাড়ে। আর শাড়ি পরা মেয়ে স্কুলে পড়তে যাবে, আর পাঁচটা এলেবেলে মেয়ের সঙ্গে মিশে আজেবাজে জিনিষ শিখে আসবে এসব ভাবলেই মনের মধ্যে ঝড় ওঠে কণকলতার। গৌর মাস্টারের কাছে গান শেখা নিয়েও ধীরু আপত্তি করেছিল। বলেছিল, ঐ গৌর মাস্টার বাড়ির অন্দরে ঢুকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাসন্তীকে গান শেখাবে?

কি বলছেন মা, লোকটা যে খ্যামটা গায়?

কীর্ত্তনও গায় গৌর। কণকলতা বলেছিলেন, অত খুঁত বার করলে তোমার বোনের কিছুই শেখা হবে না।

নবৌমা তো গান জানেন, ধীরু বলেছিল, বাসন্তী তার কাছেই দুবেলা হারমোনিয়াম নিয়ে বসতে পারে।

কণকলতা জানেন সোনাদানা দানসামগ্রী দুহাত ভরে দিলেও আজকালকার ছেলেদের মন ওঠেনা। কেউ জানতে চায় মেয়ে গান জানে কিনা। কেউবা আর একটু এগিয়ে চায়—মেয়ে দু পাতা ইংরিজি পড়তে পারে তো?

না, কণকলতা বলেছিলেন, নবৌমার কোলে বাচ্চা। সে বাচ্চা সামলাবে না গান শেখাবে?

সেই থেকে এ বাড়িতে গৌর মাস্টারের যাতায়াত সুরু হয়েছিল। মাইনে মাসে দু টাকা।

মাস তিনেক পর একদিন কণকলতা গৌরকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি গৌর, তোমার ছাত্রী ঠিকমতো শিখছে?

আজ্ঞে, সা-রে-গা-মা টা বেশ রপ্ত করেছে।

দু একটা ঠাকুরের গান শিখিয়ে দিও কেমন?

যে আজ্ঞে।

আর শোনো, তোমার জন্যে আমি একখানা গরম চাদর আনিয়ে রেখেছি, যাবার সময় নিয়ে যাও।

(১৩)

বাসন্তী, এই বাসন্তী। পেছন থেকে বাসন্তীর শাড়ি ধরে টানলো টুটুল। আমি তোর কাছে শোবো। চৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা গল্প পড়ছিল বাসন্তী। দুপুরের এ সময়টাতে বাড়ির এ মহলটা একদম সুনসান ফাঁকা থাকে।

বৌরা সবাই কণকলতার ঘরে।

আসর বসে সেখানে। পাঁচটার আগে সে আসর ভাঙ্গে না। তারমধ্যে বেলা পড়ে গেলে তাসের আসর থেকে একজনা উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজায় দরজায় গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে শাঁখে তিনবার ফুঁ দিয়েই আবার তেমনি দৌড়তে দৌড়তে আসরে গিয়ে জমে পড়ে।

কণকলতার এই এক নেশা। যেদিন কোনো কারণে বিন্তি খেলার আসর বসে না সেদিনটাকে কণকলতার মনে হয় বৃথা গেল।

খেলার নেশায় রোজ দুপুরে বাপের বাড়ি থেকে পূর্ণিমা আসে। নবছরে বিয়ে হয়েছিল পূর্ণিমার। দশ বছরে বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে এসেছে। সেই থেকে আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়া হয়নি তার। কবে কেমন করে যেন সকলের অলক্ষ্যে পূর্ণিমার রূপ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমা নামটাও সকলের মন থেকে মুছে গিয়েছে। ছেলেবুড়ো সবাই এখন তাকে মেজ বলে ডাকে।

একদিন বিন্তির আসরে মেজো না এলে কণকলতার ফাঁকা লাগে। অকারণে ভুল তাস ফেলেন। ভুল ডাক দিয়ে হেরে যান।

পিসি। ও ছোটপিসি—

গাওয়া ঘি দিয়ে বাটিতে ময়নার জন্যে ছাতু মাখছিলেন কণকলতা। পিসি ডাকটা কানে যেতেই বুকের মধ্যে ধরাস্ করে উঠলো। এ গলা পূর্ণেন্দুর। কণকলতার ভাইপো। যা ভেবেছেন কণকলতা তাই। পূর্ণেন্দুই। তাঁর সাড়া না পেয়ে সটান দোতলায় উঠে এসেছে। তিনি কথা বলার আগেই পূর্ণেন্দু হেঁট হয়ে কণকলতার পায়ের ধূলো নিয়ে বলল, তোমায় প্রণাম করতে এলাম ছোটপিসি। কেনরে। বন্দে মাতরমের দলে নাম লিখিয়েছিস—নাকি?

নাগো না, ভোটে দাঁড়াচ্ছি। তুমি আশীর্বাদ করো যেন জিততে পারি।

ভোট, কণকলতা থতমত খেলেন, ভোট কিরে?

এখানে মিউনিসিপ্যালিটি হচ্ছে। সেটা যারা চালাবে তাদের ভোটে দাঁড়িয়ে জিততে হবে।

মেজদাদা জানে?

হ্যাঁ, বাবা জানেন।

আমার গোপালকে প্রণাম করেছিস।

করবো, আগে তোমাকে করলাম।

হ্যাঁরে পূর্ণ, কোনো হাঙ্গামা হবে না তো? তুই ইংরেজদের গালাগাল করে বক্তৃতা দিবি?

এরমধ্যে ইংরেজ নেই পিসি। সবাই দেশী লোক। ভোটে জিততে পারলে আমাদের এই শহরটাকে শাসন করতে পারবো।

তোর মুখখানা এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন, ভোটের খাটাখাটি সুরু হয়ে গিয়েছে বুঝি?

তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পূর্ণেন্দু বললেন, পিসি গঙ্গা পাড় হয়ে সদরে যেতে হবে। সেইখানে ছাপানো ফর্মে দস্তখৎ করে তার নাম জমা দিতে হবে।

একটু দাঁড়া শুধু মুখে যাবি কেন।

যাই ছোটপিসি, ভোটে জিতলে তোমার কাছে ভরপেট মিষ্টি খেয়ে যাবো।

দু হাত দূরে বাপের বাড়ি তাও ন মাসে ছ মাসে যাওয়া হয় না। কি করে যাবেন তিনি? কার কাঁধে এত বড় সংসার আর ব্যবসার দায়িত্ব চাপিয়ে দুদিন বাপের বাড়িতে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে থেকে আসবেন? ছেলের বৌরা সব ছোট। এত বড় আর ছড়ানো কারবার তা ঝক্কিও কম নয়। দিনের মধ্যে কতোবার যে সিন্দুক খুলতে হয় বন্ধ করতে হয় তার ঠিক নেই। টাকা তোলা আর টাকা বার করার বিরাম নেই। নিজের আঁচলে বাধা থাকে সিন্দুকের চাবি।

তিনি আর অলকানন্দা ছাড়া আর কেউ জানেই না অতবড় সিন্দুকটার পেটের মধ্যে ঠাসা ঠাসি রাখা আছে দলিল দস্তাবেজ। পোঁটলায় বাধা সোনার গহনা আর ঘটিভর্তি আকবরী মোহর। মোহরগুলো কণকলতার প্রাণ। একখানা একখানা করে জমিয়ে ঘটি ভর্তি করেছেন।

কদিন আগে স্নেহাংশু রাজার মুখের ছাপওলা কিছু রূপোর টাকা তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিল, মা এগুলো সিন্দুকে তুলে রাখুন।

রূপোর টাকা দেখে কণকলতা খুব একটা গা করেননি। তাই দেখে স্নেহাংশু বলেছিল, রাজার মুখের ছাপ দেওয়া এই টাকাগুলো একদিন সোনার টাকার মতন খুব দামী হয়ে যাবে দেখবেন। আমি দীননাথকে বলে দিয়েছি যতো রূপোর টাকা পাবে সব এনে আপনার হাতে দেবে।

নিরামিষ রান্নাঘরটা উঠোনের দক্ষিণ দিকে। সে ঘরে ঢেকিও আছে। সেইখান থেকে একটা চেঁচামেচি শুনে কণকলতার চমক ভাঙলো। দক্ষর খনখনে গলার সঙ্গে আর একটা অধৈর্য গলা।

এখান থেকে কণকলতা বুঝতে পারলেন না সে গলাটা কার। না, ময়না দুটোকে আজ আর ছাতু দেওয়াই হবে না। বারান্দায় সরে এসে রেলিং-এ বুক দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

এ সময়টা তাঁর একটু অবসর।

রোজ ময়নার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ময়নাকে কথা বলতে শেখান, বলো বলো তো ময়না ঠাকুর ঠাকুর বলো, লক্ষ্মী লক্ষ্মী বলো। রাধাকৃষ্ণ বলো তাহলে আবার ছাতু দেব।

ময়নাটা তার লাল চুনির মতো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকায় আর তীক্ষ্ম গলায় ডেকে ওঠে—সেজ বৌমা... সেজ বৌমা....। এক একদিন তার কি খেয়াল হয় সকাল থেকেই ডাকাডাকি সুরু করে দেয়—বাসন্তী কোথায় গেলি... বাসন্তী কোথায় গেলি... হারামজাদী.... হারামজাদী....

বাসন্তী কাছাকাছি থাকলে দৌড়ে এসে খাঁচার সামনে দাঁড়ায়—এই আমায় গাল দিলি কেন তুই... বল্ কেন গাল দিয়েছিস্?

এক একদিন খুব রাগ হয়ে যায় কণকলতার। বলেন, দূর ছাই। তোকে পুষে লাভ কি। একদিন দেখিস খাঁচার দরজা খুলে উড়িয়ে দেব....। একটা ঠাকুর দেবতার নাম বলতে পারিসনে হতচ্ছাড়া পাখী কোথাকার।

রান্নাঘরের চেঁচামেচিটা বন্ধ হতে বারান্দা থেকে সরে আসার সময় কণকলতার চোখে পড়লো সন্দীপ রান্নাঘর থেকে বেরচ্ছে। তার হাতে একটা কাগজের ঠোঙা।

হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরনে। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। কোনদিকে দৃকপাত করার সময় নেই এত ব্যস্ত সে।

কণকলতার সব ছেলের মধ্যে সন্দীপ সকলের চেয়ে ছোট। এই ছেলেকে নিয়ে তাঁর মনে অশান্তির শেষ নেই। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে চুপ করে অন্ধকারের দিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

পড়াশোনায় একদম মন নেই সন্দীপের। দিনরাত ফুটবল খেলা আর ঘুড়ি ওড়ানো এইসব নিয়ে মেতে আছে। স্কুলে নাম লেখানো আছে ঐ পর্যন্তই। সন্দীপ অর্ধেকদিনই স্কুলে যায় না। গেলেও ক্লাস পালিয়ে স্কুলের পাশের

আমবাগানে বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দেয়। বিড়ি সিগারেটও ধরেছে কিনা কে জানে।

আঁচল তুলে চোখে চাপা দিলেন তিনি। সন্দীপের একবছর বয়সে কত্তা মারা গিয়েছেন। বাবার আদর ওর ভাগ্যে জোটেনি বলেই সন্দীপ এখন বাউন্ডুলে হয়ে গেল কিনা কে জানে।

সন্দীপ—

ডাক শুনে ওপর দিকে চোখ তুলেই মুখ নামিয়ে নিল সন্দীপ। রান্নাঘরে কি করছিলি?

সন্দীপ জবাব দেবার আগেই দক্ষ বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, তা জেনে তুমি কি করবে? সবদিক দেখা চাই, যাওনা বাপু ঘরে গিয়ে একটু শোওনা।

তুই থামবি দক্ষ?

আমি তো থেমেই আছি। কথাটা কখন বলি আমি। এ সংসারে মাস মাইনের ঝি আমি, কথা বলার আমি কে?

কই বললে নাতো রান্নাঘরে কেন ঢুকেছিলে?

সন্দীপ বলল, ঢেঁকিতে কাঁচ গুড়ো করবো বলে।

কাঁচ গুড়ো—?

বাঃ, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিতে কাঁচ লাগে না?

কণকলতা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে বারান্দা ছেড়ে সরে এলেন।

এ বাড়ির সদর দরজার দুপাশে দুখানা বড় ঘর। ডানহাতি ঘরখানা কাচারি। সকালবেলা দীননাথ ওখানে ফরাসের ওপর বসে লাল খেড়োয় খাতায় ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসেব লেখে। মুক্তোর মত ঝরঝরে অক্ষরে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বন্দী হয়ে থাকে এ বংশের সৌভাগ্যের ইতিহাস।

কর্ত্তার নাম দিয়ে ইঁট।

যারা বাড়ি ঘর করে তারা আগেভাগে খবর নেয় ধীরুবাবুর ভাঁটার ইঁট পাওয়া যাবে কিনা। না পেলে তখন অন্য ভাঁটায় ছোটে।

সেই ইঁটের দাম বেড়ে রাতারাতি আট টাকা হাজার হয়ে গেল। আরও দাম বাড়বে। কাছাকাছি কোথায় যেন এরোড্রম তৈরী হবে। লাখ লাখ ইটের প্রয়োজন সেখানে। সাধারণ মানুষ আর ঘর বাড়ি করার জন্যে পয়সা দিয়েও ইঁট পাবে না। সিমেন্ট পাবে না। এই হুজুগেই ইটের দাম রাতারাতি আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় কাছারি ঘরে বসে রমণী পোদ্দারের দিতে তাকিয়ে ধীরু বলল, ইট বিক্রি আমরা বন্ধ করে দিয়েছি পোদ্দার মশাই।

কেন বড় বাবু। আমি তো বরাবর আপনার ভাঁটার ইটই কিনি এখন তাহলে কি অপরাধ করলাম। আমার দোতলার ঘরখানা তুলতে না পারলে ছেলের যে বিয়ে দিতে পারবো না।

ধীরু মন দিয়ে তার কথা শুনছিল। বলল, এসব কথা গরমেন্টকে গিয়ে বলো পোদ্দার মশাই। সরকার থেকে নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে সব ইট মায় ঝামা আদলা সব তারাই ঝেড়ে মুছে নিয়ে যাবে। তোমাকে দু হাজার ইট বেচে শেষ পর্যন্ত আমি কি সরকারের কোপে পড়বো বলতে চাও।

পোদ্দারের তেল চকচকে ঘাড়ের ওপর মস্তবড় মাথা। গাল থেকে মাংস ঝুড়ে পড়েছে। তারজন্যে চোখদুটো ছোট আর বাজের মত দেখায়।

বাজারের হাওয়া বুঝে একশো বস্তা সিমেন্ট কিনে নিজের বাড়িতে ঢুকিয়ে ফেলেছে রমণী। এখন হাজার পঁচিশ ইট কিনে রাখতে পারলে বেশী দামে বেচে দু পয়সা ঘরে আসতো।

দীননাথ এতক্ষণ খাতা লেখা বন্ধ করে দুজনার কথা শুনছিল। পোদ্দার চলে যাবার পর মুখ খুললো, ইট বিক্রি সত্যিই বন্ধ করে দিলেন বড়বাবু?

হ্যাঁ দিলাম। যুদ্ধ লাগবে। ইট সোনার চেয়ে দামী হয়ে যাবে তুমি দেখে নিও।

তাহলে অন্য সব জিনিসের দামও তো বাড়বে?

সব বাড়বে দীননাথ, সব। আজ সকালেই একটা পাঁচপোয়া ইলিশ কিনলাম বাজার থেকে। কতো নিয়েছে জানো? চোদ্দ পয়সা। দু-আনার জিনিস চোদ্দ পয়সায় কিনতে হলো। গেল পুজোয় পারুলের শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠানোর জন্যে সেনগুপ্ত ধুতি জোড়া কিনেছিলেন আড়াই টাকা দিয়ে। শুনলাম এখনই তার দাম সাড়ে তিনে উঠেছে।

দীননাথের হাত সরছিল না। চোখের মণিতে আতঙ্কের ছায়া পড়েছে। মাথাটা অনেকখানি কোলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

তার নিজের সংসার আছে কিনা কেউ জানে না। নিজের একার চাহিদা এত কম যে এক এক সময় কণকলতা নিজেই তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, দীনু, সেলাই করা ধুতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন। টাকা নিয়েও যাও। দু জোড়া ধুতি কিনে নিও।

খরচা বলতে বিড়ির নেশা। দিনে চার পয়সার বিড়ি লাগে। এই মানুষও এখন আসন্ন সংকটের চিন্তায় কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

রোজকার মতো মস্ত ফরাসের মাঝখানটিতে একটি বড় সেজবাতি জ্বলছিল। একটা পোকা উড়ে উড়ে বার বার চিমনির গায়ে এসে পড়ছিল। ধীরু গতকালের বেচা কেনার হিসেব দেখতে ব্যস্ত।

অন্যদিন এই সময় সমস্ত ঘরখানা মানুষজনে গম্‌গম্‌ করে। গোটা ফরাসটা ভর্তি হয়ে বারান্দায় পাতা দুখানা বেঞ্চিতে মানুষ ছড়িয়ে থাকে।

এই সবেমাত্র আটটা। এখনো সময় পেরিয়ে যায়নি। যাদের আসার তারা সবাই আসবে।

একদৃষ্টে সেজবাতির আলোর দিকে তাকিয়েছিল দীননাথ। তার মনের মধ্যে একটা নতুন রকমের কষ্ট হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল এ বাড়ির কর্ত্রীর ঘরের লোহার সিন্দুকে জায়গা না থাকলেও আরও মোহর ঢুকবে। দিনে দিনে আরও বাড়-বাড়ন্ত হবে। ধীরুবাবু কাউকে না জানিয়ে বৌয়ের নামে গোপনে আরও সম্পত্তি খরিদ করবে।

আজ রবিবার।

সবাই মোটামুটি বাড়িতেই আছে। শুধু ধীরু আর অলোক সকালে উঠেই ভুজঙ্গর গাড়িতে ভাঁটায় চলে গিয়েছে। ভাঁটার কাজ বন্ধ থাকে না। সেখানে শনি-রবিবার নেই। দুর্গাপুজো-লক্ষ্মীপুজো নেই। একবার ইট পুড়তে সুরু করলে সেই বর্ষা না আসা অবধি চলতেই থাকবে।

শনিবার হপ্তা দেবার দিন।

পাথেরা ঝকুঁয়া থেকে সুরু করে মিস্ত্রি অবধি সবাইকে সাতদিনের কামাইয়ের পয়সা দিয়ে দেওয়া হবে।

হপ্তার দিন দীননাথকে নিয়ে ভাঁটায় যায় ধীরু। টাকা আর খুচরোর থলি থাকে দীননাথের কাছে। ভাঁটাতেও টিনের চালা দেওয়া বারান্দা সমেত একখানা ঘরের একটা অফিস আছে। সামনেই একটা ঝুপড়ি মতন নিমগাছ। তারই নীচে খাটিয়া পেতে বসে হপ্তার টাকা দেয় ধীরু। দীননাথ নামের পাশে পাশে খাতায় আঙুলের টিপছাপ নিয়ে রাখে।

ভাঁটার মিস্ত্রি তুলসীর মেয়ে অফিসঘরের মধ্যে বসে চা তৈরী করে। তারপর কলাই করা গ্লাসে সেই আগুন চা এনে ধীরুর হাতে ধরিয়ে দেয় রাতুয়া। পাশেই বসে থাকা দীননাথের কেন যেন গায়ের মধ্যে শির শির করতে থাকে। রাতুয়ার শরীরে বড় বেশী যৌবনের ঢল। বিয়ের পর একমাসও মরদের ঘরে থাকেনি। তার মরদ অন্য একজনার বৌকে নিয়ে থাকে। পাকা খাতায় টাকার অংক লেখার

ফাঁকে ফাঁকে দীননাথের মনে হয় রাতুয়ার শরীরে হাঁটাচলার মধ্যেও একটা সর্বনাশের ইশারা আছে। দীননাথ শুধু বুঝতে পারে না ধীরুবাবুর চোখদুটো তুলসী মিস্ত্রির মেয়েকে দেখলেই শিকার ধরা বাঘের চোখের মত নিঃশব্দে হাসতে থাকে কেন।

ঠাকুরঘর থেকে পূজো সেরে বেরিয়ে উঠোনের সামনের চাতালে জলচৌকির ওপর বসেছিলেন কণকলতা। মোটা মোটা নিরাভরণ হাত দুখানি কোলের ওপর রাখা। চোখ দুটিতে এমন একটি আত্মস্থভাব ভাব যে দেখলেই মনে হয় এখনো ধ্যানের আচ্ছন্নতা পুরোপুরি কাটেনি।

রোজ পুজোর পর এইভাবে এইখানে এসে বসেন তিনি। এইখান থেকেই দুপুর অবধি সংসারের প্রতিটি কাজে নির্দেশ দেন। নাতি নাতনীদের খোঁজ খবর করেন। কোন ঘরে কি রান্না হবে বলে দেন। তিনি একা নিরামিষ খেলেও রান্না তাঁর একার জন্যে হয় না। নাতি নাতনীরা তার ঠাকুরমার ঘরের তরকারি খাবার জন্যে রোজই বায়না করে।

বেলা এখন নটা।

বড় বৌ অলকানন্দা আছে নিরামিষ রান্নাঘরে। জানলা দিয়ে উনুনের পাশে তার আগুনের আঁচলাগা রক্তবর্ণ মুখখানা দেখা যাচ্ছে।

ও বড় বৌমা, একটু শুনে যা তো বাছা—কণকলতার একডাকেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে অলকানন্দা।

মা, আমায় ডাকছিলেন?

কথা না বলে হাত ধরে তাকে টেনে নিলেন কণকলতা।

তারপর নিজের থানের আঁচল দিয়ে বড় বৌয়ের মুখখানা মুছিয়ে দিলেন।

বললেন, এই গরমে এতক্ষণ রান্নাঘরের মধ্যে না থেকে মাঝে মাঝে বাইরে এসো। মুখখানা যে একদম ঝলসে গিয়েছে।

বড় বৌয়ের বুকের মধ্যে কণকলতার কথাগুলো সম্পূর্ণ ঢোকার আগেই একটা দুরন্ত হাওয়ার কাঁপনে তার বুকখানা থরথরিয়ে উঠলো। কোনজন্মে ছোটবেলায় নিজের মা মরে গিয়েছে—ভাল করে তার কথা মনেও পড়েনা। এই সংসারে এসে অন্ততঃ একটা দিকের অন্ধকারে আলোর দিকটা পড়েছে। মনের মধ্যে কখনো কোন বেদনার ঢেউ উথলে উঠলে এই একজনের স্নেহময় মুখখানা সমস্ত চেতনা জুড়ে শিষ্ট হয়ে ওঠে। কষ্টটা অনেকখানি সহনশীল হয়ে যায় তখন।

চাতালে বসে এতক্ষণ ভুবনের সঙ্গে কথা বলছিলেন কণকলতা। এক সময় চারপাশে তাকিয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে গলা তুলে ডেকে উঠলেন, শুকনন্দন...শুকনন্দন...., আহ্, কোথায় যে যায় সব—

শুকনন্দনের বদলে পিয়ারী এসে বলল, শুকনন্দন বাজারে গিয়েছে মাইজী। খোকাবাবুরা সব গোয়ালের পেছনে আছে। বাসন্তীদিদি, ছোটবাবু সব উখানে। আমি বললাম, সবাই আসো মাজী ডাকছেন, তা কেউ শুনলো না। বাড়ির পেছনদিকটাতে কুয়োর উল্টোদিকে গোয়াল। দুটো আম আর একটা বকফুলের গাছ। বকফুলের গাছটা কণকলতা নিজের হাতে লাগিয়ে ছিলেন। এখন ডালপালা ছড়িয়ে মস্তবড় হয়েছে। সারা বছর ধরে অজস্র বকফুল ফোটে। যেদিন খেয়াল হয় কণকলতা লক্ষ্মণ ঠাকুরকে ডেকে বলেন, আজ বাবুরা খেতে বসলে বেসন দিয়ে গরম গরম বক্‌ফুল ভেজে দিও। ঠান্ডা বকফুল ভাজা কেউ পাতেও নেবে না। কুয়োতলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কণকলতার সবকিছু নজরে এলো। বকফুল গাছটার ঠিক নীচটাতে ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেওয়ার পর্ব্ব চলেছে। মাটিতে ইট পেতে এদিকে পেছন ফিরে বসে আছে বাসন্তী। তার মুখের একপাশে রোদ্দুর পড়ে অন্য রকম দেখাচ্ছে তাকে।

অল্পক্ষণ একদৃষ্টে বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে কি যেন ভাবলেন কণকলতা। তার গর্ভের এই সন্তানটিকে তিনি হয়তো ঠিক বুঝতে পারেন না। বাসন্তীর সরলতা ও চপলতাকে অস্বীকার করে তার শরীরে যে যৌবনের পদার্পণ ঘটেছে তা একটা দুর্বহ যন্ত্রণা হয়ে ওঠার বদলে শান্ত নদীর ঢেউ-এর মতো হয়তো মাঝে মাঝে তাকে দোলা দিয়ে যায়। তাতে সাড়া দিক না দিক অবলীলায় অস্বীকার করে তার এই সদ্য যুবতী মেয়েটি অনায়াসে শিশুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে এও বড় কম কথা নয়।

নিঃশব্দে কুয়োর পাশ থেকে সরে আসতে গিয়ে নরুর মুখোমুখি পড়ে গেলেন কণকলতা।

কর্ত্তামা।

কি নরু?

সেজবাবু জানতে পাঠালেন আপনি বারোদোলের মেলায় যাবেন নাকি?

তুমি যাও, আমি খবর পাঠাবো।

নরু চলে যাবার জন্যে এগিয়ে গিয়েও আবার দাঁড়াল। তারপর সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, ফুলবাবু কালও আবার সেখানে গিয়েছিল।

কে বলল তোমাকে? মুহূর্তের মধ্যে কণকলতার মুখ কঠিন হয়ে উঠলো।

নরু বলল, ঐ রাস্তা দিয়ে তাগাদা করে ফিরছিলাম। আমি নিজেই দেখেছি।

ঠিক আছে। তুমি এখন যাও। আর শোনো, একথাটা যেন আর কেউ জানতে না পারে।

নরু চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ সেইখানেই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কণকলতা। তার মনে হলো বুকের মধ্যেটা শুকনো খট্‌খটে হয়ে গিয়েছে তাঁর। এই মুহূর্তে তাঁর ত্রিনাথের কথা মনে পড়লো।

একবার অনেকদিন আগে ত্রিনাথ কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলেন, আপনি জাতটাত কিছুই মানেন না।

কে বলল মানিনে ত্রিনাথ? আমার সবকজন ছেলেমেয়ের বিয়ে থা পাল্টি করে দিয়েছি। পারুলের ভালোঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছিল। তারা ভরৎদ্বাজ বলে তাদের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিইনি।

ত্রিনাথ বলেছিলেন, আপনার চাকরদুটোতো নীচু জাতের ওদের হাতে জল খান আপনি।

কণকলতা ত্রিনাথের কথায় হেসে ছিলেন। জাত কারুর জন্ম দিয়ে হয় না ত্রিনাথ। স্বভাবে হয়।

তুমি এতবড় পণ্ডিত। পি এম বাগচীর পাঁজিতে তোমার নাম ছাপা হয় অথচ তুমি এই কথাটা জানো না?

ত্রিনাথ তাঁর কথার জবাব দেন নি। অনেকক্ষণ চুপ করে অসুখী গলায় বলেছিলেন আপনার সাহস আছে দিদি।

আমার এতবড় সংসারটাকে আমাকেই টেনে নিয়ে যেতে হবে ত্রিনাথ। এতগুলো মানুষ তার সবাই জেনে না জেনে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমার সাহস না থাকলে চলবে?

কি হয়েছিল কে জানে সেদিন ত্রিনাথ বিদায় নেবার সময় তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

এসব ঘটনা অনেক আগের। সেদিন যে সাহসের কথা কণকলতা জোড় দিয়ে বলেছিলেন সেই সাহসকে এই মুহূর্তে নিজের মধ্যে খুঁজতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর সমস্ত বুকখানা জুড়ে আশ্চর্য এক ভয় বাসা বেধেছে। জগতের যে ব্যাপারটা নিয়ে এতদিন সবাই ফিসফিস করছিল তাই এবার দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে। কার মুখ চাপা দেবেন তিনি?

(১৪)

সন্ধ্যের ঠিক পরেই গায়ে চাদর আর মাথায় ঘোমটা টেনে কণকলতা গাড়ির মধ্যে উঠে বসলেন। সঙ্গে ধীরু।

এর মধ্যেই রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। শুধু মোড়ের মাথায় মিষ্টির দোকানটাতে গ্যাস বাতির আলোয় কয়েকজন মানুষের জটলা।

কয়লার উনুনের গনগনে আগুনে প্রকান্ড কড়াইতে রসগোল্লা ফুটছে। বাতাসে তারই গন্ধ।

ঘোড়ার গাড়ির দরজা বন্ধ করে এককোণে মাথাটা হেলিয়ে বসেছিলেন কণকলতা। উঁচু নীচু রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকানিতে মাথাটা দুলছিল তাঁর। উল্টোদিকের আসনে বসে ধীরু। তার মুখ থমথমে। ওপরে কোচ বক্সে ভুজঙ্গ কচুয়ান।

এই তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না এখন তাঁদের গন্তব্য স্থল কোথায়।

পুপুল কণকলতাকে কাপড় ছাড়তে দেখে বলেছিল, দাদি আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

এখন না, কাল গঙ্গায় চান করতে যাবার সময় তোমায় নিয়ে যাবো।

সে সময় তো আমি ঘুমিয়ে থাকি — নাতির জেদ ভাঙ্গানোর জন্যে কণকলতা তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন, এখন আমি তো একটা খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি, সেখানে তোমার যেতে নেই।

অরুন্ধুতি পুপুলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। চলো পুপুল, পুপুল, বাসন্তী ডাকছে।

এইভাবে চুপি চুপি কখনো বাড়ির বাইরে যাননি কণকলতা। তবু বড় বৌ আন্দাজ করেছিল কোথায় যাচ্ছেন তিনি।

অন্ধকারে অনেক কিছু দেখা না গেলেও সব কিছু ঢেকে ফেলার ক্ষমতা অন্ধকারেরও নেই। কণকলতাও জানেন একথা। তবু তিনি মুখ ফুটে কাউকে জানান নি। শুধু অলকনন্দাকে সিন্দুকের চাবিটা দিয়ে বলেছিলেন, আমি একটু ধীরুর সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি। তোমার কাছে চাবিটা রেখে দাও। কেউ টাকা পয়সা দিলে তুলে রেখো।

আচ্ছা মা।

ঠাকুর অপমানের হাত থেকে রক্ষা কোরো। আর কিছু চাই নে। গাড়িতে ওঠার আগে কণকলতা এক তলায় নেমে ঠাকুর ঘরের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে

মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন। তার চোখের কোণে জলের চিহ্ন মাত্রও ছিল না তবু বার বার চাদরের আঁচলে চোখ মুখেছিলেন।

কোথায় যাচ্ছেন তিনি, কার কাছে যাচ্ছেন খুব স্পষ্ট করে জানা নেই তাঁর। অদ্ভুত একটা আতঙ্ক তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ধীরুর চেয়ে জগৎ মাথায় সামান্য ছোট। বয়স একুশ ছাড়ায়নি। তবু কেন যেন তার ওপর ভরসা করতে ইচ্ছে করে। ভরসা করেও ছিলেন নিজের কাছে আটকে রাখতে পারবেন না। তখন ধীরুর অবর্তমানে কে তাঁর পাশে থাকবে? জগতের কথাই ভেবেছিলেন তিনি। অথচ তার সমস্ত হিসেব কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল।

ঘুপচি অন্ধকার গলির মধ্যে একতলা একটা বাড়ির সামনে ভুজঙ্গ গাড়ি দাঁড় করালো। তারপর কোচ বাক্স থেকে নীচে নেমে এসে বলল, বড় বাবু নামেন, মাইজী নামেন, এই মোকান।

গাড়ির দরজা দিয়ে ধীরু মুখ বার করে বাড়িটা দেখলেন। একটা জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। বাইরের দরজাটা বন্ধ।

মা....।

গাড়ির সিটে মাথা রেখে চোখ বুঁজে বসেছিলেন কণকলতা।

কোন সাড়া দিলেন না।

মা, নামুন।

এবার নড়েচড়ে বসলেন কণকলতা। মাথাটা আবার পেছনে হেলিয়ে দিয়ে বললেন, ফিরে চলো।

মা, ধীরুর গলায় বিস্ময়টা চাপা থাকলো না।

ভুজঙ্গকে বল্ গাড়ি ঘুরিয়ে নিক্।

এখানে নামবেন না?

না।

ভুজঙ্গ কচুয়ানকে কিছুই বলতে হলো না। সে কোচ বক্সে উঠে লাগামে টান দিল। বাতাসে শপাং করে চাবুকের আওয়াজ উঠেই মিলিয়ে গেল। ধীরু গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

শরীরটা দুদিন থেকে বেশ ঝরঝরে আছে। বাতের ব্যথা নেই। একটা তাকিয়া হাঁটুর নীচে দিয়ে বসেছিলেন কণকলতা। হঠাৎ তার কি হলো কে জানে হাতের তাস ফেলে দিয়ে বললেন, নতুন করে তাস দাও সেজ বৌমা। গরম পড়তে না পড়তে বাতাসে রোদ্দুরের তেজ বেড়েছে। সন্ধ্যের আগে হাওয়া উঠবে না।

আজ মেজ বিন্তি খেলতে আসে নি। কেন আসে নি তা জানেন কণকলতা। তাঁর বাপের বাড়ির আবহাওয়াতেও অশান্তির ঢেউ লেগেছে। অশান্তির কারণ স্বর্ণলতা।

দাদি.... ও দাদি তোমার জন্যে একটা খবর এনেছি—ধীরুর ছেলে সব্যসাচী দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকলো, তুমি বলেছিলে ছোটকার খবর আনতে। ছোটকা আজ ইস্কুল থেকে পালিয়ে সিগারেট খেয়েছে।

ছোটকা মানে সন্দীপ।

বড় বৌ একটা গোলাম ফেলে বলল, এই পুঁচকে তুই থাম্। কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস তার ঠিক নেই—

এমনিতেই মেজর অনুপস্থিতিতে খেলা ঠিক জমছিল না। তার ওপর এই আপদ। অলকানন্দা চোখ বড় বড় করে ছেলেকে শাসন করার চেষ্টা করলো। সব্যসাচী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে উঠলো, ও দিদি, তুমি যে বলেছিলে— অরুন্ধুতি তার কথা শেষ হবার আগেই হাত ধরে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, চল্ আমার সঙ্গে চল্, খিদে পায়নি তোর....

না, আজ আমি বড় বৌমার কাছে খাবো।

অরুন্ধুতি দুচোখে কপট শাসনের ভঙ্গী ফুটিয়ে বললেন, রোজ তো আমার কাছেই খাস্, চল্ শিগগির।

অলকানন্দা তাসে চোখ রেখে বলল, হতচ্ছাড়া ছেলে জ্বালিয়ে খেল, মেজো ওকে সেই জিনিসটা দিসতো। সব্যসাচী মার চালাকিতে ভুলল না। বলল, আগে বলো কি জিনিস দেবে, তবে খেতে যাবো।

অরুন্ধুতি তাকে দুহাতে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ওমা, সবাইয়ের সামনে সেটা বলা যায় নাকি। আচ্ছা আমি কানে কানে বলছি—।

অরুন্ধুতি কি বলল তা কে জানে। শান্ত হয়ে সব্যসাচী তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেজ বৌ দরজার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে বলল, মা, আপনি ভুল তাস ফেলেছেন। খেলায় আজ কণকলতা সেজ বৌয়ের পার্টনার।

কণকলতা দালানের খোলা দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন। সেজবৌয়ের কথা তাঁর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। দালানের বাইরে বগবগিয়ে ধোঁয়া উঠছে। উনুনে নতুন কয়লা দিয়েছে দক্ষ। এবার দোকান থেকে যে একগাড়ি কয়লা পাঠিয়েছে তার বেশীর ভাগ কাঁচা কয়লা। উনুন ধরাতে ঘুঁটে আর কেরোসিন তেল বেশী লাগে। বেশী ধোঁয়া হয়। কিন্তু একবার উনুনে আঁচ উঠে গেলে সে আগুণ অনেকক্ষণ থাকে।

নীচ থেকে বাচ্চাদের হৈ হুল্লার শব্দ ভেসে আসছে। সবে স্কুল থেকে ফিরেছে তারা। হাতমুখ ধুয়ে এবার সব আঁশ রান্নাঘরে সার দিয়ে খেতে বসবে।

পিঁড়ি পাতার শব্দ পাচ্ছিলেন কণকলতা। রোজ এই সময় তাঁর বুকের মধ্যেটায় ফর্‌ফর করে ওঠে। ইচ্ছে হয় নীচে নেমে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নাতি নাতনীদের খাবার তদারকি করেন। কিন্তু দুবেলা নীচে নামার ধকল শরীরে সহ্য হবে না। হাতের তাস মেরে দিয়ে উঠে পড়লেন কণকলতা। বললেন, নীচে গিয়ে দ্যাখোতো সেজ বৌমা ওদের জন্যে লক্ষণ ঠাকুর বাটিতে বাটিতে করে সবায়ের জন্যে দুধ ভাগ করে রেখেছে কিনা। আর দক্ষকে বলো ও যেন ভাঁড়ার থেকে গুড় বার করে দেয়।

বাচ্চাদের খাওয়া মেটার আগেই উনুনে রাতের রান্না চেপে যাবে। রাত বারোটার আগে এই পাট চুকবে না। সে সময় কণকলতার হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পাবেন রান্নাঘরের মেঝেতে ভাতের থালায় হাত দিয়ে পাঁচ বৌ হেসে কুটি পাটি হচ্ছে। আর তাদের আগলে দরজার সামনে বসে আছে দক্ষ ঝি।

আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে কণকলতার হৃদয়ে তৃপ্তির আর অহংকারের দুটো অদৃশ্য পাখী ডানা-ঝটপট করতে থাকবে।

বড় বৌমা... ও সেজ বৌমা... ছেলে মেয়েগুলোকে খাইয়ে দাওনা, রোজ আটটা বাজতে না বাজতে দোতলার শোবার ঘর থেকে কণকলতার কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে, তোমাদের বাপু কোন আক্কেল নেই। সেই কখন ইস্কুল থেকে এসে দুটি খেয়েছে.... খিদেয় সব মুখ শুকিয়ে ঘুরছে... দক্ষ... দক্ষ... কোথায় যে যায় মাগী....

রোজ সন্ধ্যে হতে না হতে এই।

আজ নতুন বৌ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোচ্ছিল। কোনো রকমে সে বলল, শ্যামের বাঁশী বেজে গিয়েছে, যান বড়দি।

অলকানন্দা কথাটা গ্রাহ্য না করে বলল, বাজুকগে তোর শ্যামের বাঁশী, শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। লক্ষণ ঠাকুরের শুধু ভাত নেমেছে। এখনো ডাল তরকারি কিচ্ছু হয়নি।

দশমিনিটও হয়নি। তার আগেই আবার দোতলা থেকে কণকলতার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, মেজ বৌমা, ছেলেমেয়েগুলো খেতে বসেছে? সকালকার ইলিশ মাছের পাতুরী আছে। মনে করে ওদের দিও।

একটা কাঁসার বড় বগি থালায় উঁচু করে ভাত ঢেলে নিয়ে ডাল দিয়ে মাখছিল জয়ন্তী। উঠোনে খোলা আকাশের নীচে তাকে ঘিরে জনা দশেক বাচ্চা। সামনে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তার উজ্জ্বল আলো পেয়ারা গাছটার কাছ পর্যন্ত গিয়ে তারপর ছায়া হয়ে হারিয়ে গিয়েছে।

ঠাকুরঝি, অরুন্ধুতি বলল, এই দিয়ে ওদের খাওয়াও, আমি মাছ এনে দিচ্ছি।

পাপান দাঁতে ঠোঁট চেপে একপাশে বসেছিল।

বলল, বাসন্তী কই, আমি তোমার হাতে খাবো না, বাসন্তীর কাছে খাবো।

জয়ন্তী ভাতের দলা তুলে বলল, বাসন্তীর গানের মাষ্টার এসেছে, আয় খেয়ে নে।

না আমি তোমার কাছে খাবো না।

খেতে হবে না, যা ভাগ, ভাতের দলাটা জয়ন্তী অন্য একজনার মুখে গুঁজে দিল। বাসন্তীর কাছে খাবো। বাসন্তী যেন ওনার কেনা বাঁদী।

পাপান আরও কয়েক মুহূর্ত একইভাবে বসে থাকলো। তারপর লাফিয়ে উঠে তীরবেগে দোতলা লক্ষ করে ছুট লাগালো।

কণকলতা মেঝের ওপর বসে হ্যারিকেনের আলোয় সুর করে দাশু রায়ের পাঁচালী পড়ছিলেন।

পাপান তার সামনে গিয়ে বেঁকে দাঁড়াল, দাদি, মেজ পিসি আমায় খেতে দেয়নি। বলেছে খেতে হবে না ভাগ।

তোর মা কোথায় গেল?

মা রান্নাঘরে।

চল্‌তো দেখি—কণকলতা বই বন্ধ করে উঠে এলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, সেজ বৌমা ও সেজ বৌমা, লক্ষ্মণ.... লক্ষ্মণ...

সেজ বৌ বাইরে এসে দাঁড়াল—কি বলছেন মা—

কি আর বলবো বাছা, পাপান না খেয়ে ওপরে চলে এসেছে।

ওই শয়তানটা আপনার কাছে গিয়ে জুটেছে বুঝি, ছোট ঠাকুরঝির কাছে ছাড়া খাবে না বলে তেজ করে উঠে গেল।

কণকলতা বললেন, কেন বাসন্তীর হাতখানা কি জগন্নাথের কাছে বাঁধা দেওয়া আছে? সে পাপান কে খাইয়ে দিতে পারছে না। রাগে কণকলতা গরগর করতে থাকলেন, তোমরা এই রকম করে ছেলেমানুষ করবে বটে। থালায় করে আমার ঘরে ভাত দিয়ে যাও। আমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছি।

একথার ওপর আর কথা চলবে না। অরুন্ধতি হাতের ইশারায় সেজ বৌকে রান্নাঘরের ভেতরে ডেকে বললেন, কি হারামজাদা ছেলে হয়েছে তোর, এখনি হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে দিল।

দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা ওপরে ভাত দিয়ে আয় নইলে এখুনি নীচে নেমে আসবেন।

(১৬)

মাসী তুমি, বাব্বা এতদিন পরে তোমায় দেখলাম—

দরজার গোড়ায় কণকলতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো অর্চনা, মা বলছিল তুমি অনেকদিন আমাদের বাড়ি আসো নি।

তার থুতনীতে হাত ঠেকিয়ে চুমু খেলেন কণকলতা।

বললেন, তুই এসেছিস শুনেই তো দেখতে এলাম।

হ্যারে জামাই সঙ্গে এসেছে?

না ছোট মাসী। সাতদিন পরে এসে নিয়ে যাবে।

কেনরে, মোটে সাতদিন থাকবি কেন, জামাই বুঝি তোকে ছেড়ে থাকতে পারে না?

কলকাতার কাছেই বিয়ে হয়েছে অর্চনার। শ্বশুরবাড়ি খুব ধনী। পেরেক তৈরীর কারখানা ছাড়াও আরো নানা রকমের ব্যবসা আছে। অর্চনার রূপ দেখে নিয়েছে তারা। মা স্বর্ণলতার মতো রূপ পেয়েছে সে। স্বর্ণলতার চাঁপা ফুলের মতো রং ছাড়াও নাকচোখ থেকে শুরু করে হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত সৃষ্টিকর্ত্তা নিঁখুত করে সৃষ্টি করেছেন। এত বয়সেও স্বর্ণলতার শরীরটা কাঁচা সোনার তৈরী মহার্ঘ বস্তুর মতো সকলের চোখে ঈর্ষা আর মুগ্ধতা ছড়ায়।

কিন্তু ভাগ্য—?

অর্চনাকে আড়াল করে কণকলতা নিশ্বাস ফেললেন। দিনের মধ্যে অসংখ্যবার দিদির কথা মনে পড়ে তবু পারতপক্ষে এ বাড়িতে আসতে চান না তিনি।

ঘরে পা দেবার আগেই স্বর্ণলতা তার হাত ধরলেন, আয় কণক, আমার ঘরে আয়।

দিদি আর জামাইবাবুর এখন আলাদা ঘর। কালো পালিস করা মেহগিনি কাঠের নক্সাকাটা ঘরজোড়া পালঙ্ক। নীচে একটা জলচৌকি পাতা। তাতে পা না রেখে খাটের ওপর ওঠা যায় না। ঘরে ঢুকে খাটের দিকে এগিয়ে গেলেন কণকলতা।

দিদির বিয়ের সময় বাবা কলকাতায় সাহেবদের দোকান থেকে খাটখানা দুশোটাকা দিয়ে কিনে এনেছিলেন। কণকলতার মনে পড়লো, বিয়ের আসরে খাটখানা পেতে রাখা হয়েছিল। সার্টিনের গদি ওপরে কাজ করা সার্টিনের চাদর।

স্বর্ণলতার গা ভর্তি গহণা। ঘর ভর্তি অন্যান্য দান সামগ্রী বিয়ে বাড়িতে আসা মানুষজন সেসব না দেখে খাট খানাই দেখেছিল।

সেই খাটে দীপঙ্কর পাঁচ বছরের ওপর বসেন নি, শোন নি। পাশের ঘরে একটা ছোট তক্তা পোযের ওপর অনাড়ম্বর বিছানায় দিনরাত শুয়ে থাকেন দীপঙ্কর। ওই ঘরখানার চারটে দেয়ালের বাইরে তাঁর কোনো জগৎ নেই। অথচ এমন হবার কথা ছিল না।

বড় মেয়ে স্বর্ণলতার জন্যে মুন্সেফ ছেলে পছন্দ করেছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। মানুষের শুধু রূপ থাকলে সেরূপ চোখের পীড়া ঘটায়। রূপের সঙ্গে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা মিশলে সেরূপ শুধু দৃষ্টিশোভন নয়, হৃদয় রঞ্জন হয়ে ওঠে।

পালঙ্কের বাজুতে পিঠ দিয়ে বসে আঁচলে মুখ মুছলেন কণকলতা—।

ভাগ্য কতো নির্ম্মম আর বিবেকহীন তা দীপংকরকে দেখলে বোঝা যায়। বুকের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসে ভয়ে, বেদনায়।

এগারো বছরের স্বর্ণলতা শুভদৃষ্টির সময় লজ্জায় ভালো করে দীপংকরের দিতে তাকাতেই পারেননি। ফুলশয্যার রাতে অস্ফুট বিষ্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। একরাশ ভারী ভারী গহণা পরা হাত দিয়ে দীপংকরকে স্পর্শ করে দেখেছিলেন মানুষটা সত্যিই রক্ত মাংসের তৈরী কিনা।

হ্যারে কণক, তখন থেকে এসে পর্যন্ত মুখ গোমরা করে বসে আছিস কেন, বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি?

না, না কণকলতা হাসার চেষ্টা করেছিলেন।

মোহনভোগ করেছি, খাবি একটু?

না দিদি, এই অবেলায় কিছু খেলে সহ্য হবে না।

জামাইবাবুর ঘরে যাবিনে? সে মানুষটা তোকে দেখলে খুব খুশি হয়।

জবাবে কথা না বলে মাথা ঝাঁকালেন কণকলতা। বললেন, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এসেছি।

আমার সঙ্গে পরামর্শ করবি, হাসি মুখে ছোট বোনের দিকে তাকালেন স্বর্ণলতা, আমি তোকে কি বুদ্ধি দেবরে?

আমি তো বোকা, হ্যাঁরে ভীষণ বোকা হয়ে গেছিরে....।

সবাই যে বলে তোরই খুব বুদ্ধি, সাহস।

সাহস, দিদির মুখের কথাটাকেই নিজের ঠোঁটে তুলে নিলেন কণকলতা, আমার বুকে হাত রেখে একবার দ্যাখো. ভয়ে দিনরাত কাঁটা হয়ে আছি আমি.... কাল সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি...।

আয়, আমার কাছে সরে আয়, হাত ধরে কণকলতাকে কাছে টানলেন স্বর্ণ, জানিস আগে আগে আমারও তার মতোন খুব ভয় করতো। এখন, এখন আর করে না। ঝড়টা ঘরের মধ্যে পড়লে দেখবি জানলা দরজার কপাটই শুধু আছড়াতে পারে, ভিত নাড়াতে পারে না।

তুমি কি কিছু শুনেছ দিদি?

সব শুনেছি, কাল ধীরু এসেছিল।

জগৎ দুদিন বাড়ি ফেরেনি। তোর কাছেই ছিল।

স্বর্ণলতা বললেন, মেয়েটা নাকি খুব অবস্থাপন্ন ঘরের?

হ্যাঁ, বাড়ি ঘর আর অনেক সম্পত্তির মালিক শুনেছি। সধবা। বর আছে, তাও—। আমি বাড়িতে বৌটার দিকে তাকাতে পারছিনে—কণকলতার চোখ থেকে টপ্ করে এককোটা জল গড়িয়ে পড়লো।

আরো কিছুক্ষণ স্বর্ণলতার ঘরে বসার পর কণকলতা বললেন, চলো দিদি, জামাইবাবুকে দেখে আসি।

কদিন পর নিজের ঘরে বসেছিলেন কণকলতা। অন্যদিনের মতো আজ সন্ধের পরেও বাতাস ওঠেনি। অসহ্য গরমে ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। হাতপাখা খানা পাশেই পড়েছিল তুলে নিলেন তিনি।

একটু আগে নরু এসেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যের পর সে তাঁর কাছে ব্যবসার বেচাকেনা, টাকা পয়সার আমদানি, পাওনাদারের দেনা মেটানো সব হিসেব দিয়ে যায়। আজও যথারীতি এলো সে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সাবধান হয়ে গিয়ে নীচু গলায় বলল, বাঁশবাগান খরিদের কাগজ পত্তরগুলো সাবধানে রাখবেন।

কণকলতা বললেন, সিন্ধুকে তুলে রেখেছি। আর কিছু বলবে?

হ্যাঁ, নরু বলল, কারুর ভাটায় ইটের দাম বাড়েনি, অথচ বড়বাবু আমাদের

ইটের দাম হাজারে দুটাকা করে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটা বোধহয় ভালো হলো না।

নরুর সবকথা শোনার পরেও কণকলতা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, পাপানের পাঁচ বছর বয়েস হয়ে গেল। একটা ভালোদিন দেখে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে।

ওর হাতে খড়ি হবে না?

হ্যাঁ, ত্রিনাথকে খবর পাঠিয়েছি। একদিন এসে হাতে খড়ি দিয়ে দেবে। ছেলেটার বুদ্ধি আছে, দ্যাখো যদি এক আধটা পাস করতে পারে। এ বংশের কেউ তো আর ইস্কুলের গন্ডী পাড় হলো না।

লেখাপড়া না করেও সংসারে বড় হওয়ার দিন বোধহয় শেষ হয়ে এলো। কণকলতা বুঝতে পারছেন, চারপাশে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে দিনে দিনে তা প্রবলতর হয়ে উঠবে। তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না।

তিনি নিজেই বা কি এমন ইস্কুল কলেজে পড়েছেন। বাপের বাড়িতে অক্ষর জ্ঞানটুকুই শুধু হয়েছিল। এ সংসারে এসে আঁতুড় আর রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলা দেবার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় পেয়েছিলেন রাতে সারা বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পর হ্যারিকেনের আলোয় রামায়ন মহাভারত পড়েছেন। দাশু রায়ের পাঁচালী পড়েছেন। ডি এল রায়ের নাটক আর প্রভাত মুখুজের গল্পও পড়েছেন।

তাও নিজের মুর্খতার লজ্জাটা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। বুঝতে পারেন জীবনের ঐ অন্ধকার দিকটাতে কোনক্রমে যদি আলোর রশ্মি পড়তো তাহলে হয়তো তাঁর নিজের সাত সাতটা ছেলের এক আধজনাও স্কুলের গন্ডী পেরোতে পারতো।

এবাড়িতে রোজ সন্ধেবেলা এখন দশ এগারোজন পড়ুয়ার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর কণকলতা নিজের ঘরে বসেই শুনতে পান। ঐ সব দুর্ব্বোধ্য শব্দের ঢেউগুলো তাঁর সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। একটা সুখ একটা অসহ্য সুখ— কণকলতার মনে হয় তিনি গঙ্গায় অবগাহন করে পবিত্র হয়ে যাচ্ছেন।

রোজ সন্ধের আগে নিয়ম করে নন্দ মাস্টার আসেন। কাছারির পাশের ঘরটিতে বাচ্চাগুলোকে তিনি হাতের লেখা ছাড়াও ছড়াকিয়া গন্ডাকিয়া মুখস্থ করান।

একটু রগচটা ধরনের মানুষ নন্দ মাষ্টার। ছাত্ররা তাঁর কথা না শুনলে অথবা পড়া ভুল বললে তিনি রাগে দিশেহারা হয়ে বাচ্চাটিকে নির্ম্মম শাস্তি দেন।

রোজই কারুর না কারুর মাথা ফাটে অথবা হাতে পিঠে দাগরা দাগরা চাবুকের দাগে রক্ত ফুটে ওঠে।

মা, নন্দমাস্টারকে বোধহয় বাদ দেওয়া ভালো। কদিন আগে স্নেহাংশু বলেছিল, মাস্টারের রাগ হলে মাথার ঠিক থাকে না। কোনোদিন দেখবেন ছেলেমেয়েদের একজন খুন হয়ে গিয়েছে।

ছিঃ এসব অলুক্ষণে কথা বলছিস্ কেন, কণকলতার বুকের মধ্যে থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছে ছেলের কথা শুনে, নন্দ পড়ায় ভালো। তাছাড়া একটা মানুষকে তাড়াবো বললেই তাড়িয়ে দেওয়া যাবে নাকি?

বাচ্চাগুলোকে পড়ানোর বদলে নন্দ মাস্টার এবাড়িতে দুবেলার আহার ছাড়াও নগদ তিনটাকা মাইনে পান। মাসে মাসে ঐ টাকা কটা তাঁর বড্ড দরকার তা জানেন কণকলতা। বিধবা বোনের কাছে নন্দ মাস্টার তার একমাত্র ছেলেকে রেখেছেন। ছেলেটা পাগল। তার ওপর তার মা নেই। প্রতিমাসে ঐ টাকা কটা না পাঠালে বোন ছেলেকে রাখবে না।

নরু—

মা।

নন্দ মাস্টার আমার কাছে একটা বালাপোষ চেয়েছিল।

হেঁসেদের দোকানে বালাপোষ এসেছে কিনা খোঁজ নিও।

খোঁজ নিয়ে আপনাকে বলবো।

না, টাকা নিয়ে যাও। পছন্দ করে একখানা বালাপোষ কিনে নিয়ে এসো। কতো টাকা লাগবে।

সাত আট টাকার কম হবে না।

ঠিক আছে, ঐ দেরাজের ড্রয়ারে টাকা আছে। নিয়ে যাও। জিনিসটা ভালো দেখে কিনো। খেলো জিনিস আমি হাতে করে দিতে পারবো না।

নরেন চলে যাবার পর কণকলতা উঠে এসে চৌকিতে পাপানের পাশে বসলেন। খালি গায়ে শুধু একটা ইজের পরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা।

পরম মমতায় কণকলতা পাপানের গায়ে হাত বোলাতে থাকলেন।

এইটুকু মানুষটার যতো মান অভিমান, যতো অভিযোগ সব তাঁর কাছে। যে মা পেটে ধরেছে সারাদিনের মধ্যে তার কাছে একঘন্টাও থাকে না। বরং বাসন্তীর খুব ন্যাওটা হয়েছে।

এতগুলো নাতি নাতনী তাঁর। সবাইবে তিনি সমান ভালবাসেন। তবু যেন পাপানের ওপর তাঁর টানটা বেশী। অন্য কেউ সেটা বুঝতে পারেনা। তিনি

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে এক একসময় অবাক হয়ে·যান। কেন যেন তাঁর মনে হয় পাপান তাঁর বংশে সকলের চেয়ে আলাদা।

সকালবেলা কণকলতার বিছানা থেকে ঘুমন্ত পাপানকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল সেজ বৌ।

আজ যে ইস্কুলে ভর্তি হতে যাবে। দেখতে দেখতে কেমন পাঁচ বছরের হয়ে গেল পাপান। মুখখানা এবাড়ির অন্য সকলের মতই হয়েছে। শুধু রংটা ফর্সা।

নিজের ঘরে এসে সেজ বৌ ঘুমন্ত ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো। সারাটা দিনের মধ্যে এ ছেলে কতক্ষণই বা তার কাছে থাকে। খিদে পেলেও বড়মা অথবা সেজমার পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। চান করে ওঠার পর বাসন্তী মাথা আঁচড়ে না দিলে কারুর মাথা আঁচড়ানো পছন্দ হয় না তার।

এই তো সেদিন রাতে সেজ বৌ পাপানকে নিজের কাছে নিয়ে শুয়েছিল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে সেকি চিৎকার করে কান্না। বাধ্য হয়ে মাঝরাতেই সেজ বৌকে কণকলতার বিছানায় দিয়ে আসতে হয়েছিল—এই নিন মা, আপনার কাছ ছাড়া শোবে না।

অলোকের অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙ্গেছে। চোখ বুঁজে বিছানায় শুয়ে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে এককাপ চা না খেলে সারা দিনটা ধরে শরীরটা বেগর বাই করবে। অন্যদিন এতক্ষণ দক্ষ চা দিয়ে যায়। আজ এখনো তার পাত্তা নেই। চোখ খুলে স্ত্রীর দিকে তাকালো অলোক। বলল, দক্ষ এখনো চা দিল না তো, এই একটু নীচে গিয়ে দ্যাখোনা। যাচ্ছি, সেজ বৌ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ পাপান ইস্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছে।

কে বলল?

মা কাল নরুদাকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন।

ও, আবার চোখ বুঁজলো অলোক। ছেলের স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেয়েও বড় সমস্যা এখন তার মাথার মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে।

গত সপ্তায় কলকাতা থেকে গোয়েঙ্কা না ঝুনঝুনওয়ালা কার যেন ম্যানেজার এসে তার সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করে গিয়েছে। বলেছে শিগগিরই অলোককে একবার কলকাতায় গিয়ে শেঠেদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হঠাৎ তাকে কেন কলকাতায় দেখা করতে ডাকা। অলোক তা নিজেই বুঝতে পারছিল না। যে এসেছিল সে বলে গিয়েছে—নদীর ওপারে যে এরোড্রোমটা তৈরী হচ্ছে তার ঠিকেদারী পেয়েছে ওই কোম্পানী। তাদের এখন এরোড্রাম বানাতে লাখ

লাখ ইট দরকার এ শহরের সবকটা ভাঁটার ইট মিলিয়েও সে প্রয়োজন মিটবে না। তাই নতুন জমি কিনে রাতারাতি নতুন ভাঁটা চালু করতে হবে।

লোকটি অলোককে বলেছে, আপনি একসঙ্গে দশটা ভাঁটা খুললেও টাকার অভাব হবে না। সবটাকা দেবে আমার কোম্পানী। লাভ যা হবে তাও আপনারই হবে, আমাদের খালি ইঁটের সাপ্লাই চাই ব্যাস্।

তা এতো লোক থাকতে আমার কাছে এলেন কেন?

অলোকের প্রশ্নের জবাবে লোকটি বলেছিল, আমার শেঠজী বোধহয় কারুর কাছে খবর পেয়েছেন এ ব্যাপারে আপনি সাচ্চা লোক। তাহলে স্যার আপনি কবে কলকাতা আসছেন, কাল না পরশু?

লোকটি যাবার আগে অলোকের হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিল, কথাটা এখন কারোর কাছে ভাঙ্গবেন না। শেঠরা ব্যবসার কথা পাঁচকান করা পছন্দ করে না।

না, আর কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু এই টাকা কিসের জন্যে?

বারে, আপনি কলকাতা যাবেন, ঘুরবেন ফিরবেন, হোটেলে খাওয়া দাওয়া করবেন, তার খরচা লাগবে না?

রাতে বিছানায় শুয়ে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে অলোক। ইট ব্যাপারটা সত্যিই তার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। ফার্স্ট ক্লাসে উঠেই পড়া শোনা ছেড়ে অলোক সোজা এসে যখন ভাঁটায় যোগ দিয়েছিল তখন তার বয়েস ষোল। সেই থেকে একটু একটু করে অভিজ্ঞতা কম হয়নি তার। এখন অলোক চিমনির মুখ থেকে বেরনো ধোঁয়ার রং দেখে বলে দিতে পারে ইট পোড়ার পর এক নম্বর হবে না তাল ঝামা হবে।

ভাঁটার কাজ বর্ষায় বন্ধ থেকে আবার শীতের আগে আগে নতুন করে সুরু হয়। নতুন কুলির দল আসে। তাদের থাকার জন্যে কাঁচা ইটের দেওয়াল আর হোগলার চাল দিয়ে ঝুপড়ি নিজেরাই বানিয়ে নেয়। তারপর প্রথম যেদিন আগুন পড়ে ভাঁটায় সেদিন ছোট খাটো একটা উৎসব হয়। কালীপূজোর পর হোমের আগুন দেয়। সেই আগুন উঠতে উঠতে কখনো কখনো রাত ভোর হয়ে যায়। আগুন চলতে সুরু করলে তবে বাড়ি ফেরে অলোক।

সেজ বৌ নিচে যাবার আগেই দক্ষ চায়ের কাপ হাতে ঘরে এলো, চা নাও গো সেজদাদা।

এতোক্ষণে তোর চায়ের কথা মনে পড়লো? অলোক হাত বাড়িয়ে কাপটা নেবার পর কথাগুলো বলল।

দক্ষ বলল, কি করবো বলো, বড়দা সদরে গেল। তার চানের জল তেল দিলাম, তারপর ফুলদা—

থাক্, তোকে আর নামতা পড়তে হবে না।

দক্ষ চলে গেলে এক চুমুকে চায়ের কাপ খালি করে অলোক উঠে পড়লো। এই এত সকালে বড়দা কেন সদরে গেল সেটা জানা দরকার। কই কাল রাতেও তো কিছু বলেনি?

বিছানা থেকে নেমে পকেটে হাত পুরে পাসিংশোর প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট তুলে নিল অলোক।

একশো টাকার নোটখানা এখনো পকেটেই রয়েছে। আজ কালের মধ্যেই একবার কলকাতা থেকে ঘুরে আসতে হবে। কিন্তু হঠাৎ কলকাতায় যাচ্ছি বললে সকলে নানা রকম ভাববে। কি বলা যায়...?

এই এক চিন্তার সঙ্গে বড়দা ধীরুর সদরে যাবার চিন্তাটা এক হয়ে জট পাকিয়ে মনেব মধ্যে পাক খেতে থাকলো।

সকালে ভাঁটায় যাবে কিনা?

সেজ বৌয়ের প্রশ্নের জবাবে শুধু ঘাড় নাড়লো অলোক।

যার উত্তর হ্যাঁ না দুইই হয়। তারপর দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(১৭)

এ বাড়িতে দিন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। আঁশ রান্নাঘর থেকে কাঁচা কয়লার ধোয়া বেরচ্ছে গলগল করে। নীচের উঠোন ধোঁবার ঝাঁটার শব্দ আসছে। কণকলতার গঙ্গা চান সেরে ফেরার সময় হলো। নীচের দরজার শুকনন্দন একটা বড় ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অলকানন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলল, তিনসের আলু আর একসের বেগুন নিবি। কাল যে পটলগুলো এনেছিলি তার অর্ধেক পাকা। ভালো দেখে তিনসের পটল নিবি। আর ভাল নোটে শাক্ পেলে আনিস। কাল মা: মোচার কথা বলেছিলেন। খবরদার কাঁচাকলার মোচা আনিসনে যেন। কাঁচা কলার মোচার ঘন্ট কেউ মুখে তুলতে পারবে না।

শুকনন্দন বাজারের ফর্দ্দ শুনে নিয়ে পা বাড়িয়ে পেছনে ডাক শুনে আবার দাঁড়াল।

বড় বৌ বলল, আঁখের গুড় আনিস একশের। রান্নাঘরে মাজা জামবাটি আছে নিয়ে যা।

বাজার থেকে খোলা গুড় আনলে কর্ত্তামা গোঁসা করবেন। শুকনন্দন কথাটা ঠিকই বলেছে। এবাড়িতে কখনো বাজার থেকে খুচরো জিনিস কেনা হয় না। সারা বছরের গুড় টিন ভর্তি হয়ে হয়ে আলুর ঘরের একপাশে সাজানো থাকে। দীননাথ পরশু গুড়ের আড়তে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। আজও সেই গুড় এসে পৌঁছলো না কেন দীননাথকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

এসংসারে গুড় ছাড়া একমুহূর্ত চলবে না। ছেলে মেয়েরা সকালে লুচি পরোটা যা খাবে তাতে গুড় চাই। তরিতরকারিতে দেবার জন্যে গুড় চাই। কোনো তৃষ্ণার্ত মানুষ জল চাইলে তার হাতে একদলা গুড় দিয়ে তবে জল দেবার রীতি এবাড়িতে।

সদর দরজার সামনেই কণকলতার সঙ্গে অলোকের দেখা হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নামছেন। গায়ে আলগা করে মটকা জড়ানো। ভিজে গামছা পাট করে মাথায় চাপা দেওয়া।

এতো সকালে কোথায় যাচ্ছিস রে?

আসছি এখুনি, তার পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নামলো অলোক। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর একটা বাড়ির সামনে এসে বন্ধ দরজার কড়া নেড়ে ডাকলো, নরু... নরু বাড়ি আছো?

বছর আটেকের একটা ছেলে দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়ালো, বাবা বাড়ি নেই।

কোথায় গিয়েছে?

বলে যায়নি।

ফেরার সময় মোড়ের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো অলোক।

নরু বাড়ি থাকলে খবর দিতে পারতো বড়কর্তা সকালে উঠেই সদরে দৌড়েছে কেন? শুধু এই কথাটা জানার জন্যেই অলোক সকালে উঠেই নরু মুহুরীর বাড়ি ধাওয়া করেনি। এই শহরের কার ভাঁটায় এখন কতো ইঁট মজুদ আছে তার নির্ভুল হিসেব একমাত্র নরুই দিতে পারে। আপন মনে ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল অলোক। বাড়ির কাছাকাছি এসে আবার পথ বদল করলো সে। তেলি পাড়ার গলি ছেড়ে সাহাদের তাঁতের কারখানার পাশ দিয়ে হেঁটে এসে আর একটা সরু গলিতে ঢুকে আলকাতরা মাখানো একটা বন্ধদরজায় সন্তর্পণে আঙুলের টোকা মারলো।

পাশের একটা ছোট জানলা খুলে গেল। একখানা মুখ অলোককে দেখে বলল, কি দাদা, এতো সকালে?

কেউ নেই?

আছে।

খেলা কখন সুরু হয়েছে?

রাত থেকেই চলছে। ঢুকবেন নাকি?

হ্যাঁ, দরজা খোল।

পকেটে কড়কড়ে আস্ত একখানা একশো টাকার নোট। ভাগ্য ভাল হলে ঐ নোটখানা জুয়োর বোর্ডে পাঁচশো টাকা হতে এক ঘন্টাও লাগবে না। ভাগ্য তো বদলাতেই সুরু করেছে। নইলে কলকাতা থেকে শেঠরা তার কাছে লোক পাঠাবে কেন?

নতুনজামা। নতুন ইজের। পায়ে নটি বয় সু। পাপানকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার গালে চুমু খেল সেজ বৌ।

অরুন্ধুতি বলল, ওর কপালে একটা কাজলের টিপ দিয়ে দে সেজো, চোখ লাগবে না।

কথাটা বলে অরুন্ধুতি নিজেই পাপানের একটা আঙুল মুখের কাছে তুলে নিয়ে কামড়ে দিল।

পাপান বড়দের মত পাকা গলায় প্রশ্ন করলো, আমি ইস্কুলে যাবো?

হ্যাঁ, নরু কাকু তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ভর্তি করে দেবে।

বাসন্তীও যাবে আমার সঙ্গে?

ওমা, তোমাদের তো ছেলেদের ইস্কুল, ওখানে বাসন্তীকে ঢুকতেই দেবেনা।

পাপান দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তাহলে আমিও ওই ইস্কুলে যাবো না।

একথা বলতে নেই পাপান, সেজ বৌ বলল, রোজ পিয়ারী গিয়ে তোমাকে টিফিনের সময় দুধ মিষ্টি দিয়ে আসবে।

অরুন্ধুতি তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, জ্যেঠুকে বলবো তোমাকে ছবির বই এনে দেবেন।

বাসন্তী ছবির বই পড়ে না, পাপানের জবাব দিতে একটুও দেরী হলো না, বাসন্তী দুধ খায় না, সন্দেশও খায়না, আমি খাবো না। ছুঁড়ে ফেলে দেব।

স্কুলটা একটু দূরে। অতদূরে পাপান হেঁটে যেতে পারবে না। ঠিক দশটার

সময় মাখন কচুয়ানকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলেছিল নরু। পাপানকে ভর্তি করে দিয়ে ওখান থেকেই সে চালকলে চলে যাবে।

পাপানকে কোলে তুলে নিয়ে অরুন্ধতি কণকলতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, মা আপনার নাতি স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছে, পাপান দাদিকে প্রণাম করো।

নাতির দিকে তাকিয়ে কণকলতার দুচোখ ছল ছল করে উঠলো। এখনো স্পষ্ট মনে আছে এই সেদিন হলো পাপান।

প্রসব বেদনা উঠে ছিল ভোরবেলা। সেই থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত দুঃসহ বেদনায় কষ্ট পেয়েছে সেজ বৌমা। প্রসব না হওয়া অবধি আঁতুড়ের দরজা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও কণকলতা নড়েন নি।

আশ্চর্য হয়ে পাপানকে দেখছিলেন তিনি—এতটুকু একটা রক্ত মাংসের তাল হয়ে শিশু একদিন ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর পৃথিবীর আলো আর বাতাস তার চোখে দৃষ্টি ফোটায়। মুখে ভাষা দেয়। একদিন সে টলমল পায়ে চলতে শিখে সেই মাটিকেই পদাঘাত করে ঘোষণা করে আমার এই অনন্ত চলার সুরু হলো, এ চলা কোনদিন থামবে না। আমি পৃথিবীর বুকে পা রেখে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জয় করবো। আমি মানুষ। জয়েই আমার আনন্দ। জয়েই আমার পরিণতি। জয়েই আমার পরিচয়।

আঁচল দিয়ে যত্ন করে তার মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে কণকলতা বললেন, নরু, মাস্টারদের বলে এসো, ওকে যেন না মারেটারে, না ধমকায়।

পাপান না যাওয়া অবধি সেজ বৌ একটা মানুষের জন্যে বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। সেই সাত সকালে অলোক হন্তদন্ত হয়ে বেড়িয়েছে। যাবার সময় বলে গেছে, এক্ষুণি ফিরবো। অথচ মানুষটার এখনো দেখা নেই। মানুষটা এই রকমই। সংসারের বিশেষ প্রয়োজনে যখনই তাকে দরকার হয় ঠিক তখনই পাওয়া যায় না।

এই নে, এগুলো সব তোর, বাসন্তী একটা নতুন পেনসিল আর একমুঠো গুলি পাপানের হাতে দিল। এতক্ষণ সে ঠিক ছিল। ঐ বাসন্তীকে দেখার পর তার ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে উঠলো। দুচোখের কোল ছপছপে হয়ে ভিজে গেল।

বাসন্তী, তুই আমার সঙ্গে যাবিনে?

বাসন্তী পাপানের কথার জবাব না দিয়ে দলা করে মুখের মধ্যে আঁচল পুরতে পুরতে দৌড়ে পালাল।

বেলা দুটোর পর বাড়ি ফিরলো অলোক।

সকাল থেকে স্নান খাওয়া কিছুই হয়নি। পকেটের একশো টাকার নোটখানার

সবটাই জুয়োয় হেরেছে। আজ দিনটা আর ভাগ্যটা একসঙ্গে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে, অলকানন্দা তার সামনে ভাতের থালা নামিয়ে দিয়ে বলল, ভাঁটা চালকল কোথাও যাওনি শুনলাম।

মাথা নীচু করে ভাত মাখছিল অলোক। সেইভাবেই বলল, কাজ ছিল।

পাপান আজ ইস্কুলে ভর্তি হবে তুমি জানতে না?

অলকানন্দার কণ্ঠস্বরে সাহস নয় হতাশা ফুটলো। এবাড়িতে এই মানুষটার সঙ্গে বড় বৌয়ের অন্য রকম সম্পর্ক।

অলকানন্দা যখন বৌ হয়ে এ সংসারে আসেন তখন অলোক স্কুলের শেষ ক্লাসের ছাত্র। নাইনে উঠেই সিগারেট খাওয়া ধরেছে।

একদিন অলোকানন্দা হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন, তুমি সিগারেট খাও?

খাই। কাউকে বলো না।

বলবো না, তার বদলে আমায় একটা জিনিস এনে দিতে হবে।

কি জিনিস?

ফুল গাছের চারা। বেলী, গাঁদা, সূর্যমুখী....

অলোক কথার খেলাপ করেনি। তাঁর এনে দেওয়া ফুলের চারা গাছ দিয়ে গোয়ালের পাশে ফুলের বাগান হয়েছে। বড় বৌ সবকাজ মিটিয়ে গাছে জল দেয়, সার দেয়, শুকনো পাতা নিজের হাতে পরিষ্কার করে।

সকলের চোখের বাইরে, জানার বাইরে দুজনা সমবয়স্ক নারী পুরুষের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ঠাকুরপো। তোমার দুধে গুড় দেব?

না।

কই বললে নাতো এতো বেলা অবধি কোথায় ছিলে?

বললাম তো জরুরী কাজ ছিল।

মিথ্যে কথা বলছো? তুমি আজও আবার তাসের আড্ডায় গিয়েছিলে, বড় বৌয়ের কণ্ঠস্বর বেদনায় আতুর শোনাল, কতো টাকা হেরে এসেছ আজ?

অলোক জবাব না দিয়ে ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লো।

কদিন পর রাত্তিরে নীচের দালানে খেতে বসে হাত গুটিয়ে বসেছিল নন্দ মাস্টার। লক্ষ্মণ ঠাকুর আর সেজ বৌ দুজন মিলে পরিবেশন করছিল। নন্দমাষ্টার খাচ্ছে না দেখে সেজ বৌ তার কাছে গিয়ে অবাক হয়ে গেল, মাথা নীচু করে বসে নন্দ মাস্টার নিঃশব্দে কাঁদছে। তার কান্নায় কোন শব্দ নেই। শুধু ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে।

একি, মাস্টার মশাই কি হয়েছে আপনার, কাঁদছেন কেন?

খান, ভাত খান।

কান্নার কথা শুনে অরুন্ধুতি তাড়াতাড়ি এসে সেজ বৌয়ের পাশে দাঁড়াল। দেখতে পেল, মাস্টারের মুখখানা থালার ওপর আরো ঝুঁকে পড়েছে, কান্না থামেনি।

আপনার শরীর খারাপ করছে নাকি, তাহলে উঠে পড়ুন মাস্টার মশাই সেজ বৌ তার মুখের ওপর ঝুকে পড়ে বলল, আমি আপনার ভাত ঘরে দিয়ে আসছি, নিন্ উঠুন....।

দক্ষ দৌড়তে দৌড়তে কণকলতার দরজায় পা দিয়ে বলল, দ্যাখো গে যাও, এক তলায় কি হয়েছে।

কি হয়েছে?

সব আমার মুখে শুনতে হবে। গতরটা তুলে নিয়ে একটু বাইরে যাওনা, দিনরাততো যখনই দেখি বই মুখে করে বসে আছো—

কি বললি, তুই কণকলতার দুচোখে ধক্ করে আগুনের শিখা জ্বলে উঠলো, বল্ আগে কি বললি আমায়?

দক্ষ একটুও না দমে গিয়ে বলল, যা লেহ্য তাই বলেছি। সংসারের মালিক হয়েছো আর নাক চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে তা হয় না। যাও, উঠে গিয়ে দ্যাখোগো তোমাদের মাস্টার ভাতের থালার সামনে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লেগেছে।

কণকলতা কোনো জবাব দেবার আগেই দক্ষ হেঁট হয়ে রামায়ণখানা বন্ধ করে দিয়ে বলল, চলো তোমায় ধরে নীচে নামিয়ে দিই। নইলে সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়লে তখনতো এই মাগীকেই সবাই দুষবে।

সেজবৌ নন্দ মাস্টারের সামনে থেকে থালাখানা সরিয়ে নিয়ে তার হাত ধরলো। উঠুন মাস্টার মশাই উঠে পড়ুন, চলুন ঘরে চলুন।

নন্দমাস্টার ওঠার আগেই দক্ষকে নিয়ে নীচে নেমে এলেন কণকলতা, কি হয়েছে বৌমা?

সেজবৌ বলল, কি জানি না, মাস্টার মশাই তখন থেকে কাঁদছেন। আমাদের কিছুই বলছেন না।

সরো, আমি দেখছি, কণকলতা সেজ বৌয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সস্নেহে নন্দ মাস্টারের মাথায় হাতে রাখলেন। তোমার কি হয়েছে নন্দ, এত কাঁদছো কেন?

এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিল নন্দ মাস্টার। এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে যা বলল, তার সারমর্ম্ম এই—

আজ নন্দ মাস্টার স্কুলে পৌঁছনোর পর বোনের বাড়ি থেকে খবর এসেছে তার পাগল ছেলেটার কি হয়েছিল কে জানে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিলো। অনেকক্ষণ তার দেখা না পেয়ে চারধারে খোঁজাখুঁজি সুরু হয়। শেষে কুয়োর মধ্যে থেকে যখন তাকে উদ্ধার করা হয় তখন তার দেহে প্রাণ ছিল না।

(১৮)

আজ দুপুরে বিন্তি খেলা জমলো না। হাতের তাস ফেলে দিয়ে কণকলতা উঠে পড়লেন, তোরা খেল মেজো আমার কাজ আছে।

মেজ অর্থপূর্ণ চোখে বৌদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল কি ব্যাপার, তোদের শাশুড়ির আজ বিন্তি খেলায় অরুচি? কণকলতার মনের খবর তাদেরও জানা নেই। আজ সকাল থেকেই অরুন্ধুতি লক্ষ করেছে, কণকলতা মুখ ভারী করে আছেন। অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেকদেরী করে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েছেন। নাতি নাতনীদের স্কুলে যাবার সময়েও কোন কথা বলেন নি।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এলেন কণকলতা। সেখানে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল দীননাথ।

মা, দীননাথের গলা কেঁপে গেল, আমি সাহস করে বলতে পারিনি।

কণকলতা অদ্ভুত একদৃষ্টিতে দীননাথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, আশ্চর্য, তুমি জানতে তাও আমাকে বলো নি? তুমি তো ধীরুর সঙ্গে গিয়েছিলে—

দীননাথ নিরুত্তর।

তুমি আমার চাকরি করো না ধীরুর? এবার কণকলতার কণ্ঠস্বর ক্রোধে তীক্ষ্ণ শোনাল।

বড়বাবু আমায় বলতে নিষেধ করেছিলেন।

বাঃ তাই তুমিও বললে না?

উনি নিজেই আপনাকে বলবেন বলেছিলেন?

তুমি সবকথা সদর থেকে ফিরে সেইদিনই আমায় জানাও নি কেন? নরুকে বলো তোমার হিসেব পত্তর সব আজই মিটিয়ে দেবে। তোমাকে আমার আর চাইনে।

মা—দীননাথ কেঁদে ফেলল।

যাও, দূর হও আমার সামনে থেকে।

দীননাথ তাও নড়লেন না। দাঁড়িয়েই থাকলেন।

কণকলতা কদিন আগে জেলা সদরে পাঠিয়েছিলেন বড় ছেলে ধীরুর হাতে চার হাজার টাকা দিয়ে। খবর পেয়েছিলেন, ভালো একটা মহলি সম্পত্তি সরকার সেদিন নিলেমে তুলবে। নিলেমে সম্পত্তিটা কিনেছে ধীরু কিন্তু কণকলতার নামে না কিনে বড় বৌয়ের নাম কিনেছে।

কথাটা কানে আসার পর থেকেই ছটফট করেছেন কণকলতা। কষ্ট নয়, অন্য একরকম ভয়ে বুকখানা হিম হয়ে গেছে তাঁর। তার মনে হচ্ছে চোরা একটা ভূমিকম্প তাঁর অজান্তে এই সংসারের দিকে থাবা বাড়িয়েছে। এই মুহূর্তে তাকে ধ্বংস করতে না পারলে তাঁর এত সাধের সংসার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

কিছুদিন থেকেই কণকলতা কানাঘুষো খবর পাচ্ছিলেন ধীরু বৌয়ের নামে পোস্টাপিসে বই খুলেছে। সোনা কিনছে। টাকা কোথা থেকে পাচ্ছে ধীরু?

দীননাথের দিকে আর একবারের জন্যেও দৃকপাত না করে কণকলতা নিজের ঘরে ফিরে এসে বললেন, তাস দাও, আমি আবার খেলবো।

দিন তিনেক পর সকালে দৌড়তে দৌড়তে এসে জয়ন্তী খবরটা দিল, মা মাস্টার মশাই ঘরে নেই।

কোথায়?

তা জানিনে। লক্ষ্মণ ঠাকুর বলছিল কালরাত্তিরে ফেরেন নি, খানও নি। ভাত ঘরে যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

গঙ্গাস্নান সেরে এসে সবে ঠাকুরঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন কণকলতা। ছেলের মৃত্যু সংবাদ পাবার পর থেকেই নন্দ মাস্টার কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে গিয়ে ক্লাসে পড়ানোর বদলে চুপ করে বসে থাকতো। বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে একলা বিরবির করে বকতো। ঠাকুরঘরে ঢুকে গোপালের মূর্তির সামনে দাঁড়ালেন কণকলতা, মনে মনে বললেন, মানুষকে তুমি এতদুঃখ দাও কেন ঠাকুর? নন্দমাস্টার তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি তাহলে তাকে এশাস্তি দিলে কেন? জপে বসেও কিছুতেই তিনি মনস্থির করতে পারলেন না। বারবার নন্দমাস্টারের ক্লান্ত এবং হেরে যাওয়া মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। একসময় জপ শেষ না করেই উঠে পড়লেন তিনি, তুমি তো পাথর, তোমার চেয়ে আমার রক্তমাংসের মানুষ অনেক বেশী আপন।

উঠোনে এসে কণকলতা দেখলেন বাসন্তী একপাশে হাঁটু মুরিয়ে বসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ভেজা চুল শুকোচ্ছে।

দ্যাখতো, তোর দাদারা কেউ বাড়িতে আছে কিনা?

কণকলতা কথাটা বাসন্তীকে বলতে বলতে নিজেই কাছারি ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। বাসন্তী একমুহূর্ত দেরী না করে একলাফে উঠোনের সিঁড়ি টপকে কণকলতার পাশ দিয়ে কাছারির দরজার সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, নদা, শিগগির এসো, মা ডাকছে।

বাসন্তীর পিঠ ভর্তি কোকড়া চুলের বোঝা। ডুরে কাটা একখানা শাড়ির সঙ্গে সাদামাটা ব্লাউজ। চকচকে দুটো চোখ। যেন নিজের সন্তানকে অনেকদিন পরে হঠাৎ আবিষ্কার করে বিস্ময়ে মুগ্ধতায় তার সমগ্র হৃদয় ও দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে গেছে এইভাবে কিছুসময় নিশ্চল হয়ে থাকলেন কণকলতা। তারপর নিজেকে গোপন করে নিজেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বাসন্তীও বড় হয়ে গেল। তাঁর নিজের রক্ত মাংসের ভাগ দিয়ে তৈরী এই সন্তানটিও একদিন পরের ঘরে চলে যাবে। তাঁকে ছেড়ে। এ সংসারকে ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একটা পৃথিবীকে নিজের বীজ রোপনের সাধনার সফলতায় সুখও আনন্দে বুঁদ হয়ে থেকে বাসন্তীও একদিন তাঁর মতই বুড়ো হয়ে যাবে।

মা, আমায় ডেকেছেন?

নিখিল। কণকলতার ন'ছেলে। তাঁর এই ছেলেটির সঙ্গে অন্যকারুর মিল নেই। মাথায় বেশ খাটো। বলিষ্ঠ দেহ। পরিশ্রমী কিন্তু ধূর্ত্ত। স্বার্থপর।

কণকলতা বললেন, নন্দ মাস্টারকে কাল রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষটা কোথায় গেল একটু খোঁজ করে দ্যাখো।

কোথায় আর যাবে, নিখিল কণকলতার কথায় খুব বেশী গুরুত্ব না দিয়ে বলল, এদিকেই কোথাও আছে। সন্ধ্যে অবধি দেখুন, তখন না ফিরলে খোঁজ নেব।

না, এখনই লোক পাঠাও। কণকলতার চোয়াল দৃঢ় হলো, সন্ধ্যে অবধি তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না।

ঠিক আছে, এখনই পাঠাচ্ছি।

নিখিল চলে গেল। অলোকের দুবছর পর হয়েছে নিখিল। অনেক বুঝে শুনেই কণকলতা তার জন্যে লেখাপড়া জানা মেয়ের খোঁজ করে শেষ অবধি তাঁর নবৌকে পছন্দ করেছিলেন। নবৌও তাঁর অন্য বৌদের মতন ন্যাকা বোকা নয়। কণকলতা বুদ্ধিমতী মেয়েদের পছন্দ করেন কিন্তু বেশী বুদ্ধির ধারে মাঝে মাঝে যে সংকট সংসারের সামনে থাবা মেরে দাঁড়ায় সেই বুদ্ধিকে মনে মনে ভয়ও করেন তিনি।

বেলা তিনটে পর্যন্ত ঠায় এক জায়গায় বসেছিলেন কণকলতা। সকাল গড়িয়ে দুপুর। মাঝে একবার অলকানন্দা তাঁর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলেছিল, মা, এতো বেলা হয়ে গেল দুটো কিছু খেয়ে নিন।

কাল আবার আপনার একাদশী আছে।

কণকলতা নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠেন নি।

বলেছিলেন, তোমরা খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে নাও। আমার জন্যে ভেবো না।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর দোতলায় উঠে গেলেন কণকলতা। আজ তাসের আসর বসল না। মেজ যথারীতি এসেছিল। গিন্নীর মন মেজাজ ভালো নেই শুনে আড়ালে বড় বৌকে বলল, তোর শাশুড়ির ভীমরতি হয়েছে, কোথাকার কে তার ঠিক নেই তারজন্যে উপোষ করে বসে আছে। তাও যদি নিজের পেটের কেউ হতো—।

চুপ করো ঠাকুরঝি, শুনতে পাবেন।

থাম তুই বড় বৌ, শুনলে আমার বয়ে যাবে। আমার মনে মুখে এক পাবিনে। এলাম, দুহাত বিস্তি খেলে সময় কাটাবো বলে, তা নয়....

ঠাকুরঝি পান খাবে। সেজ বৌ সামনে এসে দাঁড়াল, নতুন জর্দ্দা এনেছে কলকাতা থেকে।

সেধে সেধে পান দেওয়া তার ওপর নতুন জর্দ্দার লোভ দেখানো।

তোর ব্যাপার কি বলতো সেজ বৌ। একনিশ্বাসে সবকটা কথা বলে মেজ চোখ মটকে হেসে উঠলো, আবার বাধিয়েছিস নাকি? তোকে দেখে যেন কেমন কেমন লাগছে—

অলকানন্দা তার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন—তোমার মুখে কিছু আটকায়না মেজ।

ওমা, তোরা বরের সঙ্গে যে বছর বছর ছেলে বিয়োবি আর আমি বললেই দোষ। কই দে, পান দে, মুখে দিয়ে পালাই। হ্যারে, কলকাতা থেকে দরজা কে আনলো তোর ভাতার? শুনলাম, সে নাকি আজকাল দুদিন অন্তর কোলকাতায় দৌড়চ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা নন্দ মাস্টারের খবর পাওয়া গেল। এ বছর শীতে কণকলতা তাকে যে বালাপোষ খানা দিয়েছিলেন সেখানা একটা বাড়ির বারান্দায় এক ইঞ্চিপুরু ধুলোর ওপর বিছিয়ে হাত পা ছড়িয়ে তার ওপর উলঙ্গ হয়ে শুয়েছিল নন্দ। পরনের ধুতি খানা খুলে পাশে ভাঁজ করে রাখা।

নরু বলল, মাথাটা একদম নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কতো ডাকলাম আমাকে চিনতেই পারলেন না। ওনাকে কি ধরে বাড়িতে আনবো?

না, চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে নিয়ে কণকলতা বললেন, ওকে এনেও আর কোন লাভ হবে না, নরু। নন্দর কপালে এই লেখা ছিল, আহা।

শহরে কদিন থেকে দারুন হৈ চৈ সুরু হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির ভোট এসে পড়ল বলে। কাল সং নিয়ে বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল। অনেকরাত পর্যন্ত সে মিছিল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সঙ্গে মুখে চোঙা লাগিয়ে চিৎকার করে ভোট দেবার প্রার্থনা।

আজ সকাল থেকে সারা শহরে জোর গুজব একটা দল কলকাতা থেকে মোটর ভাড়া করে আনছে। তারা তাদের প্রার্থীকে মোটরে বসিয়ে সারা শহর ঘোরাবে।

মোটর নামটা অনেকেই শুনেছে কিন্তু সেটি কি বস্তু তা কেউ চাক্ষুস দেখেনি। সেই মোটর যানটার চাকা নাকি রবারের। তাতে তেল ঢাললেই চলে।

সং এর মিছিল এ শহরে পুরনো হয়ে গিয়েছে। তার বদলে মোটর আনতে পারলে সংএর দলকে টেক্কা দেওয়া যাবে।

ভোট নিয়ে এত মাতামাতি কেন যেন পছন্দ হচ্ছিল না ধীরুর। বছর কয়েক হলো এ শহরে মিউনিসিপ্যালিটি করেছে সরকার। তাদের মাইনে করা মেথর আসে রোজ সকালে। খাটা পায়খানা পরিষ্কার করে একটা টিনের বালতিতে মল তুলে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ফেলে আসে।

ধীরু শুনেছে, এবার যেদল ভোটে জিতবে তারা শহরের ইটের রাস্তাগুলো সব পাকা করে দেবে। কথাটা শুনেও বিশ্বাস করেনি সে।

সন্ধ্যেবেলা এই নিয়েই কাছারি ঘরে দুদলে তর্ক বেধে গেল। নিখিল বলল, পাকা রাস্তা করা অতো সহজ নয়। আর পাকা রাস্তা করে সবায়ের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাবে সেটা বুঝতে পারছো না তোমরা। সং দেখিয়ে, মোটর গাড়ি দেখিয়ে শেষ অবধি আমাদেরই ঘাড় ভাঙ্গবে। এখনই চাল চার-পাঁচ টাকা মণ হয়েছে এরপর পাকা রাস্তায় হাঁটলে ঐ চাল দশ টাকা মণে কিনতে হবে।

দীননাথ একপাশে বসে সকলের তর্কাতর্কি শুনলেও, নিজে একটি কথাও বলেনি। মনে মনে নিখিলকেই সমর্থন করলো সে। দূর, মানুষের পেটে যদি ভাত না থাকে তাহলে পাকা রাস্তা দিয়ে কি খেয়ে হাঁটবে। তর্ক সুরু হয়েছিল ভোট নিয়ে হঠাৎ সে তর্ক প্রসঙ্গ বদলে ইংরেজ শাসনে চলে এলো।

দুলাল দত্ত ফরাসের ওপর পা তুলে বসেছিলেন। মোটা সোটা চেহারা। গায়ের রং পাকা সোনার মত। ফতুয়া আর মোটা খদ্দরের ধুতি পরনে।

সবাই জানে দুলাল মাস্টার ইস্কুলে ইতিহাস পড়ান কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর একটা আলাদা পরিচয় আছে। কিছুদিন আগে চিত্তরঞ্জন দাস যখন এই শহরে এসেছিলেন তাঁর সভায় খালি গলায় বন্দেমাতরম গান গেয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন দুলাল। সেই থেকে পুলিশের খাতায় তাঁর নাম আছে।

দুলাল বললেন, পাকা রাস্তা তৈরি হবার দরকার আছে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে আমাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে, তাকে আগে সোজা করা দরকার ধীরুবাবু।

ধীরুর দুচোখ এতক্ষণ লাল ঘেড়ো খাতায় লেখা হিসেবের অঙ্কের ওপর লেপটে থাকলেও কান দুটো খোলা ছিল। এবার খাতা বন্ধ করে চোখ তুলে সকলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, মাস্টার মশাই, যুদ্ধ কি সত্যিই লাগবে? আপনি কি বুঝছেন?

সেজবাতির উজ্জ্বল আলোর ওপর দৃষ্টি স্থির করে রেখেছিলেন দুলাল। সেই ভাবেই বললেন, ধীরু বাবু, যুদ্ধ ব্যাপারটা খুব মজার। ওটা আপনা আপনি লাগে না। কেউ লাগায়। ইংরেজরা যদি হিসেব পত্তর করে দেখে যুদ্ধ লাগলে তাদের লাভ তাহলে যুদ্ধ লাগবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ষষ্ঠী পালের গঙ্গার চড়ে পাটের আড়ৎ। বছরে অনেক টাকার কারবার করে সে। পাট কিনে সরাসরি জুট মিলে চালান দেয়। এই আসরে নিত্যদিন হাজিরা দেয় পাল। কিন্তু পারতপক্ষে কথা বলতে চায় না। মন দিয়ে সকলের কথা শোনে। বাড়ি ফিরে রাতে শোবার পর সেই পাঁচ কথা নিয়ে নিজের মনের মধ্যে উল্টেপাল্টে দেখে। বিচার করে। ষষ্ঠী পাল ঘাড় তুলে সোজা হয়ে বসে বলল, মাস্টারবাবু, তাহলে তো আকাল সুরু হলো?

দুলাল মাস্টার নিঃশব্দে হাসছিলেন। পালের কথার উত্তরে বললেন, আকাল এদেশের জন্মকাল থেকেই আছে পাল মশাই। ধীরু বাবুর ভাঁটার ইট আটটাকা হাজার হয়ে গেল। যখন চারটাকা হাজার ছিল তখনো দেয়াল আর ছাদ পাকা করতে পারিনি। আকাল নিয়ে মাস্টার আরো দুচার কথা বলতেন কিন্তু তার আগেই শুকনন্দন ভেতর থেকে এসে বলল, কর্ত্তামা আপনাকে ডাকছেন, মাস্টারবাবু।

মাঝে মধ্যেই এবাড়িতে আসেন দুলাল। কিন্তু একবারেরর জন্যেও কখনো কাছারির চৌহদ্দি পেরিয়ে এবাড়ির অন্দরে পা রাখেন নি। আজ খোদ কর্ত্রীর কাছ থেকে ডাক পেয়ে তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন।

অবাক ধীরুও কম হয়নি। কিন্তু তবু সে এ ব্যাপারে একটি কথাও বলল না। দুলাল ধীরে ধীবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো কোথায় যেতে হবে।

হ্যারিকেনের আলোয় পথ দেখে শুকনন্দনকে অনুসরণ করে দোতালায় উঠে এলেন দুলাল। একখানা কাঠের চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে রেখে শুকনন্দন কণকলতাকে খবর দিতে গেল।

কণকলতা কাছাকাছিই ছিলেন। দুলালের আসার অপেক্ষাতেই ছিলেন বোধহয়। সামনে এসে বললেন, বসো বাবা, বসো।

কণকলতার মাথায় ঘোমটা। গায়ে সিল্কের চাদর। হাতদুখানি চাদরের নীচে।

দুলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ, আমি তোমায় অনেকদিন ধরে খুঁজছি। আমার একটা কাজ তোমায় করে দিতে হবে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দুলাল বললেন, কি কাজ বলুন। চাদরের ভেতর থেকে ডান হাতখানা বার করে দুলাল মাস্টারের একখানা হাত টেনে নিলেন কণকলতা। সেই হাতে দশটা সোনার মোহর রেখে বললেন, এগুলো তুমি পৌঁছে দিও বাবা। উনি যখন এখানে এসেছিলেন তখন খুব ইচ্ছে হয়েছিল নিজে.র হাতেই এগুলো ওনাকে দেব কিন্তু পারিনি। আমার এই ইচ্ছেটুকু তোমাকে পূ।ণ করতে হবে।

আর একটা কথা, এই জন্যে তোমাকে ডেকে প।ঠিয়েছি তা আর কাউকে বলার দরকার নেই।

মোহর কখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে দুলাল কয়েক সেকেন্ড মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্বাক হয়ে থাকলেন। তারপর বল।লন, চিত্তরঞ্জন এখন সারাদেশে চরকির মতন ঘুরছেন। ওঁর সঙ্গে আমি কোথায় দেখা করবো, কেমন করে দেখা করবো বুঝতে পারছিনে। আপনি এখন মোহরগুলো রাখুন। কলকাতায় যাবার সময় আমি আপনার কাছে চেয়ে নেব।

এগুলো তোমার কাছেই থাকুক।

দুলাল বললেন, না, আমি গরীব স্কুল মাস্টার। আমার ঘরে বাইরে অনটন। কোনো দুর্বল মুহূর্তে এগুলো নষ্ট করে ফেললে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য রাস্তা থাকবে না। আপনি আমায় সে পাপের হাত থেকে বাঁচান।

কথা শেষ করে দুলাল কণকলতার পায়ের কাছে মোহরগুলো নামিয়ে রাখলেন। তারপর যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললেন, আমি আজ চলি।

মেজ বৌ হ্যারিকেন হাতে নিয়ে তাকে সঙ্গে করে দোতলা থেকে নীচে নামিয়ে দিয়ে গেল।

(১৯)

অনেকদূর থেকে শব্দটা কানে আসছিল। ভোটের মিছিলটা এদিকেই আসছে। যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসে দোতলার ঝুল বারান্দায় ভিড় করে দাঁড়াল। আজকাল রোজই রাস্তা দিয়ে মিছিল যায়। গরুর গাড়ির ওপর বসানো মাটির তৈরী হরেক রকমের সঙ্ টেনে নিয়ে যায় মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে।

কাল একটা সঙ্ দেখতে হাসতে হাসতে অরুন্ধতি বারান্দার ওপরে লুটিয়ে পড়েছিল।

সঙ্টা এইরকম—একটা মানুষ উপুড় হয়ে আছে। তার ঠিক পেছনটিতে আর একজন চটের বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে। পুতুল দুটির মাথার ওপর বড় বড় করে লেখা—নরকে দিলে ফাঁকি পেছন দিয়ে বেরবে পাখী।

আজ মিছিলে নতুন কি সঙ্ বেরবে কে জানে।

কণকলতা তাঁর ঘরে মেঝেয় বসে কি যেন করছিলেন।

জয়ন্তী এসে বলল, মা শিগগির চলুন, সঙ্ আসছে।

আসুক তখন যাবো।

ঐ তো দেখা যাচ্ছে, এক্ষুনি এসে পড়বে।

হাতের কাজ রেখে কণকলতা যতক্ষণ না উঠলেন ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো জয়ন্তী।

জয়ন্তীর সঙ্গে বারান্দায় এসে কণকলতা দেখলেন, কোলের বাচ্চাটাকে নিযে ন বৌমাও সঙ্ দেখতে এসেছে। ওইটুকু দুধের শিশু চেঁচামেচিতে যদি চম্‌কে যায়...

মনে মনে বিরক্ত হলেও কিছু বললেন না তিনি।

বারান্দার শেষ কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এতক্ষণ মনে হচ্ছিল মিছিল এক্ষুনি এসে পড়বে। কিন্তু পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পরেও মিছিলের দেখা নেই। বিরক্ত হয়ে কণকলতা যখন চলে আসবেন ভাবছেন ঠিক তখনই দূর থেকে গেট বাতির ঝলমলে আলোর সারি দেখা গেল। একসঙ্গে অনেক মানুষের জটলা, তাদের পেছনে ছাদ খোলা মোটরে হাত জোড় করে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে কণকলতার বুকের মধ্যে আবেগের ঢেউ উথলে উঠলো। তাঁরই ভাইপো পূর্ণেন্দু।

কতো মানুষ জড়ো হয়েছে তাকে ঘিরে। কয়েকজন মুখে চোঙা লাগিয়ে চিৎকার করে ভোট প্রার্থনা করছে।

বেশীর ভাগ মানুষই মোটর দেখার আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। এই যন্ত্র যানটি তার অভূতপূর্ব অবয়ব নিয়ে মানুষগুলোর মনে যে সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে তার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাদের বিস্ফারিত চোখের মণিতে লেগে আছে।

কণকলতার মনের মধ্যে কি রকম যেন একটা হচ্ছিল। পূর্ণেন্দুকে তাঁর ভীষণ অচেনা মনে হচ্ছিল। অথচ তার জন্যেই একটা গর্ব সুখের নদীর মত তাঁর সমস্ত অনুভূতি জুড়ে কলকল ছলছল করছিল।

মোটর খানা তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। মিছিলের মানুষগুলোও দাঁড়িয়ে পড়লো। সকলকে অবাক করে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তাঁর বাড়িতেই ঢুকে পড়ল পূর্ণেন্দু। ঘটনাটা কি ঘটছে তা ভালো করে উপলব্ধি করার আগেই কণকলতা বুঝতে পারলেন পূর্ণেন্দু হেঁট হয়ে তাঁর পায়ে হাত রেখেছে, পিসি কাল ভোট, তোমার আশীর্বাদ নিতে এলাম। দুহাতে তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে নিতে আনন্দে কেঁদে ফেললেন কণকলতা।

রাত্তিরে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেবার আগেই অলকানন্দা টের পেলেন ধীরু তখনো জেগে আছে। মশারীর মধ্যে থেকে তার দুটো চোখ তাকেই দেখছে।

কি হলো, এখনো ঘুমোনওনি?

অলকানন্দা মেঝে থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে তার পলতে কমিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে আন্‌লা থেকে শাড়ি ব্লাউজ টেনে নিল।

যে পুরুষ তার পায়ের নখ্ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রতিটি ইঞ্চি চেনে তার সামনেও কাপড় ছাড়তে অলকানন্দার হাত পা অসার হয়ে যায়।

সতর্কচোখে একবার মশারীর দিকে দেখে নিয়ে ঘরের কোণে অন্ধকারের মধ্যে ঘিরে গেল বড় বৌ। সেই কোন্ সকাল থেকে এত রাত অবধি কই তার একবারও তো এই মানুষটার কথা মনে পড়েনি। এ সংসারের প্রতিটি মানুষ তার নিজের নিজের প্রয়োজনে অলকানন্দাকে পেয়েছে কিন্তু তার জীবনে যার সবচেয়ে বেশী, সবচেয়ে আগে অধিকার তার জন্যেই অলকানন্দা ভীষণ কৃপণ। অলকানন্দা জানে তার শরীরে এখনো অনেক আকর্ষণ আছে। চট করে তাকে দেখলে বোঝা যায় না একটা বড় ছেলে আছে তার। অলকানন্দা নিজের দেহের কোষে কোষে, রক্ত বিন্দুতে মাঝে মাঝেই একটা গোপন তৃষ্ণার দাবী

টের পান। হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, মন সব জুড়ে সেই চাহিদা আকণ্ঠ তৃষ্ণা হয়ে তাকে বড্ড কষ্ট দেয়। জ্বালিয়ে মারে। তবু এই মানুষটাকে সে তার মনের কথাটা বলতে পারে না। স্বামীকে ভয় করে সে। হ্যাঁ, ভীষণ ভয় করে। কেন ভয়, কিসের জন্য ভয় তা জানে না বড় বৌ। জানে, এই মানুষটা তার স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তারসঙ্গে সম্পর্ক ভয়ের ভালবাসার নয়।

কাপড় ছেড়ে গায়ে পিঠে পাউডার দেবার পর বিছানায় এলো অলকানন্দা। বালিসে মাথা দেবার আগে ধীরুর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে ধীরুর জেগে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল।

এতক্ষণে আসার সময় হলো?

অলকানন্দা এ পাশে ঘুরে ফিরে স্বামীর বুকে হাত রাখলো, রোজতো এই সময়েই আসি।

এঁটো বাসন টাসন মেজে বুঝি ছুটি পেলে?

একথা বলছো কেন, বাসনতো ঠিকে ঝিটা মাজে।

সে না থাকলে তুমিই মাজতে।

তাতে কি হয়েছে। নিজের বাড়ির কাজ সব মেয়েরাই করে।

না করে না, ন বৌমা করে? তুমি একটি উজবুক বলে সবাই তোমাকে দিয়েই করায়।

ধীরু একতলার এই ঘরখানা নিজেই পছন্দ করে নিয়েছিল। বড় বড় জানলা। একতলা হলেও সব সময় অফুরন্ত হাওয়া। পায়ের দিকের জানলা খুললে পেয়ারা গাছটার পেছনে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়।

সারাদিন পরিশ্রমের পর মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে ধীরু। শুয়ে শুয়ে মনে পড়ে যায় বাবার মৃত্যুর পর আঠারো বছর বয়সে তার মাথার ওপর এতবড় সংসারটার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন কণকলতা। সেই থেকে একনাগারে বোঝা টেনে চলেছে। এখন হঠাৎ হঠাৎ একসময় নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হয়। মনে হয় বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলাম আমি। তারপর কি হবে?

কি হবে তারপর?

এই কথা ভাবতে ভাবতে ধীরুর মনের গভীরে একটা অতিসূক্ষ্ম স্বপ্নের ভ্রূণ প্রবল ইচ্ছে হয়ে বুকের মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে।

হ্যাঁ, নিজেকে বাঁচাতে হলে এই স্রোত থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। একদম আলাদা। তারজন্যে এখন থেকেই একটা একটা করে ঘুঁটি সাজাতে হবে। শেষ

ঘুঁটিটার দান দেবার পর সবাই তাকে বলবে তিনি বেইমান ... কিন্তু তার জন্যে ধীরুর মনে কোন আপশোষ নেই।

সবাই বলছিল তুমি নাকি ...

আমি নাকি কি? ধীরু মাথা তুলে প্রশ্ন করলো?

তুমি নাকি মার টাকা দিয়ে নিলেম ডেকে আমার নামে সম্পত্তি কিনেছ?

ও, একথা তাহলে জানা হয়ে গেছে।

ছিঃ, তুমি একি করলে, কথাটা শোনার পর থেকে লজ্জায় আমি মার সামনে যেতে পারিনি।

ধীরু অসহিষ্ণু হাতে অলকানন্দার মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। বলল, তুই একটা বোকা। আরে মাগী, জমিদারি আমি কিনেছি তোর নামে তারজন্যে তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন?

তুই কি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলি, তাহলে?

ধীরুর হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিল অলকানন্দা। বিছানার একপাশে ছিটকে সরে যেতে যেতে বলল, কুলিকাবারিদের সঙ্গে মিশে বেশ ভাল ভাষা শিখেছ দেখছি। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিওনা।

বাঃ, ভদ্রলোক দেখাচ্ছিস আমাকে, ধীরুর শরীরটা টান টান হয়ে গেল উত্তেজনায়। একটানে মশারীর দড়ি ছিঁড়ে ফেলল, আমায় ভদ্রলোক দেখাচ্ছিস? দেব বিদেয় করে। বেশী তেজ দেখাতে আসিসনে, বুঝলি।

বুকের একটা গোপন ক্ষতে নির্মম ঘা খেয়ে পলকের জন্যে হতচেতন হয়ে গেল বড় বৌ। শরীরের রক্ত মাংসের মত দারিদ্রের কলংক আমৃত্যু লেগে থাকবে তার সঙ্গে। যখনই সুযোগ পাবে এই মানুষটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে সেই ক্ষতে হাত দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে।

বালিসে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠলো অলকানন্দা।

দিনের আলো ফোটার অনেক আগেই দক্ষর উঠোনে জল ঢালার শব্দে বড় বৌয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। গত রাত্তিরটা মূহুর্তের মধ্যে তার স্মৃতিতে ফিরে এলো। পাশে চোখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। তাঁরই হাঁটুর কাছে মুখ গুঁজে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে আছে ধীরু। একখানা হাত তার কোমড়ের ওপর রাখা। এই মূহুর্ত্তে ধীরুর মুখখানা একটা পরনির্ভর অসহায় শিশুর মুখের মত দেখাচ্ছে।

অলোকনন্দা নিঃশব্দে ধীরুর হাতখানা নিজের গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলো। একমিনিট পরে ঘর ছেড়ে বেরবার আগে ধীরুর মাথাটা তুলে তার নীচে একটা বালিস দিয়ে দিল।

(২০)

অলোক দুদিন পর কলকাতা থেকে ফিরলো।

তার পকেটে কড়কড়ে দশ হাজার টাকার নোট। নোটের বাণ্ডিলটা অলোকের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে সুরজমলবাবু বলেছিলেন, জলদি জলদি একটা মোটর নিয়ে নিন বাবু। হ্যা ইজ্জতটা হচ্ছে সবসে আগে। আপনি লাখ লাখ টাকার কারবার করবেন আর সাইকেলে ঘোরাফিরা করবেন কেউ আপনাকে ইজ্জত দিবে না।

সুরজমলবাবু কথাটা মন্দ বলেন নি। সেই থেকেই মোটর কথাটা আলোকের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

নিজের একটা মোটর ... তাতে চেপে ঘুরে বেড়ানো ...

এ শহরে ভোটের সময় সেই প্রথম কলকাতা থেকে পূর্ণেন্দুর দল মোটর ভাড়া করে এনেছিল।

উঁচু নীচু ইটের অসংখ্য গর্ত, বাড়ি থেকে ফেলা জঞ্জালের আর আবর্জ্জনার পাহাড়, তার সঙ্গে কাঁচা নর্দ্দমা থেকে উপচে আসা পচা দুগর্ন্ধ জলের স্রোত... এই সবকিছুকে অবলীলায় অস্বীকার করে ঝক্‌ঝকে্‌ মোটরের নরমগদিতে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে হাওয়ার গতিতে চক্কর দিয়ে বেড়ানো... সুরজমলবাবু ঠিকই বলেছেন, লছমীজী নিজেই আজকাল মোটরওলা বাবুদের বেশী পছন্দ করেন। তাদের কাছে থাকতে ভালবাসেন...

ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যাণ্ডের দিকে যাবার আগেই আলোকের চেনা একজন কচুয়ান এগিয়ে এলো, চলুন সেজবাবু, আমার গাড়িতে উঠুন, আপনাকে বাড়ি পৌছে দিই।

স্টেশন থেকে নেমে সবাই হেঁটেই বাড়ি ফেরে। জোর কদমে হাঁটলে এক মাইল রাস্তা পনেরো কুড়ি মিনিটের বেশী লাগে না।

গাড়িতে উঠতে গিয়েও অলোক দাঁড়াল, হ্যারে ঘোড়াটা নতুন কিনলি নাকি?

হ্যাঁ, সেজবাবু একদম পক্ষীরাজের বাচ্চা। শোনপুরের মেলা ফেরৎ এসেছিল। সস্তাতেই পেয়ে গিয়েছি।

কতোয় নিলি?

তিরিশ টাকায়।

বালিস কিরে, তিরিশ টাকা? একদম ঠকে গিয়েছিস্।

বয়স হয়েছে জন্তুটার, বেশীদিন গাড়ি টানতে পারবে না।

এটা সেজবাবু ঝগরু রামের জন্য হলো। আমারও মনে হয়েছিল বয়সটা একটু বেশী। ঝগরু দাঁত দেখে বলল, এখনো দশ বছর গাড়ি টানবে নিয়ে নে ধন্শা।

অলোক গাড়িতে উঠে বসে বললো, নে চল্ এখন। যা হয়েছে তারজন্য আফশোস করে লাভ নেই।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেমে নেমে একটা গোটা সিকি দিলো অলোক। ধনশা সিকিটা কানে গুঁজে বলল, কাল ফুলবাবুকে চড়ের ওদিকে হাওয়া খেতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফুলবাবু নগদ একটাকা দিয়েছেন।

এই সন্ধ্যে রাতেই কাছারিতে অনেক মানুষের ভিড়। ইট সুরকি কেনার খদ্দের ছাড়াও ভাঁটার মিস্ত্রি তুলসী আছে। চালকলের বয়লার চলায় যে ছোকড়া সেও একপাশে বসে আছে। গরুর গাড়ির একদল গাড়োয়ান বারান্দায় একসঙ্গে বসে বিড়ি খাচ্ছে। সারাদিন ধরে এরা খদ্দেরের বাড়িতে ইট সুরকি পৌছয়। সন্ধ্যে বেলা এসে হিসেব করে ভাড়া নিয়ে যায়।

এরা বিদায় নেবার পর নতুন দলের ভিড় জমতে সুরু করে। শহরের ভদ্রলোকেরা ছাড়াও সেই দলে থাকে ধীরুর বন্ধুরা। পাটের আড়তদার ষষ্ঠী পাল। এক একদিন এই দলে এসে জুটে যান স্বদেশী করা দুলাল মাস্টার।

দীননাথ জিবি কালির দোয়াতে পেতলের নিব ডুবিয়ে খেড়ো খাতায় হিসাব লিখতে লিখতে কানদুটো সজাগ রাখে যাতে একটি কথাও তার অজানা না থেকে যায়। তার উল্টো দিকে বসে নরু গাড়োয়ানদের সঙ্গে তাদের খেপ্ নিয়ে দরদস্তুর করে। আর ঘন্টায় ঘন্টায় উঠে গিয়ে বারান্দায় অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে ফুক্ ফুক্ করে বিড়িতে দুটো টান দিয়ে আসে। বেশীক্ষণ নেশা না করে থাকলে তার পেট ফোলে।

আজ কিন্তু নরু একবারও ওঠে নি। গাড়োয়ানদের হিসেব নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। কাল তার কানে একটা কথা এসেছে। কথাটার সত্যি মিথ্যে যাচাই না করে কাউকে বলাও যাচ্ছে না। কথাটা সেজবাবু অলোককে নিয়ে।

সবাই জানে সেজবাবু কলকাতায় গিয়েছেন নতুন ফর্মার অর্ডার দিতে। কিন্তু নরুর কানে এসেছে ফর্মার অর্ডার দেওয়াটা বাহানা। আসল কাজ সুরজমল

বাবুর সঙ্গে দেখা করা। শেঠের লোক এসে সেজবাবুকে কলকাতায় যাবার নেমন্তন্ন করে গিয়েছে।

সদর দরজার সামনের রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াল তারপর সে গাড়ি আবার চলেও গেল। কাছারিতে বসে বসেই নরু বুঝতে পারলো সেজবাবু কলকাতা থেকে ফিরলেন। এখনি এবাড়ির বাতাসে কান পাতলে কিছুই শোনা যাবে না। তবে আবহাওয়াটা কি রকম তা একবার জরিপ করে দেখা যেতে পারে।

নরু টুক করে উঠে পড়লো। কাছারি ছেড়ে নিঃশব্দে ভেতরে চলে এলো। সেখান থেকে এক তলার উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে সটান দোতলার কণকলতার ঘরে। কণকলতা চৌকির উপর দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর সামনে কলকাতা থেকে আনা ভীমনাগের সন্দেশের বড় একটা বাক্সো। মিষ্টির বাক্সো তখনো খোলা হয়নি।

কর্ত্তামা?

নরু, কিছু বলবে?

সেজবাবু কলকাতা থেকে ফিরেছেন নাকি?

এইমাত্তর ফিরলো। কেন, কোন দরকার আছে নাকি?

না, তেমন জরুরী কিছু নয়, এমনি। নরু ঢোক গিলল, সেজবাবু নাকি এখানে আর থাকবেন না?

কণকলতা চমকে মুখ তুলছেন, কে এখানে থাকবে না, স্নেহাংশু?

কোথায় যাবে সে?

নরু মাথা চুলকে বলল, ওই রকম কি যেন শুনছিলাম।

কি শুনছিলে?

মেজবাবু এখানকার বাস উঠিয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবেন।

স্নেহাংশু ঘরজামাই হবে, কি বলছো তুমি? কার কাছে শুনেছ এ সব কথা?

না, কর্ত্তামা। মেজবাবু ঘর জামাই হতে যাবেন কেন? তবে শ্বশুরবাড়ির অতো সম্পত্তি মেজো বৌদিই তো সবকিছুর মালিক। ঠিকমতো দেখাশোনা না করতে পারলে আস্তে আস্তে সব বেহাত হয়ে যাবে। বলুন যাবে কিনা?

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে দেখে নিয়ে নরু হতভম্ব কণকলতার চোখের ওপর থেকে নামিয়ে বলল, মেজবাবুর অবশ্য এ বাড়ি ছেড়ে যাবার একদম ইচ্ছে নেই। কিন্তু —

কণকলতা হাত দিয়ে মিষ্টির বাক্সোটা ঠেলে দিয়ে বললেন, এখুনি গিয়ে

ও বাড়িতে একবার খবর দিয়ে এসো, পূর্ণ যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে এসে দেখা করে।

আচ্ছা কর্ত্তামা, নরু পা বাড়িয়ে আবার দাঁড়াল, সবাই বলছে যুদ্ধ লাগবে। মন্বন্তর হবে। আরও সব অনেক কিছু হবে। এই সময় আরো দুশো বস্তা চাল ঘরে তুলে রাখলে হয় না?

কণকলতা বললেন, ভাঁটার দুটো ঝকুয়ার কাল থেকে ভেদবমি হচ্ছিল তারা কেমন আছে?

নরু জবাব দেবার আগে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল।

বলল, একজনা কালই মারা গিয়েছে। আর একটা বোধহয় আজই যাবে।

কণকলতা বিরক্ত হয়ে বললেন, ধীরু ডাক্তার দেখায়নি ওদের, ওষুধ পত্তর দেয়নি?

বড়বাবু তো কাল থেকে ভাঁটাতেই যাননি।

লোকটা বিনা চিকিৎসায় মরবে? কণকলতাকে রীতিমত বিচলিত দেখালো।

নরু বলল, কাল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল, ভর্ত্তি করেনি। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছেন, পরমায়ু থাকলে ওমনিই বেঁচে যাবে। এক কাজ করোগে, খানিকটা চুনের জল খাইয়ে দাও।

কথা বলতে বলতে কণকলতার মুখের ওপর চোখ পড়তেই নরু থামলো। ততক্ষণে কণকলতা উঠে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন, নিচে ভুজঙ্গ না মাখনা কে আছে দ্যাখোতো। ওদের বলো আমি এক্ষুনি ভাঁটায় যাবো। অলোক কোথায়?

কণকলতা নিজেই চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন, অলোক ... অলোক।

এই দক্ষ ... দক্ষ...।

দক্ষ দৌড়ে এলো, কি বলছো?

আলোককে বল আমি ভাঁটায় যাচ্ছি ও আমার সঙ্গে যাবে।

দক্ষ নিরুত্তরে চলে গেল।

নরু কি করবে বুঝতে না পেরে দৌড়ে নীচে নেমে গেল। কাছারিতে ঢুকে ধীরুকে লক্ষ্য করে বলল, বড়বাবু শিগগির একবার উপরে যান। কর্ত্তামা ভীষণ রেগে গেছে।

ধীরুর কানে নরুর কথাগুলো গেল কিনা বোঝা গেল না। দীনুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, দীননাথ বয়লার ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে যে চিঠিখানা

এসেছে তার জবাব দেওয়া হয়েছে? আজ্ঞে, দুলাল মাষ্টারমশাই একটা ইংরিজি মুসাবিদা করে দিয়েছেন। ওটা লিখে কালই পাঠিয়ে দেব।

(২১)

পাপান... এই পাপান...

মেজ বৌ ও ঘর এ ঘর সব ঘর খুঁজে নীচে নেমে এলো। ছেলেটা সকালে থেকে কোথায় যে গেল। স্কুলে যাবার সময় হয়ে গিয়েছে অথচ তার দেখা নেই।

এ্যাই বাসন্তী। পাপানকে দেখেছিস্। বাসন্তী সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তাকে আটকালো মেজ বৌ, একটু খুঁজে দ্যাখনা ভাই। বাসন্তীকে সব বৌরাই তুই তুকারি করে। অলকানন্দা বলে, আমার যদি প্রথম মেয়ে হতো তাহলে ঠিক তোর বয়সী হতো বাসন্তী।

মেজ বৌ যখন বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে এসেছে তখন ছোট দেওর সন্দীপের বয়স এক বছর। বড় বৌয়ের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করে আঁতুড়ে ঢুকেছেন কণকলতা। অলকনন্দা আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে আর তিনি ঢুকেছেন। স্বর্ণলতা ছোট বোনকে দেখতে এসে বলেছিলেন, এবার থাম কণক। বৌরা কি ভাবছে বলতো।

সত্যিই সেবার শেষ আঁতুড়ে ঢুকেছিলেন কণকলতা। সাত ছেলে আর তিন মেয়ে। এ কজনা বেঁচেবত্তে থাকলেই তাঁর সংসার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকবে।

এতবড় দু-মহলা বাড়ি। এত ঘরদোর, বারান্দায় গলার চিৎকার চেঁচামেচি ছাড়া মানায় নাকি?

তাছাড়া তার সংসারে লক্ষ্মীর কৃপাও কম নেই। কে ভোগ করবে এত ঐশ্বর্য? একটি আদি বৃক্ষের অনেক চারা। তার থেকে আবার অনেক চারা, এমনি করেই তো জীবনের বিস্তার ঘটে। জীবন ক্ষুদ্র গণ্ডীর বদ্ধতা কাটিয়ে অসীম অনন্ত হয়ে ওঠে।

কণকলতা উঠোনের জলচৌকিতে বসে বসে ভাবেন, আমার থেমে যাওয়া মানে জীবনের থেমে যাওয়া। প্রাণের থেমে যাওয়া। চলার থেমে যাওয়া।

দীননাথ —

'মা কিছু বলছেন?'

হ্যাঁ দীননাথ, আমাকে আজই একখানা বাধানো খাতা এনে দিও তো।

আচ্ছা মা।

খাতা দিয়ে কি হবে কাউকে বলেননি কণকলতা। সেদিন গভীর রাতে সামনে হ্যারিকেন টেনে নিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর পদ্য লিখতে বসেছিলেন তিনি।

*   *   *

বাসন্তী সারা বাড়ি খুঁজে এসে বলল, না বৌদি, পাপান নীচে কোথাও নেই সেই মুহূর্তে অরুন্ধুতি ওপরের বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, তোর ছেলে রাস্তায়, বহুরূপী এসেছে, দেখছে।

অনেকদিন পরে এলো মদন বহুরূপী। আজ মা কালী সেজে এসেছে। চারটে হাত, গলায় নরমুণ্ডের মালা, এতখানি রক্তমাখা জিব।

একটু পরে এ বাড়ির ভেতরে আসবে মদন। বৌ মেয়েদের তার সাজ দেখাবে। তারপর উঠোনে গামছা বিছিয়ে তাতে চাল ডাল তরকারির সিধে নেবে। গিন্নীমা কেমন আছেন খোঁজ নেবে। এরপর নতুন অথবা সদ্য জন্ম হওয়া শিশুর মাথায় হাত রেখে মন্ত্র পড়ে দেবে যাতে সেই শিশুটি নির্বিঘ্নে মহীরুহ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

মদন বহুরূপীর হাতের আশীর্বাদে বিশ্বাস করে এ বাড়ির বৌরা। মদন আসা মানেই সব কাজকর্ম ঘন্টা খানিকের জন্যে বন্ধ। দলবেঁধে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বৌ-ঝিরাও ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে তার চারপাশে।

নদীর ওপারে কোন এক গাঁয়ে যেন থাকে মদন। সারা বছর পরের জমিতে মুনিষ খাটে। আর কাজ না থাকলে বহুরূপী সেজে বেরিয়ে পরে। তাতে দু-পয়সা মন্দ হয়না। অরুন্ধুতি আঁশ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, দক্ষদি, মদন বহুরূপী সিধে নিতে এলে আমাকে ডাকিস তো।

সেজ বৌ বলল, কেন মেজদি, আপনি মদনকে হাত দেখাবেন নাকি!

হ্যাঁ, তাহলে তোর ভাসুর আর আমায় বাড়িতে থাকতে দেবে না।

ও কিন্তু সত্যি হাত দেখে সব কিছু বলে দিতে পারে।

তুই কি করে জানলি?

সেজ বৌ বলল, আমার বাবার হাত দেখে যা যা বলেছিল সব মিলে গিয়েছে।

কি কি বলেছিল?

সেজ বৌ হাসলো, আমার বিয়ের কথা বলেছিল।

কি বলেছিল বল্।

বলেছিল চেনা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। আপনাদের দেওর তো আমাদের বাড়িতে যেতো।

আর কি বলেছে মদন?

আবার বাবা বেশীদিন বাঁচবে না বলেছিল। সেজ বৌয়ের গলা ধরে এলো। কথা শেষ করলো না সে।

অরুন্ধুতি অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে সেজ বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কবে মরবো মদন বলতে পারবে?

সেজ বৌ তার কথা শুনে চমকে উঠে দেখল অরুন্ধুতির দু-চোখের মণিতে একটা বেদনা নিঃশব্দ কান্নার মতন টলটল করছে। তাদের কথার মধ্যেই একদল বাচ্চার ভিড় সঙ্গে নিয়ে মদন ভেতরে এসে ডাকলো, কইগো কর্ত্তামা ঠাকরুণ, মদন বহুরূপী আসিচেন।

ছেলেদের দলের মধ্যে পাপান। সেজ বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে খপ্ করে তার একখানা হাত চেপে ধরলো, অসভ্য ছেলে ইস্কুল যেতে হবে খেয়াল নেই।

বকেন না, বকেন না বৌমা, বাচ্চাদের বকলে বহুরূপীর প্রাণে লাগে। যাও খোকাবাবু ঘরে যাও, পরের বার রামভক্ত হনুমান সেজে এসে তোমায় দেখিয়ে যাব্যো।

পাপান তার মা'র হাতের মধ্যে ছটফট করছিল। সেইভাবেই মদনকে জিগ্যেস করলো, তুমি রাক্ষস সাজতে পারো?

হ্যাঁ পারি।

অরুন্ধুতি দালান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বললেন, তুমি একটু বসো মদন, আমি সিধে আনছি। মদন বসে থাকলো। সেজ বৌ পাপানের হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে চলে গেল।

জয়ন্তী ঠাকুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কণকলতাকে বলল, মা, মদন মহুরূপী তোমায় প্রণাম করবে বলে বসে আছে।

*　　　　*　　　　*

এক কাঁসি সেদ্ধ চাল তার সঙ্গে আলু বেগুন, কলা, কাঁচালঙ্কা, একবাটি সরষের তেল আর এক ঠোঙা ভর্তি করে নুন মদনের গামছার সিধে ঢেলে দিয়ে অরুন্ধুতি ফিস ফিস করে বলল, চালের মধ্যে একটা টাকা আছে নিও আর একদিন দুপুর বেলা এসো। দক্ষকে বললে আমায় ডেকে দেবে।

হাত দেখাবেন বুঝি মা ঠাকরুণ?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে আমি যেদিন আসবো আপনাদের ঝিকে আগে থাকতে খবর দিয়ে দেব। বাবুরা বাড়ি থাকলে চেঁচামেচি করবেন, একটু সাবধানে আসতে হবে।

আজ কেন যেন ঠাকুর ঘর থেকে বেরতে খুব দেরী করছেন কণকলতা। গঙ্গাস্নান করে এসে সেই সকালে ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন। মদন বসে থেকে থেকে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আবার আসছে মাসে য্যাখন আসবো তখন কর্ত্তামাকে গড় করে যাবো।

মদন এদিক-ওদিক তাকিয়ে অরুন্ধুতিকে খুঁজলো কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। শুধু হাত নয় কপাল দেখেও মানুষের ভূত ভবিষ্যত সে বলতে পারে। এই বিদ্যেটি মদন এক দরগার ফকিরের কাছে শিখেছিল। ফকির বেঁচে আছে কিনা কে জানে তবে মদন এই বিদ্যেটি প্রয়োগ করার আগে মনে মনে তাকে গুরু মেনে স্মরণ করে।

মানুষের মুখের দিকে তাকালেই চলন্ত ছবির মতন সব দেখতে পায় সে। তার সবটুকুই সে বুঝতে পারে না। যেটুকু বলতে পারে তাই বলে। তার বলা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। আর তার কথা ফলে যায় বলেই মদনের কাছে ভাগ্য গণনা করতে সবাই ভয় পায়। আজও অরুন্ধুতির মুখ দেখেই সব বলে দিতে পারতো মদন। অরুন্ধুতির মনের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ঝড়টা প্রলয় হয়ে ওটার অপেক্ষায় মৃত্যুর মতন স্তব্ধ হয়ে আছে তার আদি অন্ত এখনই বলে দিতে পারে মদন। কিন্তু বললে, এই বাড়ি থেকে প্রাণ নিয়ে বেরনো কঠিন হবে তার। বড় ঘরের সবকথা জানলেও বলতে নেই একথা মদন জানে। তার গুরু সেই ফকির তারমতো সাবধানী ছিল না। সব বলে দিত অকপটে। মানুষ ভয়ে কাঁটা হয়ে শুনতো সেই ভবিষ্যতবাণী তারপর কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরতো।

মদন বুঝেছে। মানুষ আসলে ভালোটাই শুনতে চায়। ভালোটাই পেতে চায়।

রাতে বিছানার চাদর পাল্টাতে গিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো সেজ বৌ। বিছানার তোষকের নীচে অনেকগুলো একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল আর একজোড়া সোনার কঙ্কন।

এতো টাকা এখানে কোথা থেকে এলো, কে রাখলো?

বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠলো তার। কিছু ভাবার আগেই তাড়াতাড়ি

দরজাটা ভেজিয়ে দিল। একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়ে আসার পর সেজ বৌয়ের মনে হলো, টাকাগুলো নিশ্চয়ই অলোক সেখানে রেখেছে। কিন্তু এত টাকা একসঙ্গে সেই বা পেল কোথায়? আর টাকার সঙ্গে সোনার কঙ্কনটা এখানে কেন?

আজ সকাল থেকেই সব কিছু উল্টোপাল্টা ঘটছে। উঠোন দিয়ে যেতে যেতে মদন বহুরূপীর সঙ্গে অরুন্ধুতির কথাগুলো শুনে ফেলেছে সে। মেজদি মদনকে গোপনে হাত দেখাতে চায়। কেন? কেন? কণকলতা কাল রাত থেকেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন। ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে রোজ এক গ্লাস সরবত খান আজ তাও খেলেন না। নীচের রোয়াকে জলচৌকিতে বসে বৌদের ডেকে নানা রকম ফরমাশ করেন, বড়ির ঝাল নামানোর আগে একটু কাঁচা তেল দিও বড় বৌমা তাহলে স্বাদ হবে। অথবা পেয়ারীকে ডেকে একবারও জানতে চাইলেন না কালীদাসীকে চান করানো হয়েছে কিনা অথবা গোয়ালে কাল রাতে ধোঁয়া দেওয়া হয়েছিল কিনা।

ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েই কণকলতা সোজা ওপরে উঠে গিয়েছেন, যাবার আগে বড় বৌকে বলে গিয়েছেন ধীরু ফিরলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। একই বাড়িতে একই ছাদের তলায় থেকেও আজ পনেরো দিন ধীরুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

ভোটের দিন পূর্ণেন্দু নিজে এসে কণকলতাকে ভোট দেবার জন্যে নিয়ে গেল। এমনিতেই এই সব হৈ চৈ তাঁর ভাল লাগে না তার ওপর নিজের ভাইপো এবার ভোটে দাঁড়িয়েছে তার জন্য কণকলতার মনটা ভয়ে ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে আছে। ঘন্টাখানিক পর ভোট দিয়ে ফিরে এসে তাঁর বেশ মজাই লাগছিল। একটা কাগজে পছন্দমতো নামের পাশে ট্যাঁড়া কেটে দিতে হবে তাঁকে বার বার পূর্ণেন্দু বলে দিয়েছিল। ভোট দেবার পর পূর্ণেন্দুই তাঁকে আবার সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

রাস্তায় আসতে আসতে পূর্ণ বলল, আমিই জিতবো পিসি। এখন থেকে তোমাদের শহরটা আমিই শাসন করবো। তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে যে কাঁচা নর্দ্দমাটা গেছে ওটা আর থাকবে না। রাস্তাঘাট সব পাকা করে দেব। আর পরের বারেও যদি জিততে পারি তাহলে সমস্ত শহরে কলের জল করে দেব। তখন আর ইদাঁরা আর কুয়োর জল খেতে হবে না তোমাদের।

তুই এত সব করবি?

করবো বলেই তো ভোটে দাঁড়িয়েছি।

হ্যাঁরে পূর্ণ, এসব করতে গিয়ে তোর ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া হবে না তো?

এই কথা শোনার পর একটু চিন্তিত দেখিয়েছিল পূর্ণেন্দুকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সে বলেছিল, পিসি তুমি যখন কথাটা জানতে চাচ্ছ তখন বলি, আগে ভেবেছিলাম ওদের সঙ্গে ঝগড়ার কথাই ওঠে না এখন মনে হচ্ছে ভালো কিছু করতে চাইলে ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া না করে করা যাবে না। আসলে ওরা নিজের ভালো ছাড়া অন্য কারুর ভালো চায় না। তুই কি কাউকে না জানিয়ে বন্দেমাতরমের দলে নাম লিখিয়েছিস?

না পিসি, বন্দেমাতরমের দল আমায় তাদের সঙ্গে নেবে না।

কেন রে, তুই তো সকলের ভালোই করতে চাস্?

হ্যাঁ চাই, কিন্তু ওদের ভালোর সঙ্গে আমার চাওয়া ভালোর অনেক তফাৎ আছে। এসব তুমি বুঝবে না পিসি। তাছাড়া আমার এখন তাড়াতাড়ি আছে, আমি চলি।

তাকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছে পূর্ণেন্দু। তারপর থেকে অনেকক্ষণ অবধি কণকলতার মনের মধ্যে পূর্ণেন্দুই আসছে ঘুরে ফিরে।

পূর্ণেন্দুর বুদ্ধি অন্য কারুর মতো নয়। তার বিচার বিবেচনাও অন্যরকম। সব কিছু নিয়েই সে গভীর ভাবে চিন্তা করে তবে মতামত দেয়। নিজের সমস্যার কথা বলে পূর্ণেন্দুর কাছে কি সমাধান চাইবেন কণকলতা? নিজের ভাইপো হলেও সংসারের সব গোপন কথা তাকে বলা যায় কি?

কণকলতা বুঝতে পারছেন তার সংসারের কোথাও ঘুণ ধরেছে। সকলের চোখে না পড়লেও তিনি স্পষ্ট দেখতে পা্চ্ছেন ঘুণপোকাগুলি কি অস্বাভাবিক দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়ছে।

ধীরু তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজের বৌয়ের নামে নিলেমে জমিদারী কিনেছে। স্নেহাংশু বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে যাবার কথা ভাবছে। অলোক এরমধ্যে হুটহাট করে তিন চারবার কলকাতায় গেল। কেন সে ঘনঘন কলকাতায় যাচ্ছে সে কথা জানতে চাইলে এড়িয়ে যায়। তিনি কানাঘুঁসো শুনেছেন কলকাতায় এক ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে অলোকের ভাবসাব হয়েছে। সেই অলোকের কানে নতুন ব্যবসার বুদ্ধি ঢালছে।

দিনকয়েক আগে ন-বৌয়ের সঙ্গে নিখিলের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে। দরজা বন্ধ করে দুজনা ঝগড়া করলেও যে দু-একটা কথা ভেতর থেকে বাইরে ছিটকে এসেছে তার উত্তাপ গলা সিসের চেয়েও বেশী।

কণকলতা নিজেই নাকি এ সংসারে আগুন লাগানোর মূলে। বড়ছেলেকে টাকা দিয়েছেন বৌয়ের নামে জমিদারী কেনার জন্যে। কেন, আর অন্য ছেলেরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? কেন, তারাও কি এ সংসারের জন্যে দিবারাত্রির পরিশ্রম করে না? চালকল, ইটভাঁটা সুরকির মিল সব কি একলা বড়ছেলে চালায়?

মা, আমায় ডেকেছেন? ধীরু দরজার বাইরে পায়ের চটি খুলে রেখে ভেতরে এলো। কণকলতার মুখোমুখি চৌকির একটা কোণায় বসলো।

কদিন ধরেই মনের মধ্যে একটা ভয় আর যন্ত্রণা কণকলতাকে একসঙ্গে কুড়ে খাচ্ছে। তার সঙ্গে অভিমান। এই ছেলেটির ওপরেই তিনি সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছিলেন। জীবনের প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ তাও তিনি ওকে দিয়েই পেয়েছেন।

কিছু বলবেন, মা?

হ্যাঁ। কদিন তুমি এদিকে আসোনি।

ব্যস্ত ছিলাম। পর পর দুদিন সদরে যেতে হলো। আবার কাল পরশু একবার কলকাতা যাবো ভাবছি। জয়ন্তীর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। ছেলেটির বাবার ওষুধ তৈরীর কারবার। পয়সা কড়ি আছে।

এতদিন ধরে ধীরুর ওপর কণকলতার মনে যতো অসন্তোষ জমা হয়েছিল তা সব এক মুহূর্তের মধ্যে গলতে শুরু করেছে।

কার কাছে ছেলেটির খবর পেলে?

আমাদের এক খদ্দের। তারই জানাশোনা।

তারা অতো পয়সাওলো বলছো। তোমার বোনকে তারা পছন্দ করবে?

কেন করবে না?

কণকলতার মনের সন্দেহটার কারণ ধীরুরও অজানা নেই। জয়ন্তী কালো। সে এবাড়ির অন্য দুজন মেয়ের মতন হয়নি। ক্লাস সিক্সে উঠে নিজেই আর পড়তে চায়নি। এখন বৌদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। বয়স্কা মেয়েদের মতন গুছিয়ে কথা বলতে পারে। কোন ব্যাপারে নিজের পছন্দ মতো না হলে ঝগড়া করে।

ধীরুকে যা বলবেন বলে কণকলতা ডেকে পাঠিয়েছিলেন তার একটা শব্দও তাঁর মুখ থেকে বেরলো না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, জয়ন্তীর বিয়ের কথা বলতে যাবার সময় নিখিলকে সঙ্গে নিয়ে যেও। আর বেশী করে মাছ মিষ্টি নিও।

ধীরু বললেন, আমি দীননাথকে সঙ্গে যাবার জন্যে বলেছি।

দীননাথকে কেন?

ওদের কি আছে না আছে দীনু ভালো বুঝতে পারবে।

কথায় কথায় ব্যবসাটা কেমন চলে দীনু তা বার করে নেবার চেষ্টা করবে।

ধীরু চলে যাবার পর কণকলতা উঠে ঘরের কোণে গেলেন। আঁচল থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুকটা খুললেন। কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে থাকলেন সিন্দুকের গর্ভে থরে থরে সাজানো ঐশ্বর্যের দিকে। পাঁচ বৌয়ের সোনার গহনা ছাড়াও এক ঘটি মোহর, রূপোর বাসন পত্রের ডাঁই, তাছাড়া কোম্পানীর কাগজ, দলিল দস্তাবেজ।

কণকলতা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না সিন্দুকটা কেন তিনি খুলেছিলেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল এতখানি বেলা হয়ে গেল এখনো ময়না দুটোকে ছাতু মেখে দেওয়া হয়নি। এই কাজটি রোজ তিনি নিজের হাতে করেন।

সিন্দুকের ডালা নামিয়ে চাবি বন্ধ করলেন তিনি। তারপর ভারী তালাটা গা তালার ওপর লাগিয়ে তার চাবি গুঁজতে থাকবেন চাবির গে'ছায়।

চারধারে এখন সবাই বলাবলি করছে যুদ্ধ আসবে। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আকাল আসবে দেশে। যুদ্ধ আকাল কিছুতেই ঘাবড়ান না কণকলতা।

কাল নরু এসে খবর দিয়েছে ভাঁটার ইটের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। একমাসের মধ্যে ইটের হাজার আট টাকা থেকে বেড়ে কুড়ি টাকা হয়েছে। আরো নাকি বাড়বে। ঘরে এখন লক্ষ্মী আসছেন। দুর্বার বন্যার ঢেউ-এর মতন তাঁর আগমন জানার জন্যে কান পাততে হয়না। কণকলতার মনের মধ্যে একটা দূরপনেয় লজ্জায় দাগ এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে... এই সংসারের নিত্য দিনের খরচের জন্যে একসময় প্রতিদিন তাঁর বাপের বাড়িতে গিয়ে হাত পাততে হতো। বাবা তখনো বেঁচে ছিলেন বলে স্পষ্ট করে কেউ উপহাস করতে পারতো না কিন্তু ভায়ের বৌদের চোখের চাহনীতে, ঠোঁটের কোলে কণকলতা অবজ্ঞা আর ঘেন্নার ছায়া খুঁজে পেতেন।

আজকের এই সিন্দুক ভর্তি ঐশ্বর্য, সাতছেলের গোটা শহরটাতে দাপিয়ে বেড়ানো কণকলতার মনে অহংকারের সঞ্চার করে কিন্তু সেই গোপন লজ্জাটাকে কিছুতেই মুছে দিতে পারে না। ময়নার খাঁচার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন কণকলতা। মেঝের ওপর আদুল গায়ে মুখ গুঁজে আছে পাপান। তার

কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখলেন কণকলতা, কি হয়েছে এখানে এভাবে শুয়ে আছো কেন তুমি? ওঠো, ওঠো, দেখি... পাপান এতক্ষণ চুপকরেই ছিল। তাঁর হাতের স্পর্শে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

(২২)

এক বালিসে মাথা দিয়ে মেজ বৌয়ের গায়ে গা দিয়ে শুয়েছে জয়ন্তী। আজ কণকলতার ঘরে দুপুরে বিন্তির আসর বসেনি। মেজর শরীর খারাপ। খবর পাঠিয়েছে আজ আসতে পারবে না। কণকলতা কোনদিন দুপুরে ঘুমোন না। চোখে চশমা এঁটে দাশু রায়ের পাঁচালী খুলে বসেছেন। লক্ষ্মণ ঠাকুর সাতদিনের ছুটি নিয়ে কাল দেশে গিয়েছে। ন-বৌ আজ একা হাতে আঁশ রান্নার ঝামেলা সামলেছে। একটু আগে কাজ কর্ম সেরে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে সে।

স্নেহাংশু বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলেন, অরুন্ধুতি, অরুন্ধুতি শিগগির দরজা খোলো।

স্নেহাংশু তিনদিন বাড়ি ছিলো না। কোথায় যেন গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন চলে যায় সে। যখন ফেরে হাতে একটা মোটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ফেরে।

বয়সের আন্দাজে স্নেহাংশুকে একটু ভারী দেখায়। পেটে মেদ জমেছে। মাথার সামনের দিকের চুল হাল্কা হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে চোখে মোটা সেল ফ্রেমের চশমা — সব মিলিয়ে তাকে বেশ গম্ভীর আর রাশভারী প্রকৃতির বলে মনে হয়। কিন্তু স্নেহাংশু আদৌ রাশভারী নয়। বাড়ীর বৌ ঝি ছেলেমেয়েদের সকলের কাছেই সে স্নেহপ্রবণ মানুষ হিসেবে প্রিয়। তার একটাই বদ গুণ। রাগ হলে মুখ থেকে অকথা-কুকথা বেরতে থাকে। তখন আর ছেলেমেয়ে বৌ-ঝি কারুর কথাই খেয়াল থাকে না।

কণকলতা শুনেছেন কদিন আগে এক বন্ধুকে সঙ্গে করে বাড়িতে এনেছিল স্নেহাংশু। এ বাড়িতে বাইরের মানুষের প্রবেশের সীমা একতলার উঠোন অবধি। একথা জানার পরেও স্নেহাংশু তার বন্ধুকে নিজের ঘরের ভেতরে এনেছিল। সে ঘরে তখন মেজ বৌও ছিল।

দক্ষ কণকলতার ঘরে এসে রণমূর্তি ধরে বলেছিল, বলি তোমার কি ভীমরতি হয়েছে নাকি? এখানে বসে বসে হাঁ করে কড়িকাঠ গুনছো ওদিকে যে বাড়ির লজ্জা সমভম্ সব চুলোয় যেতে বসেছে।

কি হয়েছে বলবি তো — কণকলতা উঠে বসেছিলেন।

আমি আর বলে দোষের ভাগী হতে যাই, দক্ষ খর খর করে উঠেছিল, এ সংসারের সবাই যদি অন্ধ হয়।

চেঁচিয়ে বড়বৌকে ডেকেছিলেন কণকলতা, বড় বৌমা ও বড় বৌমা — ডাঁকছেন আমায়?

হ্যাগো বাছা, কি হয়েছে বলোতো, এ হারামজাদী এখানে এসে মরা কান্না জুড়ে দিয়েছে?

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি, বড়বৌ দক্ষকে বলেছিল,

দক্ষদি, আমার সঙ্গে এসো —।

ঘরের বাইরে এসে অলকানন্দা চাপা গলায় বলেছিল, এই ভরদুপুরে আগুন লাগাতে এসেছ, মেজ বৌয়ের ঘরে যে এসেছে সে ওর সম্পর্কে ভাই হয়।

ভাই হয়, দক্ষ চোখ কুঁচকে হেসেছিল। ভাই হলে এই ভরদুপুরে পা টিপে টিপে চোরের মতো ঘরে ঢুকলো কেন। ও মিনসেকে আমি আগেও আসতে দেখেছি —

দেখেছিস বেশ করেছিস, যা এখন নিজের ঘরে যা।

দক্ষ দমদমিয়ে পা ফেলে যেতে যেতে বলেছিল, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর... ছিঃ ছিঃ — বড্ড তাড়াতাড়ি সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে। ধন্দলাগা মানুষের মত যে যা বলে যাচ্ছে সব শুনছেন কণকলতা। একটা কথারও প্রতিবাদ করতে পারছেন না। প্রতিবাদ করার সাহসই যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

কদিন আগে স্বর্ণলতা এসেছিলেন এ বাড়িতে। তিনি বলেছিলেন, হ্যারে কণক, ধীরুর নাকি আজকাল রেসের নেশা হয়েছে। রেস খেলার জন্যে কলকাতায় যায় শুনলাম।

অতো টাকা কোথায় পায়, তুই দিস নাকি?

পাগল হয়েছ দিদি, টাকা দিয়ে ছেলেকে রেস খেলতে পাঠাবো? তুমি জানো না, ওদের বাবা মারা যাবার পর কতো কষ্ট করে আমি ভাঙা সংসারে জোড়া লাগিয়েছি। দশটা নাবালক ছেলেমেয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন। তারপর কে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে? কে এসে বলেছে, আহা সংসারের জন্যে বুক পেতে তুমি এতো করছো, তোমার বুকখানা যে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। স্বর্ণলতা ছোটবোনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে নিয়ে বলেছিলেন, তুই বলেই পারলি কণক, আমি হলে সব কিছু ভেসে যেত।

(২৩)

বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে পাপান অবাক হয়ে গেল। বাড়ির সবাই, বড়মা, মেজমা, বাসন্তী, দাদি, মেজপিসি, ন-কাকা, নতুন কাকা আরো সবাই একতলায় উঠোনের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

উঠোনের ঠিক মাঝখানে দুজন লোক বাঁশের কঞ্চি হাতে নিয়ে মন্ত্র বলার মতন বিড়বিড় করে বলছে — "বাবুর সুটকেশে চল্লিশটা টাকা ছিল, টাকাটা যে চুরি করেছে তাকে কাইচির বেড় দিয়ে ধরো নল"।

লোক দুটোকে দেখে আর তাদের গলায় সুর করে বলা ছড়াটা শুনে বেশ মজা লাগছিল পাপানের। মানুষ দুটোর পোষাকও অদ্ভুত।পাঞ্জাবীর ঝুল প্রায় পায়ের পাতা ছুঁয়েছে তাদের। গলায় পাকানো গাঢ় সবুজ রং-এর চাদর। কপালে উল্কিতে আঁকা সাপ। চোখে মোটা করে টানা সূর্মা।

এপাশ ওপাশ তাকিয়ে একজনকে খুঁজলো পাপান। হ্যাঁ এককোণে সেও দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। চোখ মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে। পাপানকে দেখার পরেও মল্লিকা পিসি হাসলো না। যেমন মরা মানুষের মত একদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল তেমনিই তাকিয়ে থাকলো।

মানুষ দুটোর হাতে বাঁশের কঞ্চি দু-খানা এখন বেঁকে ধনুকের মতন দেখাচ্ছে। সেই ধনুকটা মানুষ দুজনকে একদিক থেকে আর একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ দুটোর মুখ থেকে এখন ছড়াটা আরো দ্রুত বেরিয়ে আসছে — বাবুর সুটকেশে চল্লিশটা টাকা ছিল। যে চুরি করেছে তাকে কাইচির বের দিয়ে ধরো নল।

পাপানের এতক্ষণ ব্যাপারটা দেখে মজা লাগছিল। এবার তার ভয় ভয় করতে লাগলো। মনে হলো এ বাড়িতে এতদিন যাদের সে বড়মা, মেজমা, দাদি বলে চিনতো, এমনকি বাসন্তীর মুখখানাও কেমন যেন তার অচেনা লাগছে। সবকটা মুখে চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ। একমাত্র ব্যতিক্রম জগৎ। সে মানুষ দুটোর পেছনে আঠার মতো লেগে আছে। টাকা তারই সুটকেশ থেকে উধাও হয়েছে। সেই এই নল্ চালানো লোক দুটোকে বাড়িতে ধরে এনেছে টাকা চোরকে হাতে হাতে ধরবে বলে। পাপান তার জীবনে বাড়িতে সবাইকে এক সঙ্গে এতো ভয় পেতে দেখেনি। সেই একবার ছাড়া। যেবার মেজদি কলেরায় মারা গেল।

মেজদির কথা মনে পড়লে পাপানের বুকখানার মধ্যে এখনো হু-হু করে ওঠে। ভীষণ কান্না পায়।

বাড়ির চার বৌকে সঙ্গে নিয়ে পুরীর রথ দেখতে গিয়েছিলেন কণকলতা। ছেলেদের মধ্যে সঙ্গে গিয়েছিল অলোক। এই সংসার থেকে ঝাড়া হাত পা হয়ে বেরনো কী কঠিন তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তবু সেবার কি রকম যেন জিদ চেপেছিল কণকলতার মনে। বলেছিলেন এবার জগন্নাথ আমার মন টেনেছেন, আমি রথের সময় পুরী যাবোই।

পাপান দক্ষর পেছন দিয়ে, নতুনমার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে মল্লিকা পিসির মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কঞ্চি চালানো লোক দুটোর পা টলমল করছে। মনে হচ্ছে এক পা দু-পা করে হাঁটতেও তাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বাঁশের কঞ্চি দুটো থরথরিয়ে কেঁপে উঠেই দিক বদল করে অন্যদিকে চলতে শুরু করলো... "কাইচির বের দিয়ে চোরকে ধর নল্... জলদি জলদি ধরো বাবুর রূপিয়া যে চুরি কিয়া উসকো হাতে হাত পাকরো মেরে নল্..."

দোতলার ঘরে তীব্র স্বরে কে যেন কেঁদে উঠলো। আহা, খুব হয়েছে... খুব হয়েছে। কণকলতা ছটফটিয়ে উঠলেন এসব থামাও এবার... থামাও —

না, নল্ চলুক, জগৎ সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, চোর এখানেই আছে... এ বাড়িতেই আছে... তাকে ধরার আগে নল্ থামবে না —

পাপান বই স্লেট সিড়ির ওপর রেখে সকলের পেছন দিয়ে মল্লিকা পিসির হাত ধরলো— পিসি—

সাতদিন পুরীতে কাটিয়ে গোটা দলটা ফিরে এসেছিল।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজায় পা রেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন কণকলতা — সমস্ত বাড়ি জুড়ে এক ভয়াবহ শূণ্যতা হা হা করছে।

মা, ধীরু এগিয়ে এসেছিলেন। কথা বলতে গিয়ে গলার মধ্যে শব্দ আটকে ঘরঘর শব্দ শোনা গিয়েছিল তার গলায়।

দু-চোখ তুলে দোতলার খড়খড়ি দেওয়া জানলার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো কচি কচি মুখ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কণকলতা।

কবে হয়েছে? কণকলতা চোখ নামিয়ে নিলেন।

আপনারা যেদিন গেলেন তার তিনদিন পর।

খবর দাওনি কেন?

খবর পৌছতে পৌছতে আপনাদের ফেরার সময় হয়ে যেত।

কণকলতার চৌকো ভারী মুখখানা অবিশ্বাস আর বেদনা একসঙ্গে হয়ে কান্নার তীব্র আক্ষেপে পরিণত হবার আগেই গলা থেকে ছিটকে এলো, জগন্নাথ মেয়েটাকে খেলেন... জগন্নাথ মেয়েটাকে খেলেন। গোটা দলটা কণকলতার পেছনে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতে ধীরু চমকে মুখ তুলে দেখতে পেলেন ন-বৌমার চৈতন্যহীন দেহটা মাটির ওপর লুটিয়ে আছে।

পিসি —

মল্লিকা দু-হাত দিয়ে পাপানকে নিজের কোলের মধ্যে চেপে ধরে রাখলো।

এসব হচ্ছে কেন, পিসি...?

আমার জন্যে... মল্লিকা ফিসফিস করে বলল।

যাঃ, তুমি কি করেছ?

রাক্ষসটা আমায় গিলতে চেয়েছিল, আমি গিলতে দিইনি তাই। পাপান রাক্ষস চেনে। কিন্তু রাক্ষস কেন সবাইকে ছেড়ে মল্লিকা পিসিকে খেতে চাইছে তা বুঝতে পারলো না।

দক্ষ তার নিজের গাঁ থেকে মল্লিকাকে এ বাড়িতে এনে কাজে বহাল করেছে। মল্লিকার বিয়ে হয়েছিল। বর নেয়না। বাপের অভাবের সংসার। দক্ষ কথাটা বলতেই মল্লিকার বাবা রাজি হয়ে গিয়েছিল। শুধু বলেছিল, তুমি কাছাকাছি থাকবে বলেই সাহস করে পাঠাচ্ছি, নইলে কাচা বয়সে...

মল্লিকার হাতে পায়ে ঝড়। দেহে ঝড়ের টালমাটাল চঞ্চলতা। তার পাথরে কোঁদা শরীরটাকে ক্লান্তি স্পর্শ করতে পারে না।

কণকলতার একার ফাইফরমাস খাটবে বলে কাজে বহাল হয়েছিল সে। কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই দেখা গেল মল্লিকা নীচের দশখানা ঘরের সকলের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বাঁশের কঞ্চি ধরা মানুষ দুটো ডানদিক ঘেঁসে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁয়ে ফিরে পাপানের গায়ের একেবারে কাছে এসে এক সেকেণ্ড দাঁড়াল। পাপানের বুকের মধ্যেটা ধক্ করে উঠলো। সে মল্লিকার হাতের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে বুঝতে পারলো রাক্ষসটার কথা বোধহয় সত্যি। মল্লিকা পিসিকে এবার সেটা খাবেই.

না, পরক্ষণে বাঁশের ধনুকের মতো আকৃতির কঞ্চি দুটো ওপাশে সরে গেল। মল্লিকার হাতের পাঁচটা আঙুলের মধ্যে দিয়ে পাপানকে একটা কলকে দিয়ে মিলিয়ে গেল

পিসি, পাপান হেসে ফেলল, তোমাকে ধরে নি ওরা। বাবুর সুটকেশে চল্লিশটা টাকা ছিল...

মানুষ দুটোর হাতে ধরা কঞ্চিটার তেল মাখানো গায়ে সাপের গায়ের মসৃণতা চক্ চক্ করছে। পাপানের কেন যেন মনের মধ্যের ভয়টা আবার ফিরে এলো

জগতের দু-চোখ চারপাশে ঘুরেফিরে মল্লিকার ওপর গিয়ে স্থির হলো। একমুহূর্ত পরে সেটা সরে যাবার আগে মল্লিকার গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা পাপানকে দেখল। প্রচণ্ড রাগে কণকলতার মুখখানা রোদ্দুর ঝলসানো দুপুরের আকাশের মতো তামাটে বর্ণ দেখাচ্ছে। বাইরের সদর দরজার গলির মুখে পাড়ার মানুষজনের কৌতূহলী ভিড়। পাশেই একতলার টিনের একখানা ঘরে গোটা সংসার নিয়ে থাকে মোহন ফড়ে। বাজরে কাঁচা তরি-তরকারির দোকান তার। মোহনের মেয়ে ফুল্লরা সাহস করে ভেতরে চলে এসে একেবারে মেজ বৌয়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। ফুল্লরার পরনে একটা লম্বা ঝুল কুঁচি দেওয়া সস্তাছিটের ফ্রক। ফ্রকের নীচে তার পায়ের মোটা মোটা গোছ দুটো দেখা যাচ্ছে। পুষ্ট স্তন দুটো বুকের অনেকটা জায়গা জুড়ে পাহাড়ের শিখরের মতো সটান মাথা তুলে আছে। ফুল্লরার দু-চোখে ম্যাজিক দেখার মজা। ভিড়ের একেবারে পেছন থেকে অনেকগুলো চোখ যে শুধু তাকেই দেখছে তা বুঝতে পেরেও ভ্রুক্ষেপ করছে না ফুল্লরা।

মানুষ দুটো কঞ্চি হাতে এখন গোল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। একজনার গলার চাদর কাঁধের ওপর থেকে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কাইচির বেড় দিয়ে ধরো নল্ — বাবুর সুটকেশে চল্লিশটা টাকা ছিল... কথা বলতে বলতে একজনার মুখ থেকে সাদা গ্যাজলার মতন উঠে এলো। সাপেকাটা মানুষের মতন তার মুখখানা নীলচে দেখাচ্ছে। পা দুটো টলমল করছে...। পাপানের ভয়টা এখন খুব তেষ্টা পাওয়ার মতো হয়ে গেল...। দু-হাতের দশটা আঙুল দিয়ে সে মল্লিকার পুষ্ট নরম উরুটা খামচে ধরলো।

মল্লিকা দাঁতে দাঁত চেপে একটা উফ্ শব্দ উচ্চারণ করার আগেই অভ্রান্ত শিকারীর মতন চক্ষের পলকে বাঁশের কঞ্চিটা মল্লিকার গলার ওপর দিয়ে টপকে তাঁকে পেঁচিয়ে ধরে ফেলল।

চোর ধরেছি বাবু আপনার চোর আপনি লেন। আমাদের রূপিয়ে দিয়ে দেন —

সমস্ত ভিড়টা এখন অদৃশ্য এক জাদুর বলে বাক্‌রুদ্ধ। শুধু জগৎ লম্বা লম্বা পা ফেলে মল্লিকার একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল...। মল্লিকার দুটো চোখ ভয় পেতে পেতে এতক্ষণ কুঁকড়ে থেকে হঠাৎ ভয় কাটিয়ে তীব্র ঘেন্নায় দপদপিয়ে উঠলো। এসব কিছু ঘটার আগেই আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল। কণকলতা কেউ কিছু অনুমান করার আগেই হাতের ধাক্কায় জগৎকে সরিয়ে দিয়ে মল্লিকার গলা থেকে কঞ্চিটা তুলে নিয়ে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেঙ্গে

ফেললেন। তারপর টুকরোগুলো একপাশে ছুড়ে দিয়ে অমোঘ হুকুমের মতো গলায় বলে উঠলেন, দীননাথ, এদের এখুনি বেরিয়ে যেতে বলো... চোর ধরতে এসেছে আমার বাড়িতে... কেউ কারুরু টাকা চুরি করেনি... যতোসব ত্যাদোরের আড্ডা হয়েছে এখানে... ভাগাও সবাইকে... ভাগাও শিগগির... কথার পর কণকলতার হাঁফাতে হাঁফাতে মল্লিকার একখানা হাত ধরে টানলেন, আয় চলে আয় আমার সঙ্গে।

এ দুটো তোমার জন্যে এনেছি। এম বি সরকারের দোকান থেকে কেনা, অলোক সোনার বালা দুটো সেজ বৌয়ের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, পাঁচভড়ি সোনা আছে মজুরী আর সোনার দাম মিলিয়ে কতো পড়েছে বলতো?

জানিনে, সেজ বৌ মাথা নাড়লো।

একশো পঁচিশ। শুধু মজুরীই পঁচিশ নিয়েছে এই দ্যাখো, দ্যাখো, বালার ভেতরে ছোট করে এম. বি অক্ষর দুটো খোদাই করা আছে।

সেজবৌ লাজুক গলায় বলল, বালাতো আছে আমার। শুধু শুধু আবার বালা আনতে গেলে কেন?

এবছরই পুজোর সময় সব বৌদের নতুন গহনা কিনে দিয়েছেন কণকলতা। কলকাতা থেকে পুজোর বাজার ট্রেনে এসেছিল। এই শহরের স্টেশনে তিনদিন দাঁড়িয়েছিল ট্রেনটি। প্রতিবছরই পুজো বাজার ট্রেন কলকাতা থেকে বেরিয়ে সব স্টেশনে থামতে থামতে আরও উত্তরে চলে যায়। গার্ডের গাড়ি থেকে ইঞ্জিন অবধি পরপর কামড়ায় দোকানে সাজানো থরে থরে শাড়ি, গহনা জুতো থেকে শুরু করে প্রসাধন সামগ্রী, এমনকি ঘরের আসবাব অবধি। ওরই মধ্যে এম. বি সরকারের দোকানের পাশে ওয়াছেল মোল্লার দোকান। কে এম দাসের জুতোর, তার গায়ে পাশের কামরায় কমলালয়ের সঙ্গে হিমানী কোম্পানীর স্নো পাউডার আর তরল আলতা, ভাগ্যবতী সিঁদুর আর অনুপমা কাজল। নিজের জায়গায় বসেই মানুষ ভিড় করে কলকাতার দোকানে কেনাকাটা করে। এবারও এম. বি সরকারের দোকানের বুড়ো ম্যানেজার বাবু এসেছিলেন। কণকলতাকে দেখে দু-হাত তুলে নমস্কার করে তিনি বলেছিলেন, ভালো আছেন মা ঠাকরুণ?

হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন?

আপনাদের আশীর্বাদে ভালই আছি। তবে আর কতোদিন ভালো থাকতে পারবো জানিনে। কলকাতায় তো খুব গুজব যুদ্ধ লাগলো বলে। সত্যি সত্যি যুদ্ধ লাগলে সোনার দাম আগুন হয়ে যাবে। তখন কে সোনা কিনতে আসবে বলুন। আমাদের কোম্পানীই উঠে যাবে।

অলোক বালা দুটো সেজ বৌয়ের হাতে দিয়ে বলল, কলকাতায় এবার গিয়ে ফোর্ড কোম্পানীর দোকানে গাড়ি দেখে এসেছি। সূরজবাবু বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি হয় গাড়ি কিনে নিতে।

সেজ বৌয়ের চোখে একই সঙ্গে অবিশ্বাস আর খুশী ঝলমল করে উঠলো। সে বলল, তুমি মোটর গাড়ি কিনবে। কে চালাবে?

কেন ড্রাইভার।

তুমি ড্রাইভার রাখবে, সে তো অনেকটাকা মাইনে দিতে হবে।

সূরজবাবু বলেছেন, ড্রাইভার কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেবেন। এখানকার কেউ তো গাড়ি চালাতে জানে না। গাড়িই দ্যাখেনি তার চালাতে জানবে কেমন করে?

বালা দুটো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সেজ বৌ।

বলল, হাঙর মুখো বালা আমার সহ্য হয় না।

অলোক তার কথা শুনে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বলল, ও সব তোমার কুসংস্কার।

কুসংস্কার হবে কেন, সেজ বৌ বলল, আমার বিয়ের সময় বাবা আমাকে হাঙর মুখো বালা দিয়েছিলেন মনে নেই তোমার? তারপর বিয়ের দিন কি হয়েছিল মনে নেই?

হ্যাঁ মনে আছে অলোকের। বাসি বিয়ের দিন বিয়ে বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল।

সবাই বলেছিল বিয়েতে খুঁত হয়ে গেল। মেয়েটার ভাগ্যে সুখ হবে না। পরদিন রাত্তিরে সেজ বৌ অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিল। তার হাতের লালচুনির চোখ বসানো হাঙর মুখো বালার মুখ দুটো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের মধ্যে দিয়ে তারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে অথচ আগুন তাদের স্পর্শও করছে না।

ফুলশয্যার পর সেজ বৌ বালা দুটো সেই যে খুলে রেখেছিল আর কখনো হাতে পরেনি।

এ দুটো আর মার সিন্দুকে তুলে রেখোনা, অলোক বলল।

সব গহনা ওখান থেকে একদিন আর একজনার সিন্দুকে গিয়ে ঢুকবে।

ছিঃ মাকে অবিশ্বাস করছো তুমি?

মাকে কেন, শোননি বড়দা বড়বৌদির নামে আলাদা জমিদারী কিনেছে?

শুনেছি।

নিখিল বাজারে দোকান ঘর খুঁজছে। চুন সিমেন্টের ব্যবসা শুরু করবে। হয়তো ন-বৌমার নামেই করবে।

এ কথা কে বলল তোমায়?

নরু।

দুজনার কথাবার্তা আরও হয়তো চলতো। কিন্তু তার আগেই বাসন্তী ঘরে ঢুকে বলল, সেজদা তোমায় একজনা ডাকছেন।

কে রে?

বলল কলকাতা থেকে এসেছে। কাছারিতে বসিয়েছি; যাও শিগগির।

বাসন্তী কথাটা শেষ করেই চলে গেল।

অলোক উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার তোষকখানা উল্টে দিতেই তার নীচে অনেকগুলো টাকার বাণ্ডিল বেরিয়ে পড়লো। তার থেকে দুটো বাণ্ডিল তুলে নিয়ে সে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, আমি বেরোচ্ছি এখন, ফিরতে রাত হতে পারে।

কোথায় যাচ্ছো?

শুনলে না কলকাতা থেকে সুরজবাবুর লোক এসেছে। তাকে নিয়ে সদরে যেতে হবে। ঘুরে ঘুরে এখানকার সব ভাঁটায় আগাম দাদন দিতে হবে যাতে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইট না বেচতে পারে।

এত কাজের কথা বললেও সেজ বৌয়ের কেন যেন মনে হলো অলোক সত্যি কথা বলছে না। সদরে যাওয়ার নাম করে জুয়োর আড্ডায় গিয়ে বসবে সে।

কথাটা মনে এলেও সাহস করে মুখ ফুটে বলতে পারলো না সেজ বৌ। কাঠের আলমারির চাবি খুলে বালা দুটো ভেতরে তুলে রেখে আবার চাবি বন্ধ করে দেখল অলোক ঘরে নেই।

অলোক নীচে নেমে এসে কাছারি ঘরে পা দিয়ে দেখল একজন অপরিচিত মানুষ বসে আছে। মানুষটি তাকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, আমার নাম অমল মল্লিক।

এক সপ্তাহের মধ্যেই চোর ধরার হৈচৈটা থেমে এসেছিল। এই কটাদিন রাতে পারতপক্ষে কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেনি। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চোর ধরার ব্যাপারটা কেন যেন পাপান ভুলতে পারছিল না। তার বার বার মনে হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো। লোক দুটো আগে থাকতেই জানতো কাকে চোর বলে ধরতে হবে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিল না মল্লিক পিসিকে কে চোর বলে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। নতুন কাকা, মেজমা, দক্ষ পিসিমা না আর কেউ?

স্কুল এখন গরম বলে তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিন পেয়ারী অথবা শুকনন্দন এই দুজনের একজনা বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনতে যায়। এতগুলো বাচ্চাকে একসঙ্গে সামলে বাড়ি নিয়ে আসা কম মেহনতের কাজ নয়। তার ওপর তাকে ক্লাস ঘর খুঁজে খুঁজে ছড়িয়ে থাকা বই শ্লেট সব এক জায়গায় জড় করতে হয়। প্রায়ই দিনই দু-তিনজন বাচ্চার পায়ের জুতো সারা স্কুল খুঁজেও পাওয়া যায় না।

এক একদিন পেয়ারী রাগ সামলাতে না পেরে বাচ্চাদের কান মুলে দেয় অথবা খৈনির কৌটো দিয়ে মাথায় মারে। তারপর সারা রাস্তা গজগজ করতে করতে আসে। চলো আজ জরুরু কর্ত্তামাকে আমি বলবে, সবাইকে ধোলাই খাওয়াবে।

আজ বাচ্চাদের আনার জন্যে কেউ স্কুলে যায়নি। ছুটির পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে দৌড়তে শুরু করেছে পাপান। কারুর জন্যে অপেক্ষা করেনি সে। বিড়ির পাতার দোকানদার জেঠিয়াদের লালবাড়ির সামনে দিয়ে বড় লাইব্রেরীর পেছনের গলি পেরিয়ে রণকালীর ঠাকুরের পাটের সামনে দিয়ে পাপান যখন বাড়িতে এসে পৌঁছলো তখন সূর্য মাথার ওপর। ঝা ঝা রোদ্দুরের তাপে চারপাশটা কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে।

উঠোন পেরিয়ে লাফিয়ে তিনটে সিঁড়ি টপ্‌কে এক দৌড়ে দোতলার সিঁড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো পাপান।

আলুর ঘরের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সে, নির্ঘাত বাসন্তী এখানে বসে সকলকে লুকিয়ে খারাপ গল্পের বই পড়ছে। এ বছর ক্লাস ফাইভে উঠেছে পাপান। বাংলা গল্পের বই সেও পড়েছে। সাংঘাতিক সব ভয়ের গল্প। বন্দী জেগে আছে, আবার যখের ধন এইসব বই অনেক পড়া হয়ে গিয়েছে তার। বাসন্তীও তার মতই ডাকাতদের বই পড়ে। দস্যু মোহন। তাও কেন যে কণকলতা বাসন্তীর হাতে মোহনের বই দেখলে গালাগাল করেন তা পাপান বুঝতে পারে না।

আলুর ঘরের দরজাটা নিঃশব্দে ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়ালো পাপান। ফিসফিস করে ডাকলো — বাসন্তী, এই বাসন্তী। বাসন্তী নয়, ঘরের মধ্যে মল্লিকা পিসি। খালি মেঝের ওপর আঁচল পেতে শুয়ে আছে সে। তার বুকের কাছে বড়দা সব্যসাচী। বড়দার মুখ মল্লিকার দিকে। মল্লিকার একখানা পা বড়দার উরুর উপর চেপে আছে। একটি স্তন সব্যসাচীর ঠিক মুখের সামনে একটা উপুড় করা ঘটির মত স্থির হয়ে আছে।

কে রে, মল্লিকা পিসি মাথা তুলল। তাকে দেখল। তারপর অন্য একরকম করে হাসলো, তুই আয় আমার কাছে আয়... কি হলো আয়...

পাপান মাথা সরিয়ে নিল চট করে। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছুটে ছুটে দোতলায় উঠে এলো। সেখান থেকে আবার নীচে নামলো। তারপর আবার ওপরে উঠলো। খ্যাপা জন্তুর মতন যতক্ষণ না দমবন্ধ হয়ে তার বুক খানা ফেটে যাচ্ছে ততক্ষণ এই রকম ছুটে ছুটে ওপর নীচ করতে থাকলো পাপান। তারপর একসময় সিঁড়ির ওপর বসে হাঁফাতে হাঁফাতে ডুকরে কেঁদে উঠলো। দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকলো।

পাপান, এই পাপান, কোথায় গেল ছেলেটা...

মেজ বৌ ঘরে ঘরে খুঁজে এলো। কোথাও নেই সে।

ইস্কুল থেকে ফিরে কিছু খায়নি... কথাটা কণকলতার কানে গেলে কাউকে আস্ত রাখবেন না তিনি।

ভয়ে ভয়ে বড় বৌয়ের ঘরে এলো অরুন্ধুতি, কি হবে বড়দি... পাপানকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

পড়ার ঘরে নেই?

না।

ছাদে খুঁজে দেখেছিস?

দেখেছি। সেখানেও নেই। রাত আটটার কাছাকাছি একটা ছেলে সেই দুপুর থেকে কোথায় উধাও হয়েছে কেউ তার খবর রাখে না।

লক্ষ্মণ ঠাকুর খবরটা প্রথম দিয়েছিল। রান্নাঘরে ঢাকা দেওয়া তার জন্যে রাখা ভাত মাছ তরকারি তেমনি পড়ে আছে।

বাসন্তীর গানের মাষ্টার ফিরে গেল। বাসন্তী তাকে বলেছিল, আজ গান শিখতে পারবো না।

কেন, গলায় ব্যথা।

না। আপনি বুঝবেন না। বলছি তো আজ কিছুতেই গান শিখবো না আমি।

একখানা মীরার ভজন আজ তুলিয়ে দেব ভেবেছিলাম। মাষ্টার নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

নরু এক চক্কর সাইকেলে করে শহরটা পাক দিয়ে এসে বলল, না বৌদি, কোথাও পেলাম না। সেজ বৌয়ের মুখে কথা নেই। বুকের মধ্যেটা ভয়ে পাথরের মত হয়ে আছে। অলোকের ব্যবসার কথাটা এখন আর কারুর অজানা নেই। এ শহরের সবক'টা ভাঁটার সমস্ত ইট আগাম টাকা দিয়ে কেনা হয়ে

গিয়েছে। কলকাতা থেকে নির্দেশ এলেই এরোড্রোম যেখানে হবে সেখানে ইট পাঠানো শুরু করবে অলোক।

যুদ্ধ শব্দটা এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। ঐ শব্দটার মধ্যে একটা নেশার মত কিছু আছে যা শুনলেই মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়।

এর মধ্যে একদিন শহরের রাস্তায় বেশ বড় একটা মিছিল বেরিয়েছিল। মিছিলের আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল পূর্ণেন্দু। তার পেছনে মিছিলের মানুষেরা চিৎকার করে বলছিল, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। শান্তি চাই...

কণকলতা মিছিলটা চলে যাবার পর চিন্তান্বিত স্বরে বলেছিলেন, হ্যাঁরে ধীরু পূর্ণকে কি ওরা ধরে নিয়ে যাবে?

কারা মা?

ইংরেজরা।

ধীরু বলল, মাস্টার কাল কাছারিতে এসেছিল। বলছিল, ইংরেজরা এখন আর কাউকে ধরপাকড় করবে না। তারা নিজেরাই এখন ব্যতিব্যস্ত।

তাও তুই পূর্ণকে একবার ডেকে দিস। আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো।

আচ্ছা মা।

রাতে পাপানকে খুঁজে পাওয়া গেল।

নিরমিষ রান্নাঘরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সে। লক্ষ্মণ ঠাকুর তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই ছিটকে এক পাশে সরে গেল পাপান, আমি এখানেই থাকবো, ভাগো তুমি —।

লক্ষ্মণ ঠাকুরের কাছ খবর পেয়ে অলকানন্দা ছুটে গেল। পাপান, লক্ষ্মীসোনা, ওঠো, চলো আমার সঙ্গে চলো তুমি... তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিল বড় বৌ, কি হয়েছে তোমার আমায় বলো, আমি কাউকে বলবো না —।

পাপানের কপালে গালে চুমু খেল বড় বৌ, তোমাকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ি সুদ্ধ সবাই আমরা ভেবে মরছি... একি এখনো তো তোমার ইস্কুলের জামা প্যান্টই ছাড়া হয়নি —

মল্লিকা, এই মল্লিকা...

না, খবরদার মল্লিকাকে ডাকবে না তুমি, পাপান তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে সরে গেল।

ও তোমার মল্লিকার ওপর রাগ হয়েছে। ঠিক আছে...। মল্লিকা তাহলে জামা প্যান্ট আনবে না..., বাসন্তী, বাসন্তী, দক্ষদি —

পাপান বড় বৌয়ের পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, কেউ আমার কিচ্ছু আনবে না, আমি জামা ছাড়বো না, খাবো না কিচ্ছু করবো না।—

সব্যসাচী অলকানন্দার ছেলে। তার ঐ একটাই। এ বাড়ির অন্য ছেলেদের মতন মাথা ঝাড়া নয়। রংটা একটু ফর্সার দিকে। মাথার চুল কোঁকড়া। মুখের গড়নটাও অন্য রকম।

সন্দীপ যখন কণকলতার পেটে তখন হয়েছে সব্যসাচী। এ বাড়ির প্রথম তৃতীয় পুরুষ। কণকলতার প্রথম নাতি। সব্যসাচী নামটা তিনিই রেখেছিলেন। বাড়ি ছাড়া নাম। স্বর্ণলতা বলেছিলেন, হ্যারে কণক, তোর প্রথম নাতি, ঠাকুর দেবতার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখলিনে কেন?

সব্যসাচী নামটাও ভালো দিদি —। শরৎ চাটুজ্জ্যের বই উপন্যাসে পড়োনি।

ওমা, তুই আবার স্বদেশী উপন্যাস গল্প পড়িস নাকি?

সেইজন্যে বোধহয় তোকে তোর জামাইবাবুর এত পছন্দ।

দীপঙ্করের নামটা ইচ্ছে করেই মনে করতে চান না কণকলতা। মনে পড়লে সারাদিন মনটা হু-হু করে পুড়তে থাকে। কি মানুষ ছিলেন কি হয়ে গেলেন। পঙ্গু নয়, অশক্ত নয়, তবু দিনরাত্তির বিছানায় শুয়ে থাকেন দীপঙ্কর।

কণকলতা বলেছিলেন, মদন, বহুরূপীকে একবার বাড়িতে ডেকে আনো না দিদি। ও খুব ভালো গুণতে পারে। জামাইবাবুকে দেখে বলুক আর কোনদিন জামাইবাবু আবার আগের মত হবেন কিনা।

স্বর্ণলতা বোনের কথার উত্তরে বলেছিলেন, ওর তো কোন রোগ নেই কণক, রোগ থাকলে না হয় ডাক্তার ডাকতাম। হাত গুণে এর ওষুধ কেউ বলে দিতে পারবে না।

সত্যিই শরীরে অথবা মনে দীপঙ্করের কোনো রোগ নেই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। কণকলতা তাঁর ঘরে গেলে তার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে হাসি গল্প করেন। সকলের খোঁজ খবর নেন। কিন্তু সব ওই বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সারাদিনে একবারের জন্যেও উঠে বসেন না দীপঙ্কর।

সাহেব কালেক্টারের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে একজন খাস্ বিলিতি সাহেবকে নিজের গাড়ি চালানোর জন্যে রেখেছিলেন দীপঙ্কর। রোজ কোর্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সাহেব ড্রাইভার নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিলে তবে গাড়ি থেকে নেমে আসতেন তিনি।

একদিন অল্প বয়সী একটি কিশোরকে বিচারের জন্যে তাঁর এজলাসে আনা হলো। কিশোরটি বন্দেমাতরম্ দলের হয়ে একজন দারোগাকে খুন করেছে।

একমাস ধরে টানা বিচারের পর ছেলেটিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে বেলা থাকতেই কোর্ট ছেড়ে বাড়ি চলে এলেন দীপঙ্কর।

তারপর আর কোনদিন চাকরিতে ফিরে যাননি। বিছানা ছেড়েও ওঠেন নি।

কেন রে?

বোধহয় বেশীদিন নেই। সারা গায়ে ঝাঁক ঝাঁক পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই নিয়েই শুয়ে আছেন। মাসি সারাদিন এখন পাশে বসে বসে গা থেকে পিঁপড়ে বাছেন।

একথা শোনার পরেও কণকলতাও বাড়ি যেতে পারেননি। দিনের অষ্টপ্রহর উঠতে বসতে খেতে শুতে তাঁর বুকের মধ্যেটা শিউরে শিউরে উঠতো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে দু-চোখের অবরুদ্ধ অশ্রুকে মুক্তি দিয়ে মনে মনে বলতেন—এরচেয়ে মানুষটার মরে যাওয়াই ভালো। মরে যাওয়াই ভালো।

সবু আর ইস্কুলে যাবে না বলছে অলকানন্দা মাস ছয়েক আগে একদিন ধীরুকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিলেন।

কে ইস্কুলে যাবে না?

ধীরু ঘুম ভাঙানোয় বিরক্ত হয়েছিল।

তোমার ছেলে।

ইস্কুলে যাবে না কি করবে?

ব্যবসা করবে বলছে। ওর ইস্কুলে যেতে ভালো লাগে না।

ভালোই বলেছে তো, ধীরু পাশ-বালিশ সরিয়ে স্ত্রীকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়তো। তোমার যতো ফালতু কথা ঘুমোনোর সময়।

অলকানন্দা স্বামীর হাতের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, পড়াশোনা ছেড়ে দিলে ও কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।

আমরাও তো পড়াশোনা করিনি, আমরা বুঝি খারাপ হয়ে গিয়েছি।

হ্যারিকেনের পলতে কমানো থাকায় প্রায় অন্ধকার ঘরের দেওয়ালে অসংখ্য ছায়ার আঁকিবুঁকির দিকে অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে তাকিয়ে ছিল বড় বৌ। বোধহয় ঐ ছায়ায় আলপনার মধ্যে নিজের অবাধ্য সন্তান আর অবুঝ স্বামীর নির্ম্মম ভবিষ্যতটার পাঠোদ্ধার করতে পেরে ভয়ে দুঃখে পাথরের মত হয়ে গিয়েছিল।

কি হলো, শুলে না?

না।

মরো ওখানে বসে বসে। ধীরু পাশ ফিরেছিল। এক-দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে

নিজে থেকেই বলেছিল, কাল থেকে তোমার ছেলেকে ভাঁটায় যেতে বোলো। দীননাথকে বলে দেব কাজকর্ম শিখিয়ে দেবে।

সব্যসাচী ভাঁটায় যায়নি। পরদিন সকাল থেকে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। তিনদিন পর ফিরে এসে বলেছিল, আমি আলাদা ব্যবসা করবো, বড়মা।

আশ্বিনে সতেরোয় পড়েছে সবু। গলার স্বর থেকে মুখের চেহারা হাত পা সব কিছু আমূল বদলে এখন একটা পরিণত পুরুষের আকৃতি।

অলকানন্দাকে কোনদিন মা বলে ডাকেনি সব্যসাচী।

বড় বৌমা বলে ডাকতো। বাড়ি সুদ্ধ সবাই তাকে বোঝানোর পর এখন বড় মা বলে ডাকে।

কিছুদিন আগে একদিন দুপুরে চালকল থেকে ফিরে এসে ধীরু বড় বৌকে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিল। দক্ষ গিয়ে তাকে বলেছিল, যাও গো, তোমাকে বড়দা ডাকছে। খুব জরুরী দরকার।

কি হলো?

সাত কাজ ফেলে অলকানন্দা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসেছিল।

তোমার পুত্তুর কি করেছে শুনেছ?

কি করেছে, বড় বৌয়ের বুকের মধ্যেটা থরথরিয়ে উঠেছিল অজানা আশংকায়, বললে না কি করেছে?

ধীরু হেসেছিল, সরকার থেকে বালির চরের ডাক নিয়েছে।

বুদ্ধি আছে ব্যাটার। সত্যিই যুদ্ধ লাগলে এক টাকার বালি দশটাকায় বিক্রি হবে।

ভয়ের কথা নয়, আনন্দের কথা। অলকানন্দার বুকের ভার নেমে গিয়ে দু-চোখ চক্ চক্ করে উঠেছিল।

বলেছিল, মাকে খবরটা বলেছ?

না। তুমি বলো, ধীরু ফতুয়ার মধ্যে দিয়ে পিঠে হাত ঢুকিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে সামান্য চিন্তিত গলায় বলেছিল, বালির কারবারে টাকায় টাকা লাভ কিন্তু জায়গাটা ভালো নয়।

কেন, ভালো নয়।

কেন, ভালো নয় কেন।

চরের চারধারের চালাগুলোয় নষ্ট মেয়ে ছেলেরা থাকে। তোমার ছেলেকে একটু চোখে চোখে রেখো। আমিও নরুকে বলে দেব যাতে মাঝে মাঝে ওদিকে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়।

অলকানন্দার বুকের মধ্যে এক মিনিট আগের অপসৃত হওয়া ভয়টা আবার ফিরে এসেছিল।

রাতেও কিছু খেলনা পাপান। বাসন্তী অনেক চেষ্টা করেছিল তাকে খাওয়ানোর কিন্তু তার কথাও শোনেনি। অরুন্ধুতি হেরে গিয়ে বলেছিল, যাক ওকে আর বিরক্ত করিসনে তোরা। বরং মাথার কাছে একটা বাটি করে কটা সন্দেশ রেখে দিস, রাতে খিদে লাগলে নিজেই উঠে খেয়ে নেবে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর কণকলতার খেয়াল হলো সব ক'জন নাতি নাতনীর মধ্যে পাপান বিছানায় নেই।

সেজ বৌমা, ও সেজ বৌমা, পাপান কোথায় গেল গো।

অলকানন্দা ঘরে ঢুকে বলল, আপনার নাতি আজ আমার কাছে শোবে মা।

তুমি ওকে নিয়ে শুতে পারবে তো, রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে বড্ড হাত-পা ছোড়ে।

আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

ঠিক আছে, ভোরের দিকে গায়ে একটা কিছু চাপা দিয়ে দিও, ঠাণ্ডার ধাত ওর।

দেব মা।

শাশুড়ীর ঘর থেকে ফিরে এসে ঘুমন্ত পাপানের পাশে শুয়ে কেন যেন বড় বৌ তার কপালে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমু খেয়েছিল। মনে মনে বলেছিল — মল্লিকা হারামজাদীকে কালই এ বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে।

কদিন পর ইস্কুলে যাবার সময় রাস্তায় একটা বুড়ো মানুষকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো পাপান।

কি খোকাবাবু, তুমি কি আমায় চেনো?

বৃদ্ধর বুক অবধি নেমে আসা সাদা ধবধবে দাড়ি, ফুরফুরে পাতলা কাপড়ের সাদা আলখাল্লার মতো পায়ের পাতা অবধি ঝুল পাঞ্জাবী, টানাটানা গভীর দুটো চোখ...

পাপান ঘাড় নেড়েছিল, হ্যাঁ চিনি, আপনি তো মহিউদ্দিন সাহেব?

বাঃ, ঠিক চিনেছ তো। তুমি কোন বাড়ির ছেলে?

আপনি আমায় চিনতে পারছেন না। সেই যে সেবার আমাদের বাড়িতে আপনি আমার বড় পিসির ছেলেকে —

আর বলতে হয়নি পাপানকে।

মহিউদ্দিন তাড়াতাড়ি পাপানের হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন। বুঝেছি বুঝেছি বাপধন।

তোমার দাদিমা কেমন আছেন?

ভালো।

তুমি কোন বাবুর ছেলে?

সেজ বাবুর।

আহা, অলোক, তোমার বাবারে আমি কতো ছোট দেখেছি। আমায় দেখা হলেই বলতো, মহিউদ্দিন চাচা, চলেন আমাদের বাড়ি চলেন আজ। তা বাপু আমি তো আজকাল আর সব জায়গায় যেতে পারিনে। তেনাদের নিষেধ আছে।

কথাটা বলে একটু থামলেন মহিউদ্দিন। দাড়ির মধ্যে হাত চালাতে চালাতে কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে থেকে বললেন, তোমার বড় পিসি, মানে আমার বিটি ভালো আছে।

তার তো আর একটা মেয়ে হয়েছে শুনেছি। ছেলেও একটা থাকার কথা এর ভাগ্যে... হবে। তাও হবে...।

নসিবের লেখা কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তা তুমি তো খোকাবাবু ইস্কুলে যাচ্ছো, এখন যাও, দেরী হয়ে যাবে তোমার।

আমি একদিন আপনার বাড়িতে যাবো, পাপান সাহস করে কথাটা বলে ফেলল, আপনি কোথায় থাকেন আমি জানি।

আমার বাড়িতে যাবে তুমি... মহিউদ্দিন মাথা নাড়লেন,

না বাবা, আমার বাড়িতে ছেলেদের যেতে নেই। তাঁরা পসন্দ করেন না।

কার কথা বলছেন আপনি, কারা পছন্দ করে না?

মহিউদ্দিন হাসলেন। সে তুমি বলললেও এখন বুঝবে না। তোমার দাদিমা জানেন। যাও খোকাবাবু , তুমি যাও এখন...। পড়াশুনার সময় অন্যদিকে মন দিতে নাই —

তাও যাবার জন্যে কোনো আগ্রহ দেখাল না পাপান।

বলল, সব্বাই বলে, আপনাকে নাকি ছোটবেলায় পরীতে নিয়ে গিয়েছিল। তারপরে দুদিন পরে আবার ঘরের চালের ওপর ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

আপনি পরী দেখেছেন?

তার কথা শুনে রাস্তায় দাঁড়িয়েই শব্দ করে হেসে উঠলেন মহিউদ্দিন সাহেব। বললেন, লোকে এইসব কথা বলে বুঝি?

দাদিই আমায় বলেছেন।

কর্ত্তামা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন।

না না, দাদি মোটেই ঠাট্টা করেননি। আপনি বলুন, সত্যি আপনি পরী দেখেছেন।

ওটাতো আমার মনে নেই বাপধন, তখন তো আমি তিনদিনের শিশু।

তাহলে সত্যিই আপনাকে পরীরা নিয়ে গিয়েছিল?

তোমার দাদিজী সত্যি কথা বলেছেন। যাও বাপ, এখন স্কুলে যাও। আর শোনো, আমার বাড়িতে কখনো এসো না।

মহিউদ্দিন সাহেব চলে গেলেন। পাপান জানে এখন উনি বাজারে গিয়ে লতিফচাচার জুতোর দোকানে বসে গল্প করবেন।

ক্লাসে বসেও পড়ায় মন দিতে পারছিল না পাপান। মহিউদ্দিন সাহেব যদি পরী দেখে থাকেন তাহলে নির্ঘাত পরীরা আছে।

কোথায় থাকেন তাঁরা?

মল্লিকা পিসি বলেছিল তাকে পরী দেখাবে। মাসিদের গাঁয়ের একটা পুকুর আছে। মাঝে মাঝে পরীরা সেখানে চান করতে আসে।

তুমি দেখেছ পরীদের?

হ্যাঁ, মল্লিকা কথাটা বলার সময় এমন ভাবে হেসেছিল যার জন্যে সন্দেহ হয়েছিল পাপানের।

বলেছিল, ধ্যাৎ, তুমি মিথ্যে কথা বলছো, পরী নেই-ই।

পাপান তখন অনেক ছোট সেই সময় মহিউদ্দিন সাহেব তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সিঁড়ির পাশেই দোতলার ছোট ঘরটা আগে থেকেই ভালো করে ধুয়ে মুছে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল।

মহিউদ্দিন চাচা সেদিন এসেছিলেন একটা কালো রং-এর আলখাল্লা গায়ে দিয়ে তাঁর মাথার ঝুমুর ঝুমুর চুল এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল মাথা নাড়ার তালে তালে।

পাপান জানতো মহিউদ্দিন চাচা কেন এসেছেন।

· কদিন আগে বড় পিসি পারুলের যে ছেলেটা হয়েছে তাকে দেখে মহিউদ্দিন চাচা বলেছিলেন, কর্তামা আপনার মেয়ের ছাওয়ালকে পেত্নিতে পেয়েছে। ঝাড়ফুঁক করে পেত্নিকে তাড়াতে হবে। শনিবার সাঁঝবেলায় আসবো আমি। ত্রিনাথকেও খবর পাঠিয়েছিলেন কণকলতা। তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আমি গণনা করে দেখেছি এই নবজাতকের আয়ু মাত্র তিন মাস। মহিউদ্দিন ঝাড়ফুঁক করেও তার আয়ু বাড়াতে পারবে না।

সকাল থেকেই বাড়িতে একটা গা ছমছম করা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পারুল একা একটা ঘরে লালপাড় কোড়া শাড়ি পরে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। মাঝ মাঝে তার হিক্কার মতন হচ্ছে। হিক্কা থামলে চোখ দুটো এপাশ ওপাশ ঘুরে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে।

বাইরে থেকে পাপান উঁকি দিয়ে একবার ঘরের মধ্যে বসে থাকা পিসিকে দেখবার চেষ্টা করেছিল। পেছন থেকে দক্ষ পিসি তার হাত ধরে এক ঝটকায় পাশে টেনে নিয়ে বলেছে, যাও পালাও —

অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগেই ধীরু চালকল থেকে ফিরে এলো — মা।

কিছু বলবি?

বাজারপত্র যা বলেছিলেন, সব পাঠিয়ে দিয়েছি। আর কিছু লাগবে।

না।

মহিউদ্দিন সাহবে কখন আসবেন?

সন্ধ্যের আগে।

উনি যা বলেছেন, ধীরু একটু চুপ করে থেকে কথাটা শেষ করেছিল, ঝাড়ফুঁক করতে গিয়ে পারুলের ছেলেটা যদি —

ওটা ওর সতীনের দেহ। ও এমনিতেই থাকবে না।

ত্রিনাথও তাই বলেছে। পারুলের বিয়ে দিয়ে আমি ভুল করেছি। চিন্তায় রাত্তিরে দু-চোখের পাতা আমি এক করতে পারিনে।

ঠিক সন্ধ্যে লাগার মুখে এলেন মহিউদ্দিন। দোতলায় ওঠার আগে বললেন, মা, সদর দরজা বন্ধ থাকবে এখন।

আপনার পরিবারের ছাড়া অন্য কেউ ও ঘরে ঢুকবে না।

দোতলার এ ঘরটা বেশী বড় নয়। দরজা ছাড়া পূবদিকে ঘরে পা দিয়ে আদেশ দিলেন, বাচ্চাদের পিঠও দেয়ালের সঙ্গে লাগা থাকবে —।

তারপর পারুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

তুমি মা জননী, ঠিক মাঝখানটিতে গিয়ে বসো।

সব ভালো হয়ে যাবে... তোমার ছাওয়াল একদম ভালো হয়ে যাবে...।

পারুলের মুখে একফোটা রক্ত নেই। তাকে দেখলে মনে হচ্ছে সামান্য ঠেলা দিলেই সে মুখ থুবরে পড়বে।

মহিউদ্দিন ঘরের চারপাশে চক্কর দিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন। তিন চক্কর দেবার পরেই তাঁকে দেখে মনে হতে লাগলো, উনি বর্তমানে আর এই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই। তার দু-চোখের মনি ঠেলে ওপরে উঠেছে। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। তারমধ্যে থেকে দুর্বোধ্য ভাষায় অচেনা শব্দের ঝড় উৎক্ষিপ্ত হয়ে ঘরের চারদেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছে।

হঠাৎ তিনি পারুলের কোলে শায়িত শিশুটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ধর, হাত ধর্, হাত ধর্ আমার... শিগগির হাত ধর্

বলছি... নইলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেব... ধর হাত ধর্ হেঁট হয়ে মেঝের ওপর রাখা বাটি থেকে এক মুঠো সরষে তুলে নিয়ে শিশুটির দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। শিশুটি একটা জান্তব শব্দ করে কঁকিয়ে উঠলো —

হয়নি... এখনো তোর শিক্ষা হয়নি... দাঁড়া আজ তোরে আমি নেংটো করে চাবুক মারবো... ধর হাত ধর্ আমার... নে ধর্ ... ধর্... ধরলি হাত...।

শিশুটির কুঁকড়ে থাকা দেহটা টান টান হলো। এক পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে খপ্ করে মহিউদ্দিন সাহেবের বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা চেপে ধরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

সাবাস্ বেটা, সাবাস্... যাও চক্কর লাগাও সারা ঘরে চক্কর লাগাও।

একঘর মানুষের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে পারুলের সাতদিনের শিশুপুত্র একহাতে মহিউদ্দিনের হাত ধরে ঘরের চারপাশে ঘুরতে থাকলো।

মহিউদ্দিন সাহেব এখন আর কোন কথা বলছেন না। শুধু তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে আর সেই কাঁপা ঠোঁটের মধ্যে থেকে এমন কোনো অশ্রুত শব্দের তীর বেড়িয়ে আসছে, যা প্রেতপ্রাপ্ত শিশুটির ক্ষুদ্র দেহটিকে পরিণত মানুষের বলিষ্ঠ শরীরে রূপান্তরিত করে তাকে দিয়ে অসম্ভব সম্ভব করাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর চলা থামিয়ে দাঁড়ালেন মহিউদ্দিন। শিশুটির সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই এখন যাবি? কিরে যাবি না থাকবি...? থাকবি... বেতমিজ... প্রেত হয়ে মানুষের দেহে আসবি... বেশরম... তোর লজ্জা নেই...

মহিউদ্দিনের মুখের একটা কথাও স্পষ্ট নয়। কেন না জড়িয়ে জড়িয়ে দুর্বোধ্য একটা সুরেলা আক্ষেপের মতো কথাগুলো ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

ঘরের সবক'টি মানুষের চোখ এবং চেতনা এই মুহূর্তে পঙ্গু বোবা হয়ে আছে। কারুর নিঃশ্বাস ফেলারও ক্ষমতা নেই।

মা জননীরা, কেউ খবরদার দেয়াল থেকে পিঠ সরাবেন না... এ জিন পালানোর আগে কারুর না কারুর একটা ক্ষতি করে তবে যাবে —

মাঝখানে কথা থামিয়ে হঠাৎ মহিউদ্দিন এক খাবলা সরষে তুলে নিয়ে শিশুটির মুখের ওপর ছুড়ে মারলেন...। শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশে ক্রুদ্ধ দুটো চোখ তুলে মহিউদ্দিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

বাঃ বাঃ মেরে বাস্চো... আমার সঙ্গে আবার দিল্লাগী হচ্ছে... যাও... যাও... জলদি পালাও... উঠাও মুখ দিয়ে। এই জুতি উঠাও... জলদি উঠাও...। চিৎকার করে মহিউদ্দিন শিশুটির দিকে তেড়ে গেলেন।

পারুল এতক্ষণ পাথরের মত নিথর হয়েছিল এবার ফুঁপিয়ে উঠলো. না...। মহিউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ছেড়ে পারুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

না বেটি না, রোনা মৎ... তোমার ছেলে এখুনি ভালো হয়ে যাবে।

কথা বলে মহিউদ্দিন শিশুটির কোমর বাঁ হাতের থাবায় চেপে ধরে পরপর দু তিনবার ঝাঁকানি দিলেন... যাও ভাগো জলদি... ভাগো... ভাগো — বহোৎ আচ্ছা... পাকড়ো... মেরা জুতি উঠাও...

শিশুটি এবার মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে মহিউদ্দিন সাহেবের এক পায়ের চটি মুখে করে কামড়ে ধরলো। তারপর একইভাবে গড়িয়ে একটা চিৎকার করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। মহিউদ্দিন সাহেব এক লাফে শিশুটির কাছে গিয়ে তার অচেতন দেহটা পরম মমতায় নিজের বুকের মধ্যে তুলে নিলেন। পারুলকে লক্ষ্য করে বললেন, নাও মা। তোমার বেটাকে কোলে নাও... ওর এখন বহোৎ ভুখ পেয়েছে... ওকে দুধ খিলাও... তোমার বেটা এখন একদম ভালো হয়ে গিয়েছে একদম আচ্ছা হো গিয়া... আর কোনো ভয় নেই... যে ছিল সে চলে গেল... না বেটি এ তোমার সতীন নেহি দুসরা কোই হোগা...

কথা বলতে বলতে গায়ের আলখাল্লাটা খুলে দেখলেন মহিউদ্দিন সাহেব। তারপর সেটা ভালো করে তিন চারবার ঝেড়ে নিয়ে আবার গায়ে দিলেন।

কর্ত্তামা, আমি যাচ্ছি, সেলাম।

কণকলতার দু-চোখ এতক্ষণ পারুলের দিকে নির্নিমেষ হয়ে তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণ যা ঘটলো তা যে সত্যিই ঘটেছে বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। এ সংসারে কতোভাবে কতো কিছু শিখেছেন তিনি। আজকের এই শিক্ষা যে অগম্য পরা জগতকে নিয়ে তার সঙ্গেও মানুষ লড়াই করে জিততে পারে —। আশ্চর্য মানুষের সাহস।

মহিউদ্দিনকে তিনি এতকাল স্নেহ করতেন। এখন এই ঘটনার পর থেকে তাঁর এই অশিক্ষিত চালচুলোহীন মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করছে।

এই ছেলে... সন্ধ্যেবেলা সিঁড়ির মাঝখানে পাপানের হাত চেপে ধরলো মল্লিকা... কিরে তুই আমার ওপর রাগ করেছিস? কথা বলবিনে আমার সঙ্গে? ... কেনরে, আমি কি করেছি... কথা বলতে বলতে মল্লিকা খপ্ করে পাপানের গালে নিজের ভিজে ঠোঁট চেপে ধরে একহাতে তার দেহটাকে পেঁচিয়ে অবলীলায় নিজের শরীরের মধ্যে টেনে নিল...। কিরে বল্না, আমার ওপর রাগ হয়েছে তোর?

কেন, আমি কি করেছি... বল্ কি করেছি?

ছাড়ো, ছাড়ো আমায়, পাপান নিজের শরীটাকে মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

মল্লিকা এক মুহূর্ত তার চোখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলো, ন্যাকা...। আবার রাগ দ্যাখোনা ছেলের...।

পাপানের বুকের মধ্যে একটা কষ্টের মতো কিছু পাক খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কেঁদে ফেলবে সে। কান্নাটা যাতে মুখ থেকে বেরিয়ে না আসতে পারে তার জন্যে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো পাপান।

মল্লিকার ডান হাতখানা পাপানের সারা শরীরে দ্রুত ঘুরতে ঘুরতে তার পিঠের ওপর থমকে দাঁড়ালো।

বুঝেছি। মল্লিকা চাপা গলায় বলল, বুঝেছি কেন তোর রাগ হয়েছে...। তোর দাদাকে সেদিন আদর করেছি তাই তোর রাগ হয়েছে তাই না?...

ওতো আমার বর। বরকে আদর করবো না, তুই একটা এক নম্বরের হিংসুটে... ওর মতো বড় হলে তুইও আমার বর... হবি —

একটা পায়ের শব্দ পেয়ে মল্লিকা পাপানকে ঠেলে দিয়ে সরে গেল। যেতে যেতে চাপা গলায় বলল, কাল দুপুরে আসিস, তোকে পরী দেখাবো।

বাসন্তী সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে পাপানকে দেখে দাঁড়াল। এই, অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি করছিস রে? তাড়াতাড়ি চল... লক্ষ্মণ ঠাকুর খেতে দিয়েছে।

শুভব্রত... শুভব্রত...

পাশের বেঞ্চি থেকে একটা ছেলে পাপানের গায়ে ধাক্কা দিল,

এ্যাই, স্যার তোকে ডাকছেন...।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল পাপান, ইয়েস্ স্যার —

কি করছিলে এতক্ষণ, ঘুমোচ্ছিলে — ডাকছি সাড়া নেই... যাও, পেছনের বেঞ্চিতে গিয়ে সারা পিরিয়ড দাঁড়িয়ে থাকো। অপদার্থ — নির্বোধ... বড়লোকের বাড়ির আদুরে গোপাল... কেন যে সব স্কুলে পড়তে পাঠায়।

বিষ্ণু স্যার। অঙ্কের মাস্টার মশাই। অঙ্ক একদম ভাললাগে না তার। জীবনে স্কুলের পর কক্ষনো আমি অঙ্ক শিখবো না।

পাপান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো। ইস্কুল না, বাড়ি না — আজকাল কিচ্ছু ভাল লাগে না তার। এমন কি বাসন্তীকে আজকাল পছন্দ হয় না। মল্লিকা পিসিকে ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কিছুতেই তার আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না।

দুপুর হলেই পা দু-খানা কে যেন মল্লিকা পিসির ঘরের দিকে টানে। সারাদিন মল্লিকা তার ঘরেও থাকে না। ছাদে বারান্দায় এমনকি একদিন পাপান তাকে পেছনের আমতলার গামছা বিছিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিল।

একি তুমি এখানে শুয়ে আছো?

জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা রে। আমার কাছে আসবি। আয় না।

না, পাপান সরে এসেছিল সেখান থেকে।

(২৫)

ভর সন্ধ্যেয় নিজের ঘরের আদুল চৌকিতে কাত হয়ে শুয়েছিলেন কণকলতা। তাঁর মুখখানা দরজার দিক থেকে ফেরানো। এ বাড়ির কেউ কখনো তাঁকে এই সময় শুয়ে থাকতে দেখেনি। মেজ বৌ দু-তিনবার এসে ডেকে সাড়া না পেয়ে ফিরে গিয়েছে। বড় বৌ সকাল থেকে একবারের জন্যেও নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে আসেনি।

অনেকদিন যে ভয়টা কণকলতাকে ভেতরে ভেতরে কুড়ে খাচ্ছিল সেটাই এখন সত্যি হয়ে একটা প্রকাণ্ড হাঁ-মেলে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

মা, ধীরু নীচু গলায় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলো।

কণকলতা ডাক শুনেও পাশ ফিরলেন না। কথা বললেন না। শুধু উদগত অশ্রুকে চাপার জন্যে প্রাণপনে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন।

আমরা যাচ্ছি মা। ব্যবসার হিসেবপত্তর স্নেহাংশুকে বুঝিয়ে দিয়েছি। চালকলের ইন্সপেক্টার এলে দীনুকে বলবেন আমাকে যেন খবর দেয়, আমি আসবো।

আরও এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরু চলে এলো।

দোতলায় নিখিলের ঘরের দরজা কাল রাত থেকেই বন্ধ। ভেতরে মানুষ আছে কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

কাল রাতে স্বর্ণলতা এসেছিলেন। তিনি যাবার পর পূর্ণেন্দু এসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে ধীরুর সঙ্গে কথা হয়েছে তার। কিন্তু অতো কথার পরেও ধীরু তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে ধীরু। স্টেশন রাস্তার কাছে একটা এক তলা বাড়ি ভাড়া করেছে। মাসে আট টাকা ভাড়া। বাড়িতে ইঁদারা আছে। চারপাশে একটু জায়গা আছে। হতা-পা ছড়িয়ে থাকার অসুবিধে হবে না। নরু কদিন আগেই বাড়ি ভাড়া করার খবরটা কণকলতাকে জানিয়েছিল। কণকলতা বিশ্বাস করতে পারেননি তার কথায়, ভিন্ন হয়ে যাবে, কি বলছো নরু? বড় বৌমা রাজি হয়েছে?

বড় বৌদি সঙ্গে না গেলেও বড়বাবু যাবেন।

বড়বাবু ষষ্ঠী পালকে বলেছেন, পাটের ব্যবসা শুরু করবেন। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নরু বলল, ন-বাবু নিজেও তো বটতলার কাছে দু-খানা দোকান ঘর কিনেছেন।

তুমিও তো আমায় বলেছিলে, ধীরু তার বৌয়ের নামে পোস্টাপিসে বই খুলে টাকা জমাচ্ছে।

সিমেন্ট চুনের কারবার করবেন সেখানে।

ওরা সবাই নিজের নিজের কারবার করবে তাহলে আমার এতবড় ব্যবসা কে দেখবে, কে চালাবে। তুমি কি বলতে চাও নরু, ইট ভাঁটা, চালকল সব আমি বন্ধ করে দেব? আমার সংসারের এতগুলো মুখের দু-বেলা ভাত ডাল কোথা থেকে আসবে তাহলে?

ব্যবসা এখন নিজে নিজেই চলবে মা। কেউ না দেখাশোনা করলেও চলবে।

নরু আর কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

একটু চুপ করে থাকার পর কণকলতা বোধহয় নিজেকে শুনিয়েই বলেছিলেন, সবাই বেইমান। সবাই... এই গোটা সংসারটাই বেইমান। নরু তুমি একবার অলোককে ডেকে দাও — সেজবাবুকে এখন পাবেন না।

কোথায় সে?

আজ সকালের গাড়িতে কলকাতা গিয়েছেন।

কলকাতায় তার এত কি কাজ?

গাড়ি আনতে গিয়েছেন মেজবাবু।

গাড়ি — কিসের গাড়ি। কার গাড়ি?

সেজবাবু ফোর্ড কোম্পানীর মোটর গাড়ি কিনেছেন। ঘোড়ার গাড়িতে এখান ওখানে যাতায়াতে অনেক সময় লাগে।

কণকলতার মনের ভয়, আর অস্বস্তিটা হঠাৎ রাগে পরিণত হলো। হাতের সামনে থেকে জাতিখানা একপাশে ছুড়ে দিলেন তিনি। চিৎকার করে বলে উঠলেন। কারুর সাহায্যের দরকার নেই আমার, বুকের দুধ খাইয়ে কালসাপ পুষেছি এতকাল।

কথা বলতে বলতে হাঁফাতে থাকলেন। হাঁফানি বন্ধ হবার আগেই নিজের ভারী শরীরটাকে টেনে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আঁচল থেকে চাবি মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই নাও সিন্দুকের চাবি, বড় বৌকে দাও বলোগে, যা কিছু হয়েছে তারজন্যে যেন দয়া করে আমায় ক্ষমা করেন তিনি। আমার অপরাধ

হয়েছিল। তারা সবাই এখানে নিজের মতো করে রাজত্ব করুন, আমি কাশী চলে যাবো —

কথা বলতে বলতে কণকলতা কেঁদে ফেলেছিলেন।

পাপানের খুব মন খরাপ লাগছিল। বড়মার ঘরটা অন্ধকার হয়ে থাকে। সেদিকে তাকালে মন কেমন করে ওঠে।

একি, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

লক্ষ্মণ ঠাকুর বড় বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকাকে পুঁটলি হাতে বেরতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল —

আমি, মল্লিকা হেসে বলেছিল, বড় বৌদির সঙ্গে নতুন বাড়িতে থাকবো আমি।

তুই যাবি, কর্ত্তামাকে বলেছিস?

তুমি বলে দিও।

কতো অনায়াসে কণকলতার হৃদ্‌পিণ্ডের একটা অংশ বাদ হয়ে গেল বরাবরের জন্যে। যাবার আগে অলকানন্দা কণকলতার বুকের মধ্যে মুখ রেখে আকুল নয়নে কেঁদেছে, মা আপনার ছেলেকে আপনি আটকান, এখান থেকে গেলে আমি মরে যাবো।

মেজ বৌ, নতুন বৌ পাশাপাশি দালানে দাঁড়িয়েছিল। রূপোর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে বড় বৌয়ের সিঁথিতে পরিয়ে দিল মেজ বৌ। কোনো কথা বলতে পারলো না। নতুন বৌ বলল, আলতা পরেননি? দাঁড়ান একটু — আমি আপনাকে আলতা পরিয়ে দিচ্ছি — রাত্তিরে কিছু খেলেন না কণকলতা।

দীননাথ হিসেবের কাগজপত্র বোঝাতে এসেছিল। তাকে বলেছেন, যাও এখন।

টাকাগুলো রাখুন তাহলে।

আলমারির পাশে রেখে দাও, আমায় এখন বিরক্ত করো না দীননাথ।

যথারীতি চারপাশে নাতি নাতনীরা শুয়েছে। রাতে প্রতিদিন উঠে উঠে তাদের দেখাশোনা করেন। আজ একবারের জন্যেও উঠলেন না। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল সব হিসেবের গণ্ডগোল হয়ে গেল। বার বার নিজেকে দায়ী করছিলেন, নিখিলের বিয়েটা আমিই পছন্দ করে দিয়েছি। তার বৌটা যে এরকম হবে আমি আগেই কেন তা বুঝতে পারিনি। শিক্ষিত মেয়েকে ছেলের বৌ করে আনবো, আমার এই লোভের জন্যই আজ আমার এই দশা হলো।

পরদিন সকালে ঘরের দরজা খুলে বেরলো ন-বৌ।

সোজা নিচে নেমে এসে রান্নাঘরে ঢুকে একবাটি ভর্ত্তি করে দুধ ঢেকে নিয়ে আবার উপরে উঠে গেল।

তার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ নিজের ঘরে বসে শুনতে পেল স্নেহাংশু।

মা কাল সারাদিন কিচ্ছু খায়নি। মেজ বৌয়ের চোখে একটা দুঃখ কেঁপে গেল থির থিরিয়ে।

স্নেহাংশু পকেট হাঁতড়ে সিগারেট বার করে বলল, দেশলাইটা দাও।

তুমি কিছু বলছো না যে?

কি বলবো আমি?

নঠাকুরপোর দাদাকে অমন করে সকলের সামনে চোর বলা উচিত হয়নি।

চোর না বললেও বড়দা আলাদা হয়ে যেত।

কথাটা বলে মন দিয়ে সিগারেট খেতে থাকলো স্নেহাংশু। সিগারেট খেতে খেতে কিছু একটা ভাবছিল সে। চোখে সেই ভাবনার ছায়া পড়ে তাকে গম্ভীর আর উদাসীন দেখাতে লাগলো।

বড়দা যেতই। স্নেহাংশু আপন মনে বলতে থাকলো, আমরাও শিগগির চলে যাবো। অলোক এতবড় ব্যবসা ফেঁদেছে, সেও আজ হোক কাল হোক চলে যাবে। আর জগৎ — সিগারেটটা হাত থেকে ছুড়ে ফেলল স্নেহাংশু, জগতের নামটার উচ্চারণ করার সঙ্গে তার এতক্ষণের উদাসীনতা চিড় খেয়ে ছেঁড়া মেঘের মতো দু-চোখের মণির ওপর আনাগোনা করতে থাকলো। প্রশ্ন করলো, জগৎ কি আজকাল বাড়িতে থাকে না?

থাকে।

কই দেখতে পাইনে তো? বোধহয় পনেরোদিন দেখিনি তাকে, না না তারও বেশী...। নতুন বৌমা কি বাপের বাড়ি চলে যাবে?

অরুন্ধতি বালিসে কাচা ওয়ার পরাচ্ছিল। তার হাত দু-খানা এক মুহূর্তে থমকে থাকলো। গলার মধ্যে কম্পিত একটা সর্বনাশের আশঙ্কা কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দিল তার।

এই দু-মহলা বাড়িটার প্রতিটি ঘরদোর বারান্দা অষ্টপ্রহর জীবনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে উৎরোল হয়ে থাকে। সূর্য ওঠার অনেক আগে থেকেই নিত্যদিনের অভ্যাস মতো কণকলতার এই সংসার সহস্র মুখ সহস্র পদ এক মহামানবের মতো চলতে শুরু করে... তার চলা যখন সাময়িক থেমে দাঁড়ায় তখন আবার নতুন সূর্য ওঠার আয়োজন শুরু হয়ে যায় প্রকৃতির সংসারে...। এই দৈনন্দিন মহাযজ্ঞে যদি কেউ না থাকে...। কেউ না দাবী করে কেউ না হাসে কাঁদে,

কেউ না মান-অপমানের নির্মম প্রশ্ন তুলে নিজেই দীর্ণ হয়ে যায় — তাহলে কাকে নিয়ে থাকবেন কণকলতা?

পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে এসে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন না কণকলতা। পেয়ারীকে বললেন, মুহুরীবাবুকে ডেকে দে।

নরু আর দীননাথ দুজনা একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো, মা ডেকেছেন আমাদের।

আমি এখনি ভাঁটায় যাবো। তোমরা দুজনাই আমার সঙ্গে থাকবে। ভুজঙ্গকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলে দাও। মা, তুমি নাকি নিজে ভাঁটায় যাবে — সন্দীপ কিছুক্ষণ পর সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে ঘুড়ি লাটাই। ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙ্গেছিল। সে পায়ে এখনো জোর ফিরে আসেনি। হয় ঘুড়ি লাটাই, নয় ফুটবল। এটি তাঁর সর্বশেষ সন্তান। মনের গোপনে তারজন্যে একটা বিশেষ স্থান নিজের হৃদয়ে গোপনে সংরক্ষিত রেখেছেন কণকলতা। কিন্তু মাঝে মাঝেই কেন যেন তাঁর মনে হয় সন্দীপ তাঁর জীবনের আর একটি বিফলতা। সন্দীপের ওপর তিনি আর যা করুন কোনদিনও নির্ভর করতে পারবেন না। স্কুলে যাওয়া অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছে সে। এখন পাড়া-বেপাড়ার কতকগুলো বাজে ছেলের সঙ্গে দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। তারমধ্যে পাড়ার দর্জ্জি বাড়ির ছেলেটাও আছে। কই, বলছো নাতো, তুমি নাকি ভাঁটায় যাচ্ছো।

যাচ্ছি।

কেন, মেজদাতো যাবে।

কারুর যাবার দরকার নেই, আমি নিজেই যাবো।

তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

সন্দীপের মাত্র একটি কথাতেই কণকলতার বুকের মধ্যেটা ছপছপে হয়ে ভিজে গেল। তাঁর রক্তে আবার সাহস ফিরে আসছে। তাঁর ইচ্ছেয় আবার বেঁচে ওঠার অহংকার ফিরে আসছে।

ভুজঙ্গ কচুয়ান গাড়ি নিয়ে আসার আগেই মেজ বৌ কণকলতার ঘরের দরজায় গিয়ে বলল, মা, আপনার পুজোর সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

পুজো, কণকলতা যেন পুজো কথাটা এই প্রথম শুনলেন। সেই ভাবেই বললেন, আজ আর পুজোর ঘরে ঢুকবো না।

এমন একটা কথা কণকলতা উচ্চারণ করে বলতে পারেন যা শুনে হতবাক হয়ে গেল মেজ বৌ। বলল, ঠাকুর যে তাহলে উপোষ করে থাকবেন, মা।

পাথরের ঠাকুরের উপোষ নিয়ে এতো ভেবোনা বৌমা, আমি ভাঁটায় না গেলে আমার সংসারের এতগুলো মানুষ উপোষী হয়ে থাকবে। তুমি বারান্দায় বেরিয়ে দেখো গাড়ি এসেছে কিনা।

একতলায় নেমে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন কণকলতা, একি তুমি কখন এলে?

ত্রিনাথ এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন, বললেন, বসো দিদি, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। কণকলতা এপাশ ওপাশ তাকালেন। কাউকে চোখে পড়লো না তাঁর। ত্রিনাথকে বললেন, চলো, ওপরে আমার ঘরে গিয়ে বসি।

(২৬)

বড় রাস্তা থেকে সরু একটা গলি পথ। একপাশে পাঁচিল তোলা। পায়ে হাঁটা কাঁচা পথটা স্যাতসেতে মতন। সারাদিনে যা ছিটেফোঁটা রোদ্দুর আসে তাতে জায়গাটার ছায়াছন্নতা পুরোপুরি দূর হয় না। পর পর বাড়ির দরজা। শেষ দরজাটার সামনে এসে আন্দাজে ধাক্কা দিল পাপান। ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে একটা গলার স্বর ভেসে এলো, কে ডাকছে দ্যাখতো মল্লিকা।

বড় মা — পাপানের বুকখানা উত্তেজনায় ফেটে যাবার মতো হলো। পরমুহূর্তে দরজার পাল্লা হাট করে খুলে তাকে দেখে অবাক হওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলো মল্লিকা, ওমা, তুমি, এসো এসো —।

পাপানের হাত ধরলো মল্লিকা। তারপর মুখখানা তার মুখের কাছে নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, কাকে দেখতে এসেছিস রে, আমায়? ওমা, আমার কি ভাগ্যি।

কথার পর মল্লিকা ডান হাতখানা পাপানের ঠোঁটের ওপর রেখে বিষণ্ণ গলায় বলে উঠলো, একি, তোর যে গোঁফ উঠেছে, তুইও বড় হয়ে গেলি।

পাপানের গাটা শিরশির করছিল। বুকের মধ্যে আটকানো নিশ্বাসের দাপাদাপি। কি বলবে হঠাৎ ভুলে গেল সে। অথচ এখানে আসার আগে কতবার মনে মনে মুখস্থ করেছে, কি বলবে বড়মাকে। মল্লিকার কথাও তার মনেছিল কিন্তু কী আশ্চর্য, এখানে পৌঁছনোর পরেই পাপান বুঝতে পারলো বড়মা নয়, মল্লিকার আকর্ষণেই স্কুল পালিয়ে খুঁজে খুঁজে এবাড়িতে এসেছে সে।

*　　　*　　　*

বলো ত্রিনাথ, কি বলবে?

কাল আমি একটা অদ্ভুৎ স্বপ্ন দেখেছি। তারপর সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সকাল হতে না হতে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

বলো, ত্রিনাথ, কি স্বপ্ন দেখেছ। চুপ করে আছো কেন? কোনো অমঙ্গলের স্বপ্ন দেখেছ তুমি?

স্বপ্নটা মঙ্গল না, অমঙ্গল তা বুঝতে পারিনি বলেই তো তোমার কাছে ছুটে এসেছি। দেখলাম মা দুর্গা কাঁদছেন। মা আর স্বর্গে ফিরে যেতে চান না।

কথাটা ত্রিনাথ এমনভাবে বললেন যেন অমোঘ এক বিশ্বাসকে তিনি উপলব্ধির চেতনায় আস্বাদন করে আনন্দে মগ্ন হয়ে আছেন।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না কণকলতা। নিজের হাতের লোমকূপে শিহরণ ছড়াতে দেখলেন। তারপর অন্য একরকম গলায় বলে উঠলেন, তোমার বোধহয় — মুক্তি হয়ে গেল ত্রিনাথ।

মুক্তি, কি বলছো দিদি?

ত্রিনাথ স্বাভাবিক চৈতন্য ফিরে এলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ভয় পাওয়া অস্পষ্ট থাকলো না। গলায় সোনায় গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালাটা দুলতে থাকলো। মাথাটা আস্তে আস্তে বুকের ওপর নেমে এলো। বারান্দা টপকে জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের মেঝেয় একমুঠো সোনালী রোদ্দুর এসে পড়েছে। সেই রোদ্দুরের আলপনার দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকলেন কণকলতা। তারপর যখন চোখ তুললেন দেখলেন, ত্রিনাথ একইভাবে মাথা নীচু করে বসে আছেন। তাঁর দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

*   *   *

এই ছেলে কি বললি, তুই ইস্কুল পালিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিস?

মল্লিকার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাপান ঘাড় নাড়লো, বললাম তো, ইস্কুল করতে ভাল্লাগে না। কি ভালোলাগে রে তোর, আমাকে? বল্ না ন্যাকার মতো চুপ করে আছিস্ কেন?

ছাড়ো, বড়মার কাছে যাবো।

যাবি, আগে আমার কথার উত্তর দে।

লাগে।

আমার সঙ্গে পালাবি তুই?

কোথায়?

আমি যেখানে নিয়ে যাবো।

না।

মল্লিকা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, যা ভেতরে যা। তোর বড়মা আছে। তোকে মোহনভোগ খেতে দেবে।

*   *   *

পরদিন তখনো রাতের আকাশ ফর্সা হয়নি। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল। সামনে রাস্তার ওদিকে আখড়া বাড়িতে ধীর লয়ে দুজনা একসঙ্গে খঞ্জনি বাজিয়ে হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে গাইছে।

মা — ঘুম আর জাগরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন কণকলতা। এক ডাকেই উঠে বসলেন।

কে —?

আমি, স্নেহাংশু ঘরে ঢুকলো না, একটা দুঃসংবাদ আছে। ত্রিনাথ মামা মারা গেছেন। দোতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে রাস্তার ওপর মুখ থুবরে পড়েছেন। শরৎ ডাক্তার দেখে বলেছেন, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। আমি শ্মশানে যাচ্ছি।

স্নেহাংশু চলে গেল।

এখন ওপরের ক্লাসে ওঠার পর থেকেই পাপান একাই স্কুলে যায়। একাই ফেরে স্কুল থেকে। যাতায়াতের রাস্তায় স্বর্ণলতার বাড়ি পড়ে। তার ঠিক উল্টোদিকের ভাঙ্গাচোরা একতলা বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো পাপান। ঐ বাড়িটার একখানা ঘরের মাথার ওপর একখানা বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা রূপশ্রী স্টুডিও। কালকেও সাইনবোর্ডখানা এখানে ছিল না।

এই বাড়িতে তাহলে ছবি তোলার স্টুডিও হলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো পাপান। মুখোমুখি দেয়ালে দাঁড়িয়ে কাঁচদেওয়া শোকেসের মধ্যে অনেকগুলো ফটো সাজানো। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো মস্ত বড় একটা কাগজের ওপর আঁকা রাজবাড়ির দৃশ্য। পাপান জানে এখানে যারা ছবি তুলতে আসবে তারা রাজবাড়ির সিনের সামনে দাঁড়াবে। বাসন্তীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে বলে তারও তিনখানা ছবি তোলানো হয়েছে। ছবিগুলোতে বাসন্তীও ঠিক এইরকম বড় থামওয়ালা প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই যে শুভব্রত, স্কুলে যাচ্ছো, চলো আমিও যাবো। অবণী জ্যাঠা। অল্পদিন হলো তাদের স্কুলে প্রাইমারী সেকশানে পড়াচ্ছেন তিনি। পূর্ণেন্দু জ্যাঠার খুব বন্ধু অবণী জ্যাঠা। রোজ বিকেলে পূর্ণ জ্যাঠা সদলবলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যান। অবণী জ্যাঠা থাকেন সেই দলে। পাপান যখনি পূর্ণ জ্যাঠাকে দেখে তখনি তার কেন যেন যাত্রাদলের রাজার কথা মনে হয়। পূর্ণ জ্যাঠা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। সারা শহর জুড়ে তাঁর প্রতিপত্তি। স্কুলের মাস্টার মশাইদের মুখে পাপান শুনেছে ইংরেজ সরকার শিগগিরই নাকি পূর্ণ জ্যাঠাকে রায়বাহাদুর উপাধি দেবে। অবণী জ্যাঠা সাহেবদের মতন ফর্সা। সাদা টুইলের পাঞ্জাবী ধুতি

আর পায়ে কালো নিউকাট। একদম সোজা হয়ে হাঁটেন অবণী জ্যাঠা। কথায় কথায় ইংরিজি বলেন।

এখানে কি দেখছিলে?

এই রাজবাড়িটা কি কোথাও আছে?

অবণী হাসলেন তার কথা শুনে। বললেন, হ্যাঁ আছে। শিল্পীর মনের কল্পনায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজপ্রাসাদের নাম কি বলোতো? জানো না?

বাকিংহাম প্যালেস।

কথাটা শুনতে শুনতে পাপান অবণীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে অবণীর মুখে। তার অবাক হওয়াটা লক্ষ্য না করেই অবণী বললেন, চলো শুভব্রত, স্কুলের দেরী হয়ে যাবে। দুজনা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি পথ অতিক্রম করার পরেও অবণী একটাও কথা বললেন না। স্কুলের কাছাকাছি পৌছে বললেন, তোমার এবার কোন ক্লাস হলো শুভব্রত?

সেভেন।

বাঃ। বড় হয়ে কি করবে?

পাপান হঠাৎ তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। চলতে চলতে ভেবে নিল কি বলা ঠিক হবে। তারপর বলল, রেলের গার্ড।

কেন, রেলের গার্ড হতে ইচ্ছে করলো কেন তোমার?

ক্ষুদিরাম হতে ইচ্ছে করে না, প্রফুল্ল চাকি হতে ইচ্ছে করে না?

অবণীর ফর্সা মুকখানা উত্তেজনায় লাল দেখাচ্ছে এখন। চোখদুটো পাপানের মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। তোমার কোনো দোষ নেই, অবণী অন্য একরকম ক্লান্ত গলায় বললেন, দোষ আসলে রক্তের। আমরা সবাই পালাতেই চাই। ...তুমিও রেলের দারোগা হয়ে পালিয়ে বেড়াতেই চাও। শোনো বাবা, আজ স্কুলের ছুটির পর আমার বাড়িতে এসো। আসবে তো?

পাপান ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।

অবণী জ্যাঠা দাদির বড় ভাইয়ের ছেলে। কেন কে জানে, অবণী জ্যাঠাকে পাপান কখনো তাদের বাড়িতে আসতে দ্যাখেনি। এর আগে কোনদিন এত কথাও বলেনি ওঁর সঙ্গে। ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে বার বার পাপানের মনে সমানে অবণীর কথাগুলো ফিরে ফিরে এলো, কেন ক্ষুদিরাম হতে ইচ্ছে করে না, প্রফুল্ল চাকি হতে ইচ্ছে করে না। অবণী জ্যাঠা কি তাহলে বন্দেমাতরম দলের লোক?

শুভব্রত, এসো ভেতরে এসো —

অবণী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাপানের মনে হলো তিনি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। এই বাড়িতে কত বছর পর এলো পাপান মনে নেই তার। খুব ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে দুর্গাপুজোর শেষে বিজয়ার দিন প্রণাম করতে আসতো। ভেতরের উঠানের চারপাশে পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর। একপাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। পাপানের মনে আছে সিঁড়িটা এতই ঘুপচি যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকতো।

ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এককোণার একখানা ঘরে বড় ঠাকুমা থাকতেন। বড় ঠাকুমার কাছে কেউ গেলেই তিনি তাকে গালাগাল দিতেন, মর মর, তোর সিঁথির সিঁদুর মুছে যাক, তোর ছেলে তোর কোল খালি করুক। আবাগীর বেটি, শয়তান...

ওঠাকুমা, ঠাকুমা, গালাগাল দিচ্ছেন কেন এমন করে আমি কি করেছি...?

বড় ঠাকুমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মূর্তি। বলতেন, গালাগাল, ওমা ষাট ষাট গালাগাল আবার কখন দিলাম... বেঁচে থাকো, ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে তোমার সংসার ভরভরন্ত হোক —।

পাপান শুনেছিল, বড় ঠাকুমা চিরকাল এরকম ছিলেন না। ঠাকুর্দ্দা মারা যাবার পর থেকেই হঠাৎ তাঁর মাথাটার গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। সারাদিন রাতে একবারের জন্যে ঘর থেকে বেরোন না। নীচেও নামেন না।

বড় ঠাকুমার বড় ছেলে সুধানকাকু স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। সুধানকাকুর গানবাজনার খুব শখ ছিল। পাপান শুনেছে সুধানকাকু নাকি এখন কলকাতায় সিনেমায় গান গায়। তাঁর গলার গান সিনেমার নায়কের গলায় শোনা যায়।

এই ঘরে এসো শুভব্রত, বসো, এখানে বসো।

পালিশ ওঠা একটা মেহগনি কাঠের খাটের ওপর জড় করা বিছানার গাদা একপাশে সরিয়ে তাকে বসতে বললেন অবণী। তারপর গলা তুলে ডেকে উঠলেন।

বকুল, বকুল শুনে যাও —

বকুল, বনানী, বীথি। তিন মেয়ে অবণী জেঠ্যুর।

জেঠিমাকে কখনো দেখেনি পাপান। মা পাপানকে বলেছিল, ওই বাড়ির তিন মেয়েকে দেখেছিসতো। ওদের মা আরও সুন্দরী ছিলেন। একদম সরস্বতী ঠাকুরের মত চেহারা।

দিদি মারা যাবার পর ভাসুরঠাকুর একলা ঐ তিন মেয়েকে মানুষ করেছেন।

মার কাছ থেকে শোনা সেই রূপবতী নারীর ফটো এখন পাপানের চোখের সামনে ঝুলছে। ঝাপসা কাচ, ফ্রেমে উইয়ের দাঁতের দাগ। একটা শুকনো ফুলের মালা ঝুলছে ফটোখানায়। এখনো মৃত্যুদিনটা স্মরণ করা হয় বোঝা যাচ্ছে।

এই যে বকুল, একে চেনো তুমি?

একটু লম্বাটে ধরনের মুখ। চোখ ধাধানো রং আর চাপা ঠোঁটের ভাঁজে একটা হাসির আভাস। চোখ তুলেই মুখ নামিয়ে নিল পাপান। বকুল হেসে উঠলো, বারে ওকে চিনবো না কেন, ওতো পাপান।

তার নামটা বকুল এমনভাবে উচ্চারণ করলে যেন তার একবুক তেষ্টা পেয়েছে।

না, না পাপান নয়। অবণী জ্যেঠু মাথা নাড়লেন। ওর নাম শুভব্রত। এতো সুন্দর একটা নাম থাকতে পাপান বলে ডাকবে কেন ওকে। আচ্ছা পাপান বলে আর ডাকবো না ওকে, বকুল আনলা থেকে একটা কাচা চাদর টেনে নিয়ে এগিয়ে এলো, বাবা উঠুন চাদরটা পাল্টে দিই —।

থাক, থাক এখন, অবণী বললেন, ওকে কিছু খেতে দাও...

একবাটি মুড়ি নারকেল কোড়া এনে বিছানায় রাখলো বীথি। বলল, খাও।

বীথিকে চেনে পাপান। রোজ স্কুলে যাবার সময় বীথি রাস্তার ধারে জানলার ওপাশে চুপ করে গরাদের ওপর মুখচেপে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ একই সময় একইভাবে তার দাঁড়িয়ে থাকাটার একদিনের জন্যেও ব্যতিক্রম হয়নি। বীথির চোখ দুটো পাপানকে দেখে না, দূরের আকাশ দেখে না, কাছের মানুষজনের আসা যাওয়া দেখে না তাহলে কি দেখে?. বিষণ্ণ আত্মস্থ এবং অপলক দুটি চোখ দিয়ে কি বলতে চায় বীথি? কাকে খোঁজে সে।

দূর থেকে দেখা বীথি এখন পাপানের মুখের সামনে। তার প্রতিটি নিশ্বাসে একটা সুবাস উঠে আসছে। এই সুবাস চেনে না সে। কোথা থেকে আসছে তাও বুঝতে পারছে না। কাঁসার বাঁটিতে মাখা মুড়ি আর নারকেল কোড়াতেও কি এই সুবাস পাবে পাপান। বীথির চোখে এখন আর কোন তন্ময়তা নেই। হারিয়ে যাওয়ার বিভ্রম নেই। বীথি এখন ভীষণ স্বাভাবিক আর সত্যি রক্তমাংসের তৈরী বীথি।

তুমি বুঝি মুড়ি ভালোবাসো না পাপান?

বীথি বলল কথাগুলো।

আঃ, বীথি কেন কথা বলল। কেন বীথি তার প্রতিদিনের দেখা রহস্য দিয়ে ঘেরা বীথিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিল।

না, পাপান বলল, মুড়ি আমি ভালবাসি।

বীথি এখনো তার হাতখানা ধরে আছে। বীথির নিশ্বাস তার মুখে কপালে পড়ছে।

অবণী জ্যেঠু আর বকুলদি কাছাকাছি থেকেও তারদিকে তাকিয়ে নেই। পাপানের খুব জানতে ইচ্ছে করছিল, বীথি তাকে অন্যরকম দেখে বলল কেন। কি রকম দেখতে লাগে তাকে বীথির চোখে।

আমি এখন বড় হয়ে যাচ্ছি, মনে মনে বলল পাপান। মল্লিকা পিসি আমাকে বড় করে দিয়েছে। আমাদের ক্লাসের হরনাথ আমায় গল্প বলেছে। আমাদের ইংরিজির টিচার জয়ন্ত স্যার তাঁর এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করেন। প্রেম কথার মানে কি তা আগে আমি জানতাম না। বৌ থাকা সত্ত্বেও জয়ন্ত স্যার প্রেম করেন শুনে পাপানের খুব খারাপ লেগেছিল। তার চেয়েও তার খারাপ লেগেছিল হরনাথকে প্রেমের মত অস্পৃশ্য আর নিষিদ্ধ শব্দটাকে অবলীলায় উচ্চারণ করতে শুনে। হরনাথের সঙ্গে তারপর থেকে তিনদিন কথা বলেনি সে। হরনাথ নিজেই যেচে তার কাছে এসেছিল। ছুটির পর একদিন বলেছিল, আমার সঙ্গে চল্ আজ তোকে জয়ন্ত স্যারের প্রেমিকাকে দেখাবো। তাদের স্কুলের ঠিক পেছন দিকে একটা পাঁচিল ঘেরা বিশাল আমবাগান আছে। আমবাগানের মাঝখানে ভূতের বাড়ির মতন ভাঙ্গাচোরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। পাপান বাড়িটা চেনে। ওটা মুখার্জ্জীদের বাড়ি। তাদের এই স্কুলটা আগে মুখার্জ্জীদেরই ছিল। তারপর কলকাতার বড় কোর্টে মামলায় মুখার্জ্জীরা হেরে যায়। তারপর থেকে স্কুলটা আর তাঁদের নেই।

বাগানের পাঁচিল ঘেঁসে উত্তরপশ্চিম দিকে দুটো আকাশ ছোঁয়া স্বর্ণচাপার গাছ। সারাবছর গাছদুটোয় ফুল ফোটে। চাঁপাগাছের নীচে এসে হরনাথ বলেছিল, এখানে দাঁড়া, এক্ষুনি আসবে।

কে আসবে?

এলেই দেখতে পাবি কে আসবে?

জয়ন্ত স্যারের প্রেমিকা?

এ্যাই, তুই কিন্তু খিস্তি করলি।

যাঃ, মোটেই আমি খিস্তি করিনি।

হরনাথ খুব হাসছিল। হাসি থামিয়ে বলল, ভালো ছেলে হয়ে থাকলে

চিরকাল ঠকবি কিন্তু বলে দিচ্ছি। কথার মাঝখানেই হরনাথ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, ওই যে দ্যাখ দ্যাখ...

মুখার্জ্জী বাড়ির অন্দরের উঠোনটা এখান থেকে দেখা যায়। উঠোনে দাঁড়িয়ে কাকলীদি।

দেখলি পাপান?

ওতো কাকলীদি —

তুই চিনিস?

বারে, চিনবো না কেন, কাকলীদিতো আমাদের বাড়িতে যায়। মেজদির খুব বন্ধু ছিল। কাকলীদির মাথায় এত্তো চুল। যে দেখে সেই অবাক হয়। নকাকীমা বলেন, যে মেয়েদের মাথায় বেশী চুল তাদের ভাগ্য ভালো হয় না। নকাকীমা কেন যে এমন কথা বলেন। পাপান সেকথা শুনে একটুও বিশ্বাস করেনি।

শুভব্রত —

অবণী বললেন, তুমি সময় পেলেই আমাদের বাড়িতে এসো। আমি তোমাকে কি করে শেক্সপিয়ার পড়তে হয় শিখিয়ে দেব।

বাবা ও এখনো খুব ছেলে মানুষ, বকুলদি পাপানের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো, ও এমনিই আমাদের বাড়িতে আসবে। রোজ সন্ধ্যেবেলা আমরা লুডো খেলি। বাবাও খেলেন আমাদের সঙ্গে।

আর তুমি?

বীথি অদ্ভুতভাবে তাকাল পাপানের মুখের দিকে তারপর মাথা নাড়লো। নাহ। পাপান আমাদের বাড়িতে আসবে না, কক্ষনো আসবে না।

কেন, তুই ওকে আমাদের বাড়িতে আসতে বারণ করছিস কেন বীথি? বকুলদি হাতের চাদরখানা আবার আনলায় তুলে রাখতে রাখতে বললো।

বীথি খাটের একপাশে পা ঝুলিয়ে বসলো। এখন তার চোখ দুটো আবার অতলান্ত দেখাচ্ছে। পাপান লক্ষ্য করলো বীথির ঠোঁট দুটো বেশ পুরু। চোখ ভুরু থুতনী সবকিছুর সঙ্গে বেশ মানানসই।

বীথি বলল, আমাদের এখানে তুই আর আসিসনে পাপান। আমরা খুব গরীব।

অবণী জ্যেঠুর মুখে এখন একটুও বিষণ্ণতা নেই বরং আলোর একটা আভায় জ্বলজ্বল করছে মুখখানা। তিনি বললেন, জানো শুভব্রত, আমরা গরীব নই, শুধু আমাদের অনেক টাকা নেই। গরীব হওয়াটা আর টাকা না থাকাটা এক নয়, বীথি। শুভব্রত বড় হলে বুঝতে পারবে পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব মানুষরা বাকিংহাম প্যালেসে থাকে।

বাবা, বকুলদি শাসন করার ভঙ্গী করলো, আপনি ওকে মুড়িগুলো খেতে দিন।

ফেরার সময় বকুলদি বাইরের দরজা অবধি পাপানের সঙ্গে এলো। বকুলদিকে খুব ভাল লাগছিল পাপানের। বকুলদির মধ্যে কোন ছায়া নেই। বকুলদির মধ্যে কোন হারিয়ে যাওয়া নেই। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছনোর পর পাপানের মনে হলো বকুলদি নয়, বীথিই তার মন জুড়ে রয়েছে।

একি পাপান, তোমার ইস্কুল থেকে আসতে এত দেরী হলো। মেজ বৌ পাপানের বইগুলো নিলেন, যাও ওপরে যাও, কারা এসেছে আমদের বাড়িতে দেখে এসো।

কারা এসেছে মেজমা?

মেজ ঠাকুরঝির শ্বশুর বাড়ির লোকজন। জয়ন্তীর বিয়ের কথা পাপানের ভালো করে মনে নেই। মেজ পিসেমশাই খুব রাশভারী আর গম্ভীর মানুষ। এখানে এসে একদিন থেকেই চলে যান। বলেন, বেশী থাকলে ব্যবসার ক্ষতি হবে। মেজ পিসেমশাই এর চোখে সোনার চশমা। শীত গরম সমসময়েই কোটপ্যান্ট পরে থাকেন তিনি। শুধু বাড়ির সবাই নয়, কণকলতাও তাঁর এই জামাইটিকে এড়িয়ে চলেন।

পিসেমশাইকে প্রণাম করে চোখ তুলতেই জানলার পাশে দাঁড়ানো শাড়ি পড়া একটি তরুণীর ওপর পাপানের দৃষ্টি আটকে গেল। সেও তাকে দেখছিল। এখন চোখ সরিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপাশে নারকোল গাছের পাতায় বসে থাকা একটা টিয়াকে নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগলো।

ভালো আছো পাপান?

পিসেমশাই এর প্রশ্নের জবাবে মাথা কাত করলো সে, হ্যাঁ।

স্কুলে তোমাদের কি কি পড়া হয়?

ইংরিজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অংক, মরাল সায়েন্স।

ইতিহাসে শিবাজীর কথা পড়েছ?

হ্যাঁ —

আওরঙ্গদেব?

হ্যাঁ।

গুড্। বলোতো শিবাজী বড় না আওরঙ্গদেব বড়?

পাপান এইরকম একটা প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাক্যহারা হয়ে থাকলো। লক্ষ্য করলো, জানলার পাশের মেয়েটি নারকেল গাছের মাথায় টিয়া পাখীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে এনে তাকে দেখছে এখন। তার দুচোখে

চিক্‌মিক্‌ করছে একটা হাসি। রাত্তিরে খেতে বসে মেয়েটা পাপানের পাতে নিজের মাছটা তুলে দিল, তুই খা। আমার মাছ খেতে ভাল্লাগে না।

পাপান ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আজকের দিনটা এখনো মনের মধ্যে তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অবণী জ্যেঠু, বকুলদি, বীথি... তারপর বাড়ি ফেরার পর থেকে মেজপিসির দুজন সৎ ননদ...।

মাছটা হাতে নিয়ে পাশে তাকাল পাপান, মেজপিসির এই ননদের নাম ঝর্ণা। সে এখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

দালানে দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে। পাশাপাশি সার দিয়ে বারো চোদ্দজন খেতে বসেছে। লক্ষ্মণ ঠাকুর আর নবৌ পরিবেশন করছে।

এই তুই খাচ্ছিসনে কেনরে, নবৌ পাপানের পাতের সামনে বসলো, আয় আমি খাইয়ে দিই। বড়মা এবাড়ি থেকে চলে যাবার পর থেকে নবৌ অনেব বদলে গিয়েছে। এখন সকাল হতে না হতে সে নেমে এসে রান্নাঘরে ঢোকে। নবৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো পাপান, মেজদির মুখখানায় নমার মুখখানা কেটে বসানো ছিল। মেজদি বেঁচে থাকলে নবৌ বোধহয় এত খিটখিটে হতো না।

খাওয়ার পর আঁচাতে আঁচাতে ঝর্ণা বলল, এই তোদের এখানে বুঝি ইলেকট্রিক নেই?

না।

কোত্থাও নেই? রাত্তিরে অন্ধকারে শুস্‌ তোরা?

হ্যারিকেন জ্বালানো থাকে।

আমার ভীষণ ভয় করছে। এই পাপান, তুই আমার সঙ্গে শুবি?

ছেলেরা অন্য ঘরে শোয়।

শুক্‌গে, আমি আর তুই একসঙ্গে শোব। নাহলে সারারাত্তির আমার ঘুমই আসবে না।

পাপানের সবকথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না। অবণী জ্যেঠুর কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে এখন, পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব মানুষরা বাকিংহাম প্যালেসে থাকে।

পাপান জানে, ওটা পঞ্চম জর্জের রাজপ্রাসাদ। পঞ্চম জর্জ কি পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব লোক? তাহলে অবণী জ্যেঠু এই কথা বললেন কেন?

পাপান, এই পাপান, চল্‌ ছাদে যাবি।

না।

চল্ না প্লিজ। দুজনা গল্প করবো। তুই কলকাতায় গিয়েছিস?

না।

হাওড়া ব্রীজ দেখিসনি?

না।

লাটসাহেবের বাড়ি?

না, না।

তুই কিন্তু খুব রেগে আছিস পাপান।

ঝর্ণা হাসতে লাগলো।

পাপানের হাত ধরে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে এলো ঝর্ণা। তোদের ছাদটা কি ভালো রে।

বাচ্চা মেয়ের মতো সারাছাদ দৌড়ে বেড়াতে থাকলো সে। বাতাসে ঝর্ণার শাড়িটা ফুলে উঠেছে। চুল খুলে পিঠের ওপর লুটিয়ে আছে। ছোটা থামিয়ে কার্ণিসে বুক দিয়ে হাঁফাতে লাগলো সে। একটু পরে শাড়ির আঁচলে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বলল, এই পাপান, বলতো আমার এখন কি ইচ্ছে করছে?

জানিনে?

স্টুপিড। ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়তে। চল্ দুজনা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে নীচে লাফিয়ে পড়ি।

ধ্যাৎ —

তুই বুঝি মরতে ভয় পাস্? ভীতু কোথাকার।

পাপান কেন জানে না মনে মনে বলল বীথি বললে আমি এক্ষুনি লাফিয়ে পড়তে পারি।

পাপান, পাপান —

নীচ থেকে অরুন্ধুতির গলা ভেসে এলো, তোমরা নীচে নেমে এসো, রাত হয়েছে।

পাপান ছাদ থেকে মাথা ঝুকিয়ে চিৎকার করে বলল, আসছি মেজমা —।

ঝর্ণা রেগে গেল, ননসেন্স। তোদের বাড়িটাও ঠিক আমাদের মতন। কিছুতেই ছাদে উঠতে দেয় না।

পাপানের গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঝর্ণা। তার বুকের ওপর থেকে আঁচল সরে গিয়েছে। অন্ধকারেও স্পষ্ট হয়ে আছে দুরন্ত আহ্বানের মত একটা মাংসের গোলাকার আকৃতি।

সেখানে বীথির চোখের মতন কোনো রহস্য নেই। অবণীজ্যেঠুর কথায় মতন

কোন হেঁয়ালী নেই। বরং তার পায়ের পাতা থেকে উঠে আসা রক্তের দাবানলটাকে স্পষ্ট চিনতে পারছে পাপান।

মল্লিকা পিসিটা এক নম্বরের মিথ্যুক। তাকে পরী দেখাবে বলেও দেখায় নি। মেজপিসির এই সৎ ননদ যার নাম ঝর্ণা সেকি জানে পরীরা কোথায় থাকে?

মল্লিকা পিসি পরী দেখানোর নাম করে নিজেকে দেখিয়েছিল।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে বাড়ির কোথাও কেউ ছিল না। বক্‌ফুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে একটানে মল্লিকা পিসি তার বুক থেকে শাড়ি নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই হাঁদা, দ্যাখ, আমাকে তাকিয়ে দেখ, আমিই পরী।

তুমি পরী দেখেছ?

পরী, ঝর্ণা অবার চোখ মেলে তারদিকে অনেকক্ষণ একইভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, তোর বুঝি পরী দেখতে খুব ইচ্ছে করছে?

হুঁ —। মহিউদ্দিন সাহেবকে তার ছোটবেলায় পরীরা নিয়ে গিয়েছিল।

কে বলল?

বারে সব্বাই জানে।

পরী বলে কিছু নেই পাপান।

আছে। আছে।

আমিও ছোটবেলায় তোর মতন পরীর কথা ভাবতাম। এখন আর বিশ্বাস করিনে। রাক্ষসী আছে, আমি দেখেছি।

যাঃ।

হ্যাঁ সত্যি বলছি, মাকালীর দিব্বি। তোর মেজপিসিটা রাক্ষসী। আমাদের দুবোনকে একদিন গিলে খাবে দেখিস।

সবকিছু পাপানের কাছে কেমন যেন দুর্ব্বোধ্য হয়ে যাচ্ছিল। বলল, চলো নীচে যাই এবার। চল্। সিড়িতে পা দেবার আগে পেছন থেকে হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরে পাপান বাধা দেবার আগেই নিজের ভিজে ভিজে ঠোঁট দুটো পাপানের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলো ঝর্ণা। ভাঙ্গা অথচ তীব্র গলায় বলল, তুই কাউকে বলিসনে পাপান, রাক্ষসীটা আমাদের খাওয়ার আগেই আমরা বাড়ি থেকে পালাবো।

পুজোর ঠিক আগে আগেই স্নেহাংশু বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সে শ্বশুরবাড়ি ঘরজামাই হবে আগেই শুনেছিলেন কণকলতা। অরুন্ধুতি তার বাপ মার একমাত্র সন্তান। অগাধ সম্পত্তির মালিক। দেখাশোনা করার মতো মানুষের অভাবে অতো সম্পত্তি বেহাত হতে বসেছে। কণকলতার শরীরে

বাতছাড়া নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে। সারারাত ঘুম হয় না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করেন আর মাঝে মাঝে উঠে বারান্দায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আজকাল বারান্দাতেও দাঁড়াতে পারেন না তিনি।

চারধারে পিচ জ্বালানোর উৎকট গন্ধ। শহরটার সমস্ত কাঁচা রাস্তা পিচের রাস্তা করা হচ্ছে। হুম হুম শব্দে একটা ভারী ড্রামওলা গাড়ি এসে জ্বলন্ত পিচ আর পাথরকে সমান করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে।

শহরজুড়ে এখন পাকা রাস্তা ছাড়া অন্য কোন কথা নেই। দীননাথ কদিন আগে কার কাছে থেকে যেন শুনে এসেছে এ শহরটাও কলকাতার মতন হয়ে যাবে। এখানকার রাস্তা দিওে নাকি ট্রাম গাড়ি চলবে।

কদিন আগে পূর্ণেন্দু এসেছিল কণকলতার শরীরের খবর নিতে। কথাটা তাকে শুধিয়েছিলেন তিনি। পূর্ণেন্দু বলেছিল, না না পিসি, ওসব গুজব। কলকাতা হচ্ছে রাজধানী। আমাদের শহর কোনদিন অত বড় হতে পারবে না।

কথাটা মানতে পারেননি কণকলতা। বড় হবার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। পূর্ণ কি জানতো সে নিজে একদিন এতবড় হবে। ইংরেজ সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধি দেবে?

এতবড় বাড়ি, ঘরদোর এখন বেশ ফাঁকা লাগে। নিখিলের চুন সিমেন্টের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে। নরু কদিন আগে খবর নিয়ে এসেছিল, খালধারে জমির খোঁজ করছে জগৎ। সুবিধে মত জায়গা পেলে সে নিজেই ইট ভাঁটা করবে।

ধীরু আর স্নেহাংশুর এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার আঘাত সামলে নিয়েছিলেন কণকলতা। কিন্তু জগতের আলাদা ভাঁটা করার খবরটা শুনে অবধি অসহ্য একটা কষ্ট অভিমান ও বেদনায় প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর।. তিনি বুঝতে পারছিলেন নিজের মৃত্যুর আগেই নিজের হাতে তৈরী তার এত সাধের সংসার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাবে। অমোঘ নিয়তির মতন কোন চেষ্টাতেই এই পরিণতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। এই দুর্দিনে পরামর্শের জন্যে কার কাছে যাবেন তিনি। ত্রিনাথ থাকলে সে নিজে থেকেই পাশে এসে দাঁড়াত। স্বর্ণলতা অদ্ভুত একটা অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর কাজ দিনরাত্তির দীপংকার জামাইবাবুর বিছানার পাশে বসে স্বামীর গা থেকে একটা একটা করে পিপঁড়ে বেছে ফেলা।

দুই বৌকে সঙ্গে নিয়ে একদিন দীপংকরকে দেখতে গিয়েছিলেন কণকলতা। ফিরে এসে তিনদিন মুখে কিছু তুলতে পারেননি। দিনরাত্তির একমনে শুধু প্রার্থনা

করেছেন, হে ঠাকুর এবার তুমি জামাইবাবুকে নাও। মানুষের এই অবস্তা চোখে দেখা যায় না।

কর্ত্তামা —

এসো, নরু, ভেতরে এসো। হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দাও।...

হ্যারিকেনের পলতে বাড়িয়ে দিয়ে মেঝেতে উবু হয়ে বসলো নরু। বলল, আজ সাতগাড়ি ইট বিক্রি হয়েছে চল্লিশ টাকা দরে।

ইটের হাজার চল্লিশ হয়ে গেল, কি বলছো তুমি?

হ্যাঁ। নতুনবাবু খদ্দেরকে বললেন তার কমে হবে না। খদ্দেরও রাজি হয়ে গেল।

এক বাণ্ডিল নোট আর একথলি খুচরো টাকা চৌকির ওপর রাখলে নরু, নতুনবাবু বললেন, চালানের জন্যে আলাদা একজন ম্যানেজার রাখবেন। চালাক লোক না হলে আজকাল ব্যবসা চালানো শক্ত।

তুমি কি এরমধ্যে বালিঘাটে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। বড়বাবুর ছেলের ব্যবসা ভালই চলছে। কিন্তু টাকাপয়সা বোধহয় হাতে থাকছে না।

কেন? প্রশ্নটা করে কণকলতা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নরুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নরু সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। প্রায় এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলল, কর্ত্তামা, বড় নাতির এবার একটা বিয়ে দিয়ে দিন।

কতো বয়স হলো সব্যসাচীর?

আঠারো উনিশ? না আরও বেশী?

নরু বলল, কাঁচা টাকা হাতে থাকলে টাকা কামড়ায়। আপনাকে আমি আর কি বলবো কর্ত্তামা।

কদিন আগে দুপুরে অলকানন্দা এসেছিল। সন্ধ্যে অবধি ছিল সে। আজকাল চশমা নিয়েছে সে। সোনালী ফ্রেমের চশমাটা পরে তাকে বেশ ভারিক্কী দেখাচ্ছিল। নিজের হাতের তাস তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কণকলতা বলেছিলেন, তুমি বসো বৌমা, আমি তোমাদের খেলা দেখি আসলে খেলা নয় পাশে বসে অলকানন্দাকেই দেখছিলেন তিনি। তাঁর বুকের মধ্যে স্নেহের বান ডেকে উথাল পাথাল করছিল তাঁর বুকখানা। এই মেয়েটিকে তিনিই পুত্রবধূ করে তাঁর সংসারে এনেছিলেন। কোন সময়েই কণকলতার মনে হয়নি বড় বৌ অন্য ঘর থেকে তাঁর সংসারে এসেছে। বরং মনে হয়েছে অলকানন্দা তাঁর বড় মেয়ে। পারুলের আগে হয়েছে।

কই, সেদিন অতক্ষণ থাকার পরেও তো বড় বৌমা ছেলের বিয়ের সম্বন্ধে তাঁকে কিছু বলেনি। তিনি নিজে ওপর পড়া হয়ে কেন বলতে যাবেন। তোমরা সংসার আলাদা করে নিয়েছ ভালোমন্দ এখন নিজেরাই বোঝ?

মা —

নীচে ধীরুর গলা। নরু নড়েচড়ে বসে বলল, মা বড়বাবু এসেছেন। একটু পরেই ধীরু ঘরে ঢুকলো। তারসঙ্গে একজন মুটের মাথায় একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের বাণ্ডিল। ঘরে ঢুকে ধীরু বলল, মোটটা ঘরের মধ্যে এনে রাখো। বস্ এখানে বস্ আগে — কণকলতা তাকে নিজের পাশটা দেখিয়ে বললেন। ধীরু বসতে বসতে বলল, কলকাতায় গিয়েছিলাম, সকলের জন্যে পুজোর জামাকাপড় কিনে এনেছি। বৌমাদের জন্যে শান্তিপুরী শাড়ি আর আটপৌরে পরার জন্যে মোহিনী মিলের শাড়ি।

ধীরু বরাবরই একটু কম কথা বলে। কণকলতার সঙ্গে কথা শেষ করে এবার নরুর দিকে ফিরলো সে। বলল, কলকাতায় শুনে এলাম যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। ওদেশ থেকে এখানে যুদ্ধ চলে আসতে একমাসও লাগবে না। ব্ল্যাক আউটের মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে দেখে এলাম। ইস্কুল কলেজে নোটিশ দিয়েছে সরকার থেকে। জোয়ান ছেলেদের সৈন্য দলে ভর্তি হতে বলেছে। এসব কথাই কণকলতার কানে অচেনা লাগছিল। তবু বুঝতে পারছিলেন ওই সব শব্দগুলোর প্রতিটি এক একটা অশুভ ইঙ্গিত। রামায়ণে মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণণা পড়ে পড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে যে ধারণা মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছে তারসঙ্গে এ যুদ্ধের কতটুকু মিল আর কতটুকু অমিল তার কিছুই জানেন না কণকলতা। জানেন না কার সঙ্গে কার যুদ্ধ। কিসের জন্য যুদ্ধ।

তবু তাঁর মন বলছে তাঁর এতদিনের জীবনের সব ধ্যানধারণা ওলট পালট হয়ে যাবে। ভালোমন্দর সংজ্ঞা পাল্টে যাবে। ভাবনা ঠেলে রেখে কণকলতা ধীরুকে লক্ষ্য কবে বলে উঠলেন, তোর বোধহয় খিদে লেগেছে, এখান থেকে খেয়ে যাস্।

আচ্ছা।

হাতমুখ ধুয়ে আয়। আমার ঘরে মিষ্টি আছে দিচ্ছি।

ধীরু বিনাবাক্যে উঠে দাঁড়ালো দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, জগৎকে বলবেন, ভাঁটাটা যেন তাড়াতাড়ি চালু করে দেয়। ইটের হাজার একশোয় উঠে যাবে। নরু এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। এবার মুখ তুলে বলল, কর্ত্তামা দেখেছেন, বড়বাবু রোগা হয়ে গেছেন। বোধহয় সময়মতো খাওয়াদাওয়া

করেন না। কথা বলতে বলতে নরু ঘরের মধ্যে নামিয়ে রাখা নতুন কাপড়ের পোঁটলার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ধীরু হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে নিজের পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজের মোড়ক বার করে কণকলতার হাতে দিয়ে বলল, আপনার বাতের মেশিনে লাগানোর জন্যে কলকাতা থেকে দুটো বিলেতের তৈরী ব্যাটারী কিনে এনেছি। অনেক দিন চলবে।

এই পাড়ায় ঢোকার মুখেই সামনে উঠোনওলা একচালার বাড়িটায় বদ্যিনাথরা থাকে। বাজারে বদ্যিনাথের পেতল কাঁসার বাসনের দোকান। প্রতিবছর বদ্যিনাথ বাড়িতে দুর্গাপুজো করে। পাড়ার মধ্যে ঐ একখানা পুজো বলে বেশ ভিড় হয়। কণকলতা পুজোর চারদিন বার বার যান।

দশমীর দিন সকালে সেজ বৌ দৌড়তে দৌড়তে কণকলতার ঘরে এলো, মা শুনেছেন, কাঁসারি বাড়িতে মা দুর্গার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে। সারা শহরের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। কাঁসারি গিন্নী খুব কান্নাকাটি করছে। কণকলতা সেজ বৌয়ের কথা শুনে বললেন, সত্যি কথা! হ্যাঁ মা, অনেকে দেখেছে। আমি আর ঠাকুরঝি যাচ্ছি আপনি যাবেন?

না। তোমরা যাও।

ত্রিনাথের কথা মনে পড়ছিল তাঁর। ত্রিনাথ থাকলে স্বচক্ষে দেবীর চোখের জল দেখতে পেত। কিন্তু স্বপ্নে দেবীর কান্না দেখে তাকে মরতে হলো। এবারও কি সেই রকমই কিছু ঘটবে? না তারচেয়েও ভয়ানক কিছু?

অজানা একটা আশঙ্কায় কণকলতার বুকের মধ্যেটায় গুরুগুর করে উঠলো। গলা তুলে ডেকে উঠলেন তিনি, বাসন্তী, সেজ বৌমা —

বাসন্তী দৌড়ে এলো কি বলছো?

তোমাদের কাঁসারি বাড়ি যেতে হবে না।

সবাই তো যাচ্ছে।

যাক্। যা বলছি শোনো। তোমরা যাবে না।

রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ত্রিনাথকে দেখলেন তিনি। ঠিক সেই রকমই আছে ত্রিনাথ। শুধু চোখের দৃষ্টিটা উদভ্রান্তের মতন। ঘুম ভেঙ্গে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলেন কণকলতা।

ত্রিনাথের আত্মার কি গতি হয়নি? তাহলে তাকে ওরকম উদভ্রান্ত দেখলেন কেন তিনি?

এই শোনো —

পাপান পেছনে ডাক শুনে দাঁড়াল। বীথি। ঠিক তেমনিভাবে জানলার দিকে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে।

কি বলছেন?

তুমি বকুলদির বিয়েতে আসোনি কেন?

আমার ওপর রাগ করেছ বুঝি?

না না।

এখন আসবে একটু?

আসছি।

ছোট ঘাস জমিটুকু পেরিয়ে বড় গেট ঠেলে ভেতরের উঠোনে এলো পাপান। তারপর পরপর দুটো দরজা ছেড়ে তৃতীয় দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ রাখলো বকুলদি — বকুল নয়, বীথি এগিয়ে এলো, বকুলদি তো শ্বশুরবাড়িতে। এসো ভেতরে এসো।

বলুন, কি বলবেন?

বাঃ, ডাকলেই বুঝি কিছু বলতে হয়?

পাপান তাকিয়ে থাকলো।

তোমারতো এখন ক্লাস নাইন?

কি করে জানলেন?

তুমি সেবার যখন এসেছিলে তখন তোমার ক্লাস সেভেন বলেছিলে মনে নেই?

তার দুবছর আগের আসাটাকে নিখুঁত মনে করে রেখেছে বীথি। আশ্চর্য!

গত সপ্তায় তুমি পর পর দুদিন স্কুলে যাওনি। পাপান ঘাড় নাড়লো, হ্যাঁ যাইনি। জ্বর হয়েছিল। কই, আমায় কেউ বলেনিতো — বীথির দুচোখ প্রবল জ্বরের তাপ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

ওইটুকু জ্বরে আমার কিছু হয়নি।

হয়েছে। তুমি রোগা হয়ে গেছ একটু।

আপনিও রোগা হয়ে গেছেন।

সত্যি? বীথি হাসলো, আমি রোগা হয়েছি কেন বলোতো?

জানিনে।

আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবে তিনি আমায় দেখতে এসে রোগা হবার কথা বলে গিয়েছেন।

আপনার বিয়ে? যাঃ —

হ্যাঁ। খোঁড়া বরের সঙ্গে।

বীথির চোখের দুই মণিতে এক অজানা মেঘ। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামার কথা। কিন্তু একটা ফোঁটাও ঝরলো না অত মেঘ থাকা সত্ত্বেও।

পাপানের পিসির ননদ ঝর্ণার কথা মনে পড়লো। ঝর্ণা বলেছিল চল্ দুজনা একসঙ্গে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ি।

পাপান মনে মনে বলল, চলো বীথি আমরা হাত ধরাধরি করে ছাদে যাই। তারপর ছাদ থেকে হাত ধরাধরি করে নীচে লাফিয়ে পড়ি। তোমার সঙ্গে মরতে আমার একটুও ভয় করবে না।

তুমি আমার বিয়েতে আসবে?

আসবো।

না, কক্ষনো এসোনা। ছেলেরা ছেলেদের বড় হিংসে করে।

বারে, আমাকে আপনার বর হিংসে করবে কেন?

করবে, আমি জানি করবে... বীথি লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আবার তক্ষুনি ফিরে এলো, আমার একটা কথা রাখবে পাপান?

কি কথা?

আমার বিয়ের পর তুমি আর এই রাস্তা দিয়ে ইস্কুলে যেওনা। বীথির গভীর চোখ ভারী চিবুক, পুরু ভেজা ঠোঁট এবং সমস্ত শরীর জুড়ে এই মুহূর্তের নিরুচ্চার আর্তনাদটাকে কি করে যেন শুনে ফেলল পাপান। তার ষোল বছরের শরীরটা থেকে একটা দুর্বার প্রতিবাদের মত আগুন জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ হিম শীতল বরফে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখন গলাবুক হৃদপিণ্ড সবটুকু জুড়ে বাধভাঙ্গা নদীর মাতাল জলোচ্ছ্বাস ঝপাং ঝপাং শব্দে পাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বুকের কিনারা ছাপিয়ে উঠে আসতে চাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে পাপান দেখল বীথি চলে গেছে।

স্কুলের কাছাকাছি এসে মুখার্জ্জী বাড়ির আমবাগানের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে স্বর্ণচাপাগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল সে। সেখান থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে ফিসফিস করে বলে উঠলো — কাকলীদি... কাকলীদি... শিগগির আমার কাছে আয়। তোর চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

(২৭)

কদিন থেকে কি হয়েছে কে জানে সারা শহর জুড়ে সমস্ত মানুষ একসঙ্গে বোবা হয়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে কথা বলছে না কেউ। সন্ধ্যের আগে আগেই পথঘাট জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে।

বাংলার স্যার ক্লাসে এসে বললেন, স্কুল বোধহয় বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কেন স্যার, কেন?

তোমরা জানো না? শহরে যেকোন সময় দাঙ্গা লাগতে পারে।

একটি ছেলে সামনের বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল, দাঙ্গা কি স্যার?

বাংলার স্যার বললেন, চুপ করে বসো। তাহের কই, ফকির আসেনি ক্লাসে?

ওরা স্যার তিনদিন থেকে আসছে না।

চিন্তিত মুখে বাংলার স্যার বললেন, ওরা বোধহয় আর আসবে না।

তাহের... তাহের...

স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে তাহেরদের বাড়ির সামনে গিয়ে পাপান তার নাম ধরে ডাকলো।

কোন সাড়া নেই।

আবার তাহেরের নাম ধরে ডাকলো পাপান। অনেকক্ষণ পর তাহেরের মা বেরিয়ে এলেন, কাকে চাই? আমি পাপান চাচি, আমায় চিনতে পারছেন না? আমিতো তাহরের সঙ্গে কতোবার আপনাদের বাড়িতে এসেছি।

তাহের ঘরে নেই।

ও তিনদিন থেকে স্কুলে যাচ্ছে না। হেড মাস্টাবমশাই আমায় খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তাহেরের মা বললেন, তাহের ঢাকায় গিযেছে। চাচার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে।

মুসলমান পাড়াটা শহরের একপাশে। একটা মসজিদ। মসজিদটা ঘিরে অনেকগুলো বকুলগাছ রাস্তার দুধারে বাড়ি। আনকোড়া নতুন ঝকঝকে দোতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল পাপান। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন লতিফ চাচা। পাপানকে দেখে হাত তুলে ডাকলেন, এখানে কোথায় আসছিলা বাপ্?

তাহেরদের বাড়ি।

ওরাতো নাই।

না নেই।

তোমার বাবা ভালো আছেন?

পাপান ঘাড় নাড়লো, আছেন।

তাকে আমার আদাব জানিও। বোলো, লতিফ চাচা বলছিল অনেকদিন দেখা হয়নি, মনটা ভালোলাগে না। আমরা তো একই স্কুলে এক ক্লাসে পড়াশোনা করেছি। তোমার বাবার শাদিতে আমি বরযাত্রী গিয়েছিলাম।

লতিফ চাচার ইস্পাতের মতন ঝকঝকে সটান চেহারা। মাথার চুল মাঝে সিঁথি কেটে আঁচড়ানো। টকটকে ফর্সা রং। চোখে সুর্মা।

হাসছিলেন লতিফ চাচা — তোমার দাদু বড় রাগী মানুষ ছিলেন। আমার দোকানে জুতো কিনতে এলে আমরা ভয়ে দাঁড়ায়ে থাকতাম। কথা বলার সাহস হতোনা। লতিফ চাচা এখনো হাসছেন। ঝকঝকে মালিন্যহীন হাসি।

যাও বাপ, বাড়ি যাও এখন। দেরী হলে মা ভাববেন।

ঠিক তিনদিন পর বিকেলের দিকে কারকাছে যেন খবর পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলো পাপান। লতিফ মিঞার জুতোর দোকান লুট হচ্ছে। দোকানের সামনে মানুষে মানুষে ছয়লাপ। তাদের অনেককেই চেনেনা পাপান। জনাচারেক মানুষ মোটা মোটা লোহার শাবল হাতে নিয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। খানিকটা দূরে সারিবদ্ধ নারীপুরুষ রুদ্ধশ্বাসে এই দিকে তাকিয়ে আছে। সামান্য পরে দুহাতে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে পাপানের পাশ দিয়েই অবণী জ্যেঠু লতিফ মিঞার দোকানের সামনে গিয়ে দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়ালেন — খবরদার... খবরদার বলছি কেউ দোকান ভাঙ্গবে না... ফিরে যাও... ফিরে যাও সবাই... এত বড় অন্যায় করলে পাপ হবে...

অবণী জ্যেঠু উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছেন। তাঁর শাদা টুইলের পাঞ্জাবী ফালাফালা। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। হঠাৎ শাবল হাতে একজন লাফিয়ে অবণী জ্যেঠুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পরক্ষণে একটা হ্যাচকাটানে অবণী জ্যেঠুর দেহটা ছিটকে এসে রাস্তার ওপর মুখ থুবরে পড়লো। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনা চেঁচিয়ে বলে উঠলো, শালা গান্ধীর বাচ্চা —

কলকলিয়ে হাসির ঝড় উঠলো। কেউ অবণী জ্যেঠুর কাছে যাচ্ছে না...। তেমনিভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন তিনি। জ্ঞান নেই। পাপানের বুকের মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে। অবণী জ্যেঠুকে এইভাবে রাস্তার ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার জন্যে লোকগুলোর ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে পাপানের। দমাদম শব্দে শাবলের বারি পড়ছে লতিফ চাচার বন্ধ দোকানের দরজায়। একখানা পাল্লা আগলা হয়ে একপাশে ঝুলে পড়লো। হুরহুর করে বাধভাঙ্গা স্রোতের মতন সেইটুকু জায়গা দিয়েই লোক ঢুকছে ভেতরে। উল্লাসে চিৎকার করছে, গালাগাল দিচ্ছে হাসছে একসঙ্গে অনেকগুলো সাময়িক পাগল হয়ে যাওয়া মানুষ।

অবণী জ্যেঠুকে কেউ এখন আর লক্ষ্যই করছে না। তিনি তেমনিভাবেই রাস্তায় পড়ে আছেন। হাত দুখানা বুকের নীচে চাপা। পায়ের চটি খানিকটা দূরে পড়ে আছে।

দোকানের আর একটা দরজা ভাঙ্গলো। রাস্তার ওপর জুতোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দুজনা মাথায় দুখানা চেয়ার নিয়ে ভিড়ের বাইরে চলে গেল।

এই, তুই এখানে কি করছিস, পালা শিগগির...

হরনাথ। তার দুহাতে দুপাটি নতুন জুতো। তুই দোকান লুট করলি...?

পাপানের কথা শুনে দাঁতবার করে হাসলো হরনাথ, বেশ করেছি, আবার করবো — ভাগ শালা — হরনাথ আবার দোকানের দিকে এগিয়ে গেল, এটা একই পায়ের দুপাটি, শালা তাড়াতাড়িতে বুঝতে পারিনি —।

কান্নার মত নোনা কিছু গলার কাছে উঠে এসেছে পাপানের। অবণী জ্যেঠুর দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়নোর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে যেন পাপানের চুলের মুঠি চেপে ধরলো। এ্যাই কোথায় যাচ্ছিস? চলে আয় শিগগির।

পাপান মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল, বড়দা তুমি।

সব্যসাচী শক্ত করে পাপানের হাত ধরে তাকে টানলো, শিগগির পালা এখান থেকে, এক্ষুনি পুলিশ আসবে, গুলি চালাবে —।

পাপান শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়েও সব্যসাচীর হাত ছাড়াতে পারলো না।

হরনাথই খবরটা দিল পাপানকে, এই শুনেছিস, তোর কাকলীদি গলায় দড়ি দিয়েছে।

খবরটা শুনে বইয়ের ওপর মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে থাকলো পাপান অনেকক্ষণ।

জয়ন্ত স্যার স্কুলে আসেননি। পা অবধি চুল ছিল কাকলীদির। এলো খোপা বাধলে বেশী মানতো তাকে। মেজদি বলতো, এই তোর চুল থেকে অর্দ্ধেকটা আমায় দে। ন মার মতন মেজদি. মাথাতেও একমাথা কোঁকড়া চুল ছিল। মেজদি যখন ছুটে ছুটে বেড়াতো ঘাড় অবধি নামা চুলের বোঝা তার মুখখানাকে ঘিরে ছড়িয়ে থাকতো।

স্কুলে ছুটির আগে হরনাথ বলল, চল পাপান, সবাই মিলে জয়ন্ত স্যারের বাড়িতে যাই।

জয়ন্ত স্যারই তাদের দরজা খুলে দিলেন, কি ব্যাপার তোমরা।

স্যার বোধহয় সদ্য চান করে উঠেছেন। গা থেকে পাওডারের উগ্র গন্ধ বেরচ্ছে।

এসো, ভেতরে এসো সবাই —

না স্যার, হরনাথ আমতা আমতা করে বলল, আসলে আমরা,

বুঝেছি বুঝেছি, স্কুলের নাটকের ডাইরেকশান এবারও আমাকেই দিতে হবে, ঠিক আছে।

জয়ন্ত স্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে থুথু ফেলল হরনাথ। শালা, এক নম্বরের বাসটার্ড। কিরকম নাটক করলো দেখলি তোরা। তার কথার কে কি উত্তর দেয় তা শোনার জন্যে দাঁড়াল না সে। দৌড়ে রাস্তার একদিকে চলে গেল। তারপর সেখান থেকে উল্টোদিকের রাস্তায় কেন যেন পাপানের মনে হলো হরনাথ এখন কাকলীদের বাড়িতেই যাবে।

বাড়িতে পনেরো দিন হলো মিস্ত্রি লেগেছে।

যেখানে যা দরকার ভাঙ্গাচোড়া জায়গাগুলোর নতুন করে সিমেন্টের পলেস্তারা ধরিয়ে তারপর সারা বাড়িতে কলিফেরানো হবে।

ন বৌয়ের একদম ধুলোবালি সহ্য হয় না। সব সময় নাকে কাপড় দিয়ে ঘুরছে সে।

কদিন আগে স্নেহাংশু এসেছিল। তার সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক। কণকলতার ঘরে অনেকদিন পর সব ছেলেদের জমায়েত হয়েছিল। ধীরু সকালেই চলে এসেছিল তার সঙ্গে অলকানন্দা।

পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখা হয়েছিল।

স্নেহাংশুর বড় মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের দিন পাকা করে লম্বা চুলওলা মানুষটা যাবার আগে কণকলতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন, আপনার বংশের মেয়ে আমার ঘরের বৌ হয়ে যাবে এতো আমার সৌভাগ্য। ছেলে রেলে চাকরি করে। কলকাতায় বৌবাজারে মেসে থাকে।

বিয়ের পর আলাদা বাড়ি ভাড়া করবে।

পরদিনই কণকলতা দীননাথকে ডেকে বলেছিলেন, মিস্ত্রিদের খবর দাও। সারা বাড়ি সারিয়ে রং করতে হবে। হাতে একদম সময় নেই।

আজ বিকেলে দাশু স্যাকরা এসেছিল। কণকলতা বললেন, সেজ বৌমা, যাও সিন্দুকটা খুলে একটা ঘটিতে মোহর আছে সেটা নিয়ে এসো। তারপর কি ভেবে নিজেই আবার বললেন থাক মোহরের ঘটি আনতে হবে না। একটা কৌটোতে খুচরো সোনা আছে সেটা নিয়ে এসো।

দাশুর হাতে এক মুঠো সোনা তুলে দিয়ে কণকলতা বললেন, ওজন করে দ্যাখোতো দাশু পঁচিশ ভরি হবে কিনা?

কি কি হবে মা?

কণকলতা বললেন, দশভরির একটা সীতাহার করবে। বাকিটা দিয়ে আটগাছা চুড়ি হবে। একটা গহনাও যেন খোলা না হয় দাশু। তাহলে কুটুম বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবো না।

জড়োয়া কিছু দেবেন না মা?

দেব। ওসব আগেই করিয়ে রেখেছি। বাড়িতে এতগুলো নাতি নাতনী, না ব্যবস্থা করে রাখলে চলবে কেন।

বাড়িঘর রং হয়ে যাবার পর স্নেহাংশুর পোস্ট কার্ড এলো, বিয়ে এখান থেকে হবে না। পাত্ররা ওখানে যেতে রাজি হয়নি।

জগৎ বলল, আমি লোকটাকে দেখেই বুঝেছিলাম ত্যাদোর। মেজদার উচিৎ বিয়েটা ভেঙ্গে দেওয়া।

দীননাথ জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে কি দাশু স্যাকরাকে গহ্ণা করতে নিষেধ করে দেব?

না। না। স্নেহাংশু মেয়ের বিয়েতে ছেলেমেয়ে বৌরা সবাই যাবে। তারা কি শুধু হাতে যাবে নাকি?

আপনি যাবেন না?

না। কুটুম বাড়িতে গিয়ে নাতনীর বিয়েতে পাতপেড়ে খেতে পারবো না আমি।

আপনি না খেলে মেজবাবু খুব দুঃখ পাবেন।

ঘরজামাই ছেলের মার দুঃখ তারচেয়ে অনেক বেশী দীননাথ।

আজই সকালে একটা টাকা আর ঝুড়ি নিয়ে বাজারে গিয়েছিল শুকনন্দন। খানিকক্ষণ পর খালি হাতে ফিরে এসে বলল, আরো রূপিয়া দিজিয়ে, এক টাকায় কুছু হবে না। আলু চার আনা সের মাঙলো। করূয়া তেল ভি একসের পঁচাশ পয়সা।

কে?

আমি।

আমি কে?

শুভব্রত —

অবণী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন, এসো, ভেতরে এসো।

তোমার তো এবার ফাইন্যাল ইয়ার। ইংরিজি কে পড়াচ্ছেন তোমাদের?

আগে জয়ন্ত স্যার পড়াতেন, উনি চলে যাবার পর সরোজ স্যার পড়াচ্ছেন।

গুড, ভেরি গুড। জয়ন্তবাবুও ভালো ইংরিজি জানতেন।

আপনি কি আর কোনদিন স্কুলে যাবেন না?

না। কেন যাবো বলো? কাদের শেখাতে যাবো?

এখন ধুতির ওপর ফতুয়া পরে আছেন অবণী। তাও বাইরে থেকে দেহের

শীর্ণতাটা বোঝা যায়। আজকাল পূর্ণেন্দুর প্রাত্যহিক বেড়ানোর সময়েও সঙ্গী হন না অবণী। সারাদিন বই মুখে করে বসে থাকেন।

ওমা তুমি, কখন এলে --?

বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো বকুলদি। আশ্চর্য বকুলদি এসেছে জানতোই না পাপান। বিয়ের পর অনেক বদলে গিয়েছে বকুলদি। শাড়ি গহনা আর শরীর উপচানো যৌবনে বকুলদিকে অপরূপা দেখাচ্ছে।

কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো বলতো শুভব্রত।

বিয়ের পর আপনিতো এই প্রথম এলেন?

হ্যাঁ। অতদূর থেকে আসা কি সহজ?

কানপুরে বিয়ে হয়েছে বকুলদির। বীথির বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। কলকাতাতো বেশী দূরের রাস্তা নয়, তাও বীথি আসে না কেন?

একটা ডিসে দুটো পান্তুয়া সাজিয়ে তার সামনে রাখলো বকুলদি। বলল, বীথির ছেলে হয়েছে খবর পেয়েছ?

কথাটা শুনে পাপানের কেন যেন মনে হলো বুকের মধ্যে খুব গভীরে কোথাও একটা ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল। তার বদলে অন্য একটা চেতনা সূক্ষ্ম থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো — আমি এখন আর ছোট নেই... বড় হয়ে যাচ্ছি বলেই এইসব কথাবার্তা আমাকে বলছে বকুলদি। বড় হওয়া কাকে বলে? শরীরে না মনে বড় হলে তবে মানুষ বড় হয়?

ঝর্ণার মুখখানা মনে মধ্যে ভেসে এলো পাপানের...।

ঝর্ণা মনে বড় হতে পারেনি বলেই সেদিন রাত্তিরে তার মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিল, কক্ষনো মেয়ে হয়ে জন্মাসনে পাপান। মেয়েদের বড্ড কষ্টরে। তারা ভাল হতে চাইলেও ভগবান তাদের ভাল হতে দেন না।

ছাড়ো, আমার দম আটকে যাচ্ছে, —

ঝর্ণা বলেছিল, তুই এখনো বড় হোসনি, তাও তোর মধ্যে পুরুষের অহংকার আছে পাপান।

ঘরের মেঝেয় টানা বিছানা। তাতে আরও অনেকে শুয়েছে তাদের সঙ্গে। এত গভীর রাতে নিশ্চয় তাদের দুজনার মতো কেউ জেগে নেই। তবু তার সংলাপে বেশ সাবধানী ছিল ঝর্ণা। সর্তক হাতে তার জামার টিপবোতাম খোলার পট পট শব্দটা শুনতে পেয়েছিল পাপান। হ্যারিকেন যেটা ঘরের কোণায় শুরু থেকেই জ্বলছিল একটু আগে সেটা দপদপিয়ে উঠেই নিভে গেছে।

দক্ষ পিসিকে পাপান বলতে শুনেছে, আজকাল কেরসিন তেলে নাকি জল মেশানো হচ্ছে। তারজন্যেও যুদ্ধকে দায়ী করেছিল দক্ষ।

পাপানের কথাটা মনে হয়ে হাসি পেল। সেই রাতে ঝর্ণা তার সঙ্গে যা করেছিল তারজন্যেও কি যুদ্ধ দায়ী। যুদ্ধ কি মানুষকেও খারাপ করে? ক্ষুধার্ত করে তোলে?

বকুলদি বলল, ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেলে আমার ওখানে কানপুরে বেড়াতে যেও শুভব্রত।

অবণী তার কথা শুনে নড়েচড়ে বসলেন, আঠারোশো সাতান্নোর সিপাই বিদ্রোহে কানপুর ছিল ইংরেজদের টার্গেট। অথচ কি মজা দেখ শুভব্রত, সিপাই বিদ্রেহের সূচনা হলো আমাদের এই বাংলাদেশেই — তাও সেরকমভাবে সেসময়ে জায়গাটাকে তেমন গুরুত্বই দেয়নি ইংরেজ। দিলে বোধহয় ভালো হতো, আমরা এরকম ক্লীব হয়ে যেতাম না। সবাই একসঙ্গে জড় হয়ে নিরীহ লতিফ মিঞার দোকান লুট করতাম না।

— জ্যাঠামশাই —

অবণী হাসলেন। বললেন, তুমি কি জিজ্ঞাসা করবে আমি জানি শুভব্রত। আমার ভাঙ্গা পাঁজড়ার হাড় দুখানা জোড়া লেগেছে কিনা, তাইতো?

লতিফ মিঞা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেও এই একই প্রশ্ন করেছিল। শুধু একলা লতিফ মিঞা কেন।

একদিন ছুটির ঠিক আগে স্কুলে হেড মাস্টারমশাই এর ঘর থেকে দিদার বক্স চাচাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল পাপান।

তাকে দেখে দিদার বক্স চাচা এগিয়ে এসেছিলেন, আরে আরে কেমন আছো বাপ্।

আমি ভাল নেই বাপ্। এখান থেকে চলে যাচ্ছি তাই শেষ বারের মত স্কুলটাকে দেখে গেলাম। তিনপুরুষ ধরে এই স্কুলে পড়াশোনা করেছি। আমার ছেলেও এখানকার ছাত্র ছিল।

দিদার চাচার ছেলে মতিউরকে এ শহরের সবাই চেনে। সে পাইলট হয়েছে।

দিদার চাচার দুচোখ ছলছল করছিল। পা অবধি ঝুল শাদা শেরওয়ানি, গলায় একটা শাদা কাচের পুঁতির মালা। বুক অবধি লম্বা পাকা দাড়ি। সব মিলিয়ে দিদার চাচাকে ফকিরের মত লাগতো। শেরওয়ানির একটা পকেট ভর্তি করে স্কুলের মাটি নিয়েছেন তিনি। মাটিমাখা হাত দিয়েই পাপানকে কাছে টেনে নিলেন দিদার চাচা — আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না বাপ্, এর আগে মরলাম না কেন বলতো বাপ্।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে দিদার চাচার জন্যে মনে মনে প্রার্থনা করেছিল পাপান, এমন একটা কিছু যেন হয় ভগবান, যেন দিদার চাচার এখান থেকে না যাওয়া হয়।

কদিন পর পাপান অবাক হয়ে দেখেছিল ঘাটের রাস্তার পাশে দিদার চাচার অতোবড় কাঠের দোকানটার মাথায় নতুন সাইনবোর্ড। দোকানের মধ্যে গদিতে বসে আছে আর কেউ নয় জগৎ।

রাতারাতি জগৎ কি করে যে দিদার চাচার সব ব্যবসার মালিক হয়ে গেল সেরহস্য আজও বুঝতে পারেনি পাপান।

বকুলদি এক গ্লাস জল এনে রাখলো। বলল, পান্তুয়া দুটো খেয়ে নাও, আমি নিজে দোকানে গিয়ে কিনে এনেছি। এক একটা পান্তুয়া একআনা করে।

বকুলদি বোধহয় তার ছোটবেলায় ফিরে যাচ্ছিল তার কণ্ঠস্বরে সেই রকম ছায়া আর রোমাঞ্চ।

বাবা, আমার মনে আছে, এই সেদিনও গণেশ ময়রার দোকানে এক আনায় দুটো পান্তুয়া পাওয়া যেত। মিস্টি দুটো খেয়ে ঢকঢক করে গ্লাসের সবজলটুকু খেয়ে খালি গ্লাসটা বকুলের হাতে দিল পাপান। অনেকদিন এ ঘরে পা দেয়নি সে। আজ দেখল অনেক কিছু ওলট পালট হয়েছে। দেয়ালে যেখানে বকুলদির মার ছবিটা টাঙ্গানো থাকতো সেই দেয়ালটা খালি।

সময় স্মৃতিকেও খেয়ে ফেলে। ছবিটা দেখতে না পেয়ে কেন কে জানে পাপানের খারাপ লাগলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার পাশে এগিয়ে গেল। ঠিক এইখানটাতে দাঁড়িয়ে থাকতো বীথি। তার শরীরের গন্ধ এখন আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

পাপান তবু বাতাসে বীথির গন্ধ পাবার চেষ্টা করলো। বীথি কি কলকাতায় তার শ্বশুরবাড়িতে তার নিজের মত করে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে? নীচের রাস্তার চলমান জীবনে, আকাশের অনন্ত শূন্যে বীথির গভীর চোখ দুটো কি এখনো কাউকে খুঁজে বেড়ায়?

পরশু আমার কাছে আসতে পারবে শুভব্রত?

অবনী বই থেকে মুখ তুলে বললেন।

কেন জ্যেঠামশাই।

পরশু সভাষ বসু আসছেন। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাবো।

আসবো জ্যাঠামশাই।

বাড়ি ফিরে পাপান দেখল সারা বাড়ি জুড়ে হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।

দোতলার দালান জুড়ে ভাঙ্গা কাচের জিনিসপত্র। দলাকরা জামা কাপড়। একটা চামড়ার সুটকেশ ডালা খোলা অবস্থায় চিৎ হয়ে আছে। সারা বাড়ি থমথমে। দক্ষ সিড়িতে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে আর শাপ শাপান্ত করছে।

মা কি হয়েছে। পাপান সেজ বৌয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তোমার ন মার সোনার হারটা পাওয়া যাচ্ছে না। চান করার সময় কুয়োর পাশে খুলে রেখেছিল।

অলোক দুদিন পর পর বাড়ি থেকে বাইরে যায়নি। চুপচাপ ঘরের মধ্যেই বসে আছে। বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। সেজ বৌ দুতিনবার জিগ্যেস করেছিল কিগো, আজ তোমার বাইরে যাওয়া নেই?

না।

তুমি যে বলেছিলে এ সপ্তায় কলকাতা যাবে?

আহ্, বিরক্ত করো নাতো আমায়। যাও এখান থেকে।

এ মানুষটাকে বোঝা শক্ত নয়। নিশ্চয় কোথাও একটা কিছু ঘটেছে। কলকাতার শেঠরা আর আগের মত খোঁজ খবর করছে না। দরকারের আগেই টাকার বাণ্ডিল নিয়ে শেঠের লোক এসে দরজার সামনে বসে থাকছে না। যুদ্ধ শেষ তো দূরের কথা এখনো ভালো করে শুরুই হয়নি। তার আগেই কতরকমের গুজব ছড়াচ্ছে চারদিকে। জাপানীরা নাকি কলকাতা শহরটাকে ধ্বংস করে দেবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছেন সুযোগের অপেক্ষায়। নিত্যনতুন মানুষের আগমনে রাস্তা ঘাটে চলা দায়। তারা কোথা থেকে আসছে কেন আসছে তা কেউ বলছে না। তবু মানুষ শুধু এসেই যাচ্ছে ট্রেন ভর্তি করে।

এরমধ্যে একদিন সকালের দিকে পূর্ণেন্দু এসেছিল কণকলতার কাছে, পিসিমা।

আয় আয়, কেমন আছিস তুই?

পূর্ণ গলা নামিয়ে বলল, আমি ভালো নেই পিসিমা। কেউ আর ভাল থাকবে না। ভাল থাকার দিন বোধহয় শেষ হয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বরে হতাশা।

কণকলতা বললেন, তুই কি জিনিষপত্রের দাম বাড়ার কথা বলছিস?

না, আমি যা বলতে এসেছি শুনে ভয় পাবে। যুদ্ধ লেগেছে সবাই জানে কিন্তু কবে থামবে কেউ জানে না। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই বোধহয় দুর্ভিক্ষ হবে দেশজুড়ে।

দুর্ভিক্ষ কিরে পূর্ণ?

পূর্ণেন্দু কণকলতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে একরকমের অসুখ পিসি, যে অসুখ হলে মানুষ মানুষের মাংস খায়।

বলিস কি? তা এ অসুখটার কোনো ওষুধ নেই?

আছে। আছে পিসি। মজা হচ্ছে এর ওষুধ শুধু একজনাই জানে।

কেরে সে?

তুমি তার নাম শুনেছ পিসি। লাট সাহেব কদিন বাদেই মানুষটা আমাদের শহরে আসছেন। তোমার এই বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই প্রসেশন করে যাবেন। আমি তার আগে খবর দিয়ে যাবো। তোমার ঝুল বারান্দায় দাঁড়ালেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।

চলে যাবার আগে আবার দাঁড়াল পূর্ণেন্দু। বলল, নিখিল কোথায়?

জানিনে।

খবর পেলাম ও সিমেন্টের বস্তায় গঙ্গার মাটি মিশিয়ে ভেজাল দিচ্ছে। লোকে আগাম টাকা জমা দিয়ে তাই লাইন দিয়ে কিনছে। ওকে একটু সাবধান করে দিও তুমি। ভেজালের কারবারিদের ধরার জন্যে ইংরেজ সরকার হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কণকলতাও বুঝতে পারছিলেন নিখিল কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। তার এই পরিবর্তনটা এত দ্রুত যে চোখে লাগে। এসব দেখার পরেও কিছু বলতে পারেন না কণকলতা। আশ্চর্য আজকাল ভয় পেতে আরম্ভ করেছেন তিনি। তাঁর ভয় নিখিলকে, নিখিলের বৌকে, তাঁর ভয় জগৎকে, তাঁর ভয় গোটা সংসারটাকে... এই এতোগুলো ভয়ের ওপর পূর্ণেন্দু তাঁর মনে একটা নতুন ভয়ের কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে গেল যার নাম দুর্ভিক্ষ।

*　　　　*　　　　*

হঠাৎ সব্যসাচীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। মেয়ের বাপমা কেউ নেই। নিজের বলতে এক ভাই। গ্রামে মামার কাছে মানুষ। পরমা সুন্দরী।

ফুলপাতায় ময়ূরপঙ্খী সাজানো মোটরে নাতবৌ যখন এসে পৌঁছলো সারা পাড়া ভেঙ্গে পড়লো বৌ দেখতে। বিয়ের বরকর্ত্তা হয়ে গিয়েছিল অলোক। মেয়ে দেখে পাকা কথা দেবার সময়েও সেই ছিল। ফিরে এসে বলেছিল, মা আপনার নাতবৌকে সাক্ষাৎ সরস্বতীর মতন দেখতে।

গাড়ি থেকে বৌ নামার পর কণকলতা তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, বড় বৌমা নাতবৌকে নিজের ঘরে নিয়ে যাও। এত ধকলে ওর মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে, আহারে —

একবাড়ি লোক। গমগম করছে গোটা বাড়িটা। বাসন্তীর বিয়ের কতোদিন পর আবার আনন্দ উৎসব ঘটলো এবাড়িতে।

দোতলার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে বসেছিলেন যিনি তিনি হাত তুলে পাপানকে ডাকলেন, শোনো।

বলুন, পিশেমশাই —

মেজ পিশেমশাই এর পরণে এখন একটা ডোরা কাটা শ্লিপিং সুট।

যে মেয়েটি বিয়ে হয়ে এলো সে নাকি লেখাপড়া জানে না?

না, জানেতো।

জানে?

ক্লাস এইট পাশ।

গুড ম্যাচ। দাদা সেভেন বৌদি এইট। তুমি স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে কি করবে?

আমি, পাপান এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিল, জানিনে।

আমি জানি। ইট ভাঁটায় ঢুকবে। কুলি খাটাবে, খদ্দেরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাওনা আদায় করবে, ব্যাস জীবন শেষ। তোমাদের এই বাড়ির দোষ হচ্ছে নতুন কিছু ভাবতে পারো না।

নতুন ভাবনার মানুষ দেখেছে পাপান। অবণী জ্যেঠু। তাঁর পরিণতিও দেখেছে সে, এখন ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে বন্দী। আর একজন, বড় দাদির বর দীপংকর। সে মানুষটাও নিজের কাজে নিজে বন্দী। সারা গায়ে পিঁপড়ে নিয়ে দিনরাত শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুণছেন। হরনাথ, হ্যাঁ হরনাথও অন্যরকম ভাবনাচিন্তার ছেলে। কাকলীদি গলায় দড়ি দেবার পর হরনাথ একলা জয়ন্ত মাস্টারমশাই এর বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছিল।

হরনাথের কথা মনে হতেই পাপানের বুকজুড়ে একটা ঘেন্নার স্রোত বয়ে গেল। সুভাষ বোসের মিটিং দেখতে যাবার জন্য হরনাথের বাড়িতে গিয়েছিল পাপান।

হরনাথের বাবা পয়সাওলা লোক। জমিজমা ছাড়াও তাঁর অনেক শাঁসালো শিষ্য আছে। তাদের পাড়ার কাছেই হরনাথের বাড়ি।

হরনাথ, হরনাথ —

কি রে, হরনাথ একতলার একখানা ঘরের জানলা থেকে তার ডাক শুনে মুখ বাড়িয়েছিল, ইস্কুল যাসনি আজ?

না। চলো সুভাষ বসুর মিটিং শুনতে যাবো।

হরনাথ তার কথা শুনে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল তুই যা, আমি ব্যস্ত আছি —।

তুমি কিন্তু আমায় ডাকতে বলেছিলে?

ঠিক আছে, তুই যা, আমি পরে যাবো।

পাপান বুঝতে পারেনি কি করবে সে। হরনাথ জানলা থেকে সরে গিয়েছিল। পাপান চলে গিয়েও আবার ফিরে এসেছিল। জানজার পাশে গিয়ে হরনাথকে ডাকবে বলেও ডাকতে পারেনি। তার কণ্ঠস্বর কে যেন টিপে ধরেছিল — ঘরের মধ্যে হরনাথ একা নেই। একটা সতরঞ্চি পাতা চৌকির ওপর আধশোয়া হয়ে রয়েছে ফুল্লরা। হরনাথের গোটা শরীরটা তার ওপর ঝুঁকে আছে। তার মুখ জানলার উল্টো দিকে ফেরানো।

কিছুক্ষণের জন্যে পাপানের খেয়াল ছিল না সে কোথায়। সেখান থেকে পালিয়ে আসার আগেই হরনাথ আবার জানলার সামনে ফিরে এসেছিল। তার মুখে একটুও বিরক্তি নেই। অপরাধ বোধও নেই।

হরনাথ বলেছিল, একি, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস? যাসনি। এক মিনিট, আমি আসছি এক্ষুনি।

গায়ে সার্ট চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল হরনাথ, চল্।

পাশাপাশি দুজনা হাঁটতে হাঁটতে হরনাথই প্রথম কথা বলেছিল, তুই যা ভাবছিস তা কিন্তু নয়, ফুল্লরার কোন দোষ নেই। ও বলেছিল, আমাদের গাছ থেকে কটা এঁচোর নেবে।

তুমি খুব খারাপ, ভীষণ খারাপ — কথাটা মনে মনে ভাবলেও মুখ ফুটে বলতে পারেনি পাপান। তার মনের মধ্যে কি রকম একটা বিশ্রী তেতো স্বাদের অস্বস্তি তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। এই হরনাথই কাকলীদির আত্মহত্যাটাকে মেনে নিতে পারেনি। আমি ওর গাঁ ছুঁয়েছি শুধু, হরনাথের গলায় কোনো অনুতাপ ছিল না, বুঝতে পারছি আমায় তুই বিশ্বাস করছিসনে...

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারপাশে দৃষ্টি চালিয়ে অবণী জ্যেঠুকে খুঁজেছিল পাপান। কোথাও খুঁজে পায়নি।

তোমাদের এখানে পাইপের তামাক পাওয়া যায়না বুঝি?

মেজ পিশেমশাই ইজি চেয়ারের ওপর ঝুঁকে বসে পাপানের কাছে জানতে চাইলেন, আমি দুটো কৌটো এনেছিলাম, শেষ হয়ে গেল।

পাপানের কেন যেন মনে হলো মেজ পিশেমশাই কালই এখান থেকে চলে যাবেন এটা তারই একটা অজুহাত।

বুঝলে পাপান, গোটা পৃথিবীতে চারটে শহর আছে তারদিকে সারা পৃথিবীর মানুষ তাকিয়ে থাকে, তুমি জানো কোন কোন শহর?

জানি। প্যারিস।

পিশেমশাই সটান উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, একসেলেন্ট... ঠিক বলেছ..., দ্বিতীয় শহরটার নাম মস্কো।

কথার মধ্যেই নীচ থেকে কে যেন পাপানের নাম ধরে ডাকলো।

পাপান বলল, যাচ্ছি ই —

তাড়তাড়ি চলে গেল পাপান। তৃতীয় শহরটার নাম ভাবেতে ভাবতে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে সে থমকে দাঁড়াল — সিঁড়ির শেষ ধাপে মুখোমুখি দুটি মানুষের কথোপকথন তার কানে এসে বাজলো। মানুষ দুজন অলকানন্দা আর মল্লিকা পিসি। বড় বৌ মল্লিকা পিসির একখানা হাত নিজের মধ্যে ধরে আছেন।

মল্লিকা পিসি বলল, আমার হাত ছাড়ো।

অলকানন্দার কণ্ঠস্বর তার উত্তরে মিনতি করলো। আজকের রাত, আজকের রাতটা সবুকে তুই ছেড়ে দে মল্লিকা, আমি তোর হাত ধরছি...। নতুন বৌটার কাছে আমাদের ছোট করিসনে দোহাই তোর —

একপা একপা করে নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলো পাপান। সেখান থেকে এক দৌড়ে নিশ্বাস বন্ধ করে ছাদে উঠে গেল। মাথার ওপরে শ্লেটের মতো কালো আকাশে থরে থরে মেঘ সাজানো রয়েছে।

আজ বড়দার ফুলশয্যা।

আলসেয় বুক চেপে ঘনঘন নিশ্বাস নিল পাপান। তার গা ঘুলোচ্ছে। এক্ষুনি বমি হয়ে যাবে। কেন যেন পাপানের মনে হলো বমি করলে তার গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে আসবে। তার বুকের মধ্যেই শুধু নয় এই সংসারটা জুড়ে সকলের অলক্ষ্যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। কণকলতার ক্ষমতা নেই তাকে রোধ করার। পাপান কতক্ষণ ছাদের অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দুর্বোধ্য একটা যন্ত্রণায় নিজেকে দগ্ধ করেছে তার হিসেব নেই।

সামনের রাস্তায় একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দে তার তন্ময়তা কাটলো। ছাদ থেকে মুখ বাড়িয়ে রাস্তায় তাকিয়ে সে দেখতে পেল একটা ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি থেকে যে মেয়েটি এই মুহূর্তে নেমে এলো তার সমস্ত ভঙ্গী পাপানের খুব চেনা।

এই মেয়েটি তখনো শাড়ি পড়তো। দুহাত তুলে বাধা খোপা ভেঙ্গে ফেলে মাঝে মাঝেই আবার নতুন করে বাধতো। কে এলো? কারা এলো? বড়দার বিয়েতে এই পরিজনের দল সম্পর্কের সূত্রে এখানে এসেছে মনে মনে তা হিসেব নিকেষের আগেই পাপানের ঝট্ করে একটা নাম মনে পড়ে গেল — মেজ পিশেমশাই এর সৎ বোন ঝর্ণা। হ্যাঁ ঝর্ণাই।

আঃ — বুকের মধ্যের রক্তক্ষরণটা বন্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। তার বদলে নতুন একটা ঝড়। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে পাপানের হৃদপিণ্ড ফেটে চৌচির হতে হতে একটা আলোর শিখার তীক্ষ্ম রশ্মি জীবনের পরম সত্য হয়ে পাপানের কানের কাছে বেজে গেল — হেরে যেওনা পাপান। হেরে যেওনা। মানুষকে হারতে নেই।

(২৮)

শরৎ ডাক্তার ফেরার জন্যে গাড়িতে উঠে বসার আগে ধীরুকে কাছে ডাকলেন। গম্ভীর গলায় বলল, মাকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। যত তাড়তাড়ি ততই ভালো। আমি আমার স্যারের কাছে চিঠি দিয়ে দেব। উনি বিধান রায়কে দিয়ে দেখানোর সব ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজের ঘরে চৌকির ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা বিছানায় কাত হয়ে শুয়েছিলেন কশকলতা। আজ কতদিন হয়ে গেল তিনি নিচে নামেননি। ময়না দুটো সারাদিন ধরে তারস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে। বৌরা খাবার দেয় নিয়মিত। গাওয়া ঘিয়ে মাখা ছোলার ছাতু। বাটি ভর্তি ছাতু তেমনিই পড়ে থাকে। পাখী দুটো ছোঁয়না পর্যন্ত।

দক্ষ সাতদিনের জন্যে নিজের গাঁয়ে গিয়েছিল। দুদিন বাদেই ফিরে এসেছে। সেখানে থাকতে পারেনি। এই সংসার ছেড়ে তার স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই।

নিজের বাড়িঘর ছেড়ে অলকানন্দা এখানেই পড়ে আছে। স্নেহাংশু খবর পেয়ে একদিন মেজ বৌকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। দুদিন বাদেই আবার ফিরে গিয়েছে।

শরৎ ডাক্তার সকাল বিকেল দুবেলা এসে দেখে যায়। স্বর্ণলতা বোনের অসুখের খবর পেয়েছেন তাও আসতে পারেননি। দীপংকরের পাশ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও উঠতে পারেন না তিনি।

পিঁপড়ের দল এখন দীপংকরের শরীর ছেড়ে চোখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

অবণী জ্যেঠুর বকুলদির সঙ্গে কানপুর চলে যাওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল করেছেন তিনি। বলেছেন, এই সময় দীপংকরকে ছেড়ে যেতে পারবেন না তিনি। প্রতিদিন নিয়ম করে দুপুরে এক ঘন্টা দীপংকরের বিছানার পাশে গিয়ে বসেন অবণী। তাঁকে শেক্সপিয়ার থেকে পড়ে শোনান। দীপংকরের কথা জড়িয়ে গেলেও হাসিটা জীবন্ত আছে এখনো। অবনী প্রতিদিন সেখান থেকে উঠে আসার সময় ভাবেন, আজই শেষ পাঠ। কাল আর তাঁকে প্রয়োজন হবে না। কিন্তু অবণীর হিসেব মেলে না। ঠিক সময়ে স্বর্ণলতার ডাক আসে —

নিখিল জমি কিনেছে খবর পেলাম, অলোক রাত্রে বিছানায় শুয়ে সেজ বৌকে বলল, ওখানে বাড়ি করে উঠে যাবে।

সেজবৌ কথার জবাবে কোন কথা বলল না।

এ সংসারের দিগন্তে এখন মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কণকলতা যতদিন আছেন ততদিন হয়তো এ সংসারের চাকা ঘূণ ধরে গেলেও একেবারে থেমে যাবে না কিন্তু তারপর?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর অলোকের জানা নেই। সেজ বৌয়েরও জানা নেই। বিছানায় শুয়ে অসুখের মধ্যেই কণকলতা একদিন বলেছিলেন, আমি থাকতে থাকতেই সংসার ভাগ করে দিয়ে যাব। যে যার হাঁড়ির দায়িত্ব নেবে। আমি আর এই ভার টানতে পারছিনে।

নরু একদিন সকালে এসে বলল, সেজবাবু ষষ্ঠী পাল আপনাকে খুঁজছে।

কোথায় সে?

নিচের কাছারিতে বসে আছে।

অলোক নিচে নেমে গেল, কি ব্যাপার পাল মশাই?

আপনার গাড়িখানা শুনলাম বিক্রি করবেন?

কে বলল?

কতো দেবেন?

ষষ্ঠী পাল হেসে বলল, আপনি যা বলবেন। আজই তাহলে গাড়িটা নিয়ে যাই। আমি একজন ড্রাইভারকে সঙ্গে করেই এনেছি।

দুর্ভিক্ষ আসছে তার চিহ্ন চারপাশে। শহরের এখানে ওখানে নিরন্ন মানুষের শীর্ণ মুখ চোখে পড়ছে।

গাড়িটা বেচে দিলে?

সেজ বৌয়ের গলাটা হতাশায় বুঁজে এলো।

হ্যাঁ, অলোক বলল, গাড়ি সাজিয়ে রেখে শুধু শুধু লাভ কি? তেল পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধ থামলে আবার নতুন গাড়ি কিনবো।

অলোক কথাটা বলল কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসের জোর ফুটলো না। সেজ বৌয়ের চোখ দেখেই বোঝা গেল যে কথাটা বিশ্বাস করেনি।

কদিন আগে রাত্তিরে অঙ্কের মাস্টার মশাই এর বাড়ি থেকে অঙ্ক কষে ফিরছিল পাপান। আসছে মাসে ফাইন্যাল পরীক্ষা। এক হাতে খাতা বই অন্য হাতে হ্যারিকেন। পাড়ার মধ্যে ঢোকার আগে একজনা তার নাম ধরে ডাকলো —।

পাপান দাঁড়াল, তুমি এখানে? কি বলছো?

ফুল্লরা। এখন ফুল্লরা আর আগের মতো মেয়ে নেই। শাড়িটারি পরে তাকে রীতিমত মহিলা বলে মনে হয়।

কি বলবে বলো?

কাঁসারি বাড়ির গঙ্গাদাকে যাবর সময় একটু বলে যাবি, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। যেন অবশ্যই আসে একবার।

গঙ্গাদা নিজেদের বাড়ির বাইরের দিকের ঘরখানায় সারাদিন বসে বসে পেতল কাঁসার বাসনে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে ঠুক ঠুক করে নাম লেখে। প্রতি অক্ষর পিছু এক আনা করে নেয়। বাসনে ফুললতাপাতা আঁকালে বেশী পয়সা লাগে। "আশীর্বাদ", "স্নেহের দান", "সুখী হয়ো", "পতি পরম গুরু" অথবা "শুভ গাত্র হরিদ্রা" এইসব লিখতে আধঘন্টাও লাগেনা গঙ্গাদার। হাতে কাজ না থাকলে জানলার পাশে হাঁটুতুলে বসে বিড়ি টান দেয়। নাক চোখ দিয়ে ধোয়া ছাড়ে। প্রতিদিনই পাপানের তার সঙ্গে দেখা হয়। কোন কোন দিন গঙ্গাদা যেচে কথা বলে।

তার মুখ থেকে দুর্গা ঠাকুরের চোখ দিয়ে জল বেরনোর গল্পটা পাপান এতবার শুনেছে যে তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

কণকলতা সেকথা শুনে পাপনকে বলেছিলেন, দূর বোকা, মাটির ঠাকুরের চোখ দিয়ে কি জল বেরতে পারে? ওটা বানানো গল্প।

ঠাকুমার মুখে এই কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল পাপান। সত্যি কণকলতাকে ঠিক বোঝা যায় না। অথচ এই মানুষটাই প্রতিদিন পাথরের গোপালের সামনে বসে ধ্যান করেন, নিজের সুখদুঃখের কথা বলেন, শান্তি প্রার্থনা করেন।

দুর্গা ঠাকুরের চোখ দিয়ে জল বেরনোর ঘটনার কথা শুনে কিন্তু মহিউদ্দিন চাচা অবিশ্বাস করেননি। বলেছিলেন, বাপ্‌ধন, সবকিছুই ঘটতে পারে। সংসারে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

আজকাল পাপানের প্রায়ই দুলাল মাস্টার মশাই এর কথা মনে হয়। মাস্টার মশাই এর মেয়ে চায়নাদির সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল তার। বিএ পাশ করার পর একটা মেয়েদের ইস্কুলে মাস্টারী করে। চায়নাদি অন্য মেয়েদের মতন নয়, একদম অন্যরকম। এ শহরে সেই প্রথম মেয়েদের মধ্যে সাইকেল চেপে ইস্কুলে যেত। এখনও সাইকেলে চেপে পড়াতে যায়।

এই চায়নাদিকেই একদিন গঙ্গার ঘরে দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিল পাপান। চায়নাদি এখানে নাম লেখাতে আসেনি। তাহলে?

ফুল্লরার গঙ্গাদাকে ডেকে দেবার কথা শুনে পাপানের মনে একটা জটিল প্রশ্ন বারবার উকি দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নটা যে ঠিক কি তাও পাপনের কাছে স্পষ্ট নয়। গঙ্গাদা, ফুল্লরা, চায়নাদি... এদের তিনজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাতে কষ্ট হচ্ছিল পাপানের।

কদিন পর অলোক বাইরে থেকে এসে সেজ বৌয়ের হাতে একটা খাম দিল, তোমার চিঠি।

আমার চিঠি —? আমাকে কে চিঠি দেবে?

খাম ছিড়ে ভেতরের চিঠি বার করলো সেজ বৌ। পড়লো। তারপর চিঠিখানা অলোকের হাতে দিল, আমার পিসতুতো দাদা লিখেছেন। বিহারের যেখানে একটা মস্তবড় সার কারখানা হয়েছে সেখানে অফিসারের চাকরি পেয়েছেন। আমাদের যেতে লিখেছেন।

অলোক চিঠিখানা পরপর দুবার পড়লো। তারপর খামসুদ্ধ চিঠিখানা বুকপকেটে রেখে বলল, তোমার এই দাদার কে কে আছে?

কেউ নেই। দাদা বিয়েই করেননি। ইঞ্জিনিয়ার হবার পর কতো মেয়ের বাবা ধর্ণা দিয়েছিল। কারুরু কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করেননি।

অলোকের দু আঙুলের মধ্যে সিগারেট পুড়ছিল। একদৃষ্টে সেজ বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে বলে উঠলো, চলো আমরা সবাই ওখানেই চলে যাই।

যাঃ — কি বলছো তুমি — সেজ বৌয়ের মুখখানা এক সেকেণ্ডের জন্যে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে আবার জীবনের রং ফিরে পেল।

ঠিকই বলছি, ওখানে কারখানা হচ্ছে, নতুন বসতি বসছে, নতুন মানুষ, নতুন সমাজ... আবেগে অলোকের গলার স্বর কাঁপছিল, ওখানে গিয়ে নতুন করে ভাঁটা খুলবো —।

আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করবো — আপত্তি করোনা। আমার মন বলছে, এখানে আমি যা করতে পারিনি, ওখানে গেলে পারবো। তোমাদের সুখে রাখতে পারবো।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো পাপান। অঙ্কর স্যার আজ পাটিগণিত বইয়ে দাগ দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, বাঁদরের বাঁশ বেয়ে দু ধাপ উঠে তিন ধাপ নেমে আসার অংকটা ফাইন্যালে আসতে পারে। এক একটা অংক আছে এত মজার। বার বার কষলেও পুরনো হয় না। পাপানের মনে হলো বাঁদরের অঙ্কটার সঙ্গে অনেকের জীবনের ভীষণ মিল আছে। অবণী জ্যেঠু, দীপংকর দাদু এমনকি তার দাদি কণকলতাও এই অংকটার মতন।

নীচে একতলায় নেমে যাবে ভেবেও ছাদে উঠে এলো পাপান। আজ আকাশে ছিটেফোঁটাও মেঘ নেই। বরঞ্চ ঝাঁক ঝাঁক তারার চুমকিতে আকাশখানা এই মুহূর্তে বেনারসীর আঁচল হয়ে আছে।

কাল আমার ফাইন্যাল পরীক্ষার শুরু — মনে মনে উচ্চারণ করে বলল পাপান — তারপর... তারপর পরীক্ষার শেষ... তারপর...?

পরদিন খুব ভোরবেলা অচেনা একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল পাপানের। এখনো ভালো করে রাত মুছে যায়নি আকাশ থেকে।

ঘুম চোখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল পাপান। অবাক হয়ে দেখল সমস্ত রাস্তাটা বরাবর ময়াল সাপের মতন লম্বা হয়ে পড়ে আছে বিশাল আকারের লোহার পাইপ। এ শহরে কলের জল আসবে এটা তারই প্রস্তুতি।

কী আশ্চর্য। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ কিছুই মানুষের গতিরোধ করতে পারে না। বোধহয় ভগবানও পারেন না মানুষকে বেধে রাখতে।

ভোরের নরম পবিত্র বাতাস এসে পাপানের চুল এলোমেলো করে দিল। গায়ে কাঁটা দিল তার।

(২৯)

ঠিক একমাস পরের এক সকালে পাপান একমুঠো ঘাসমাটি পেরিয়ে পরিচিত একটা দরজার সামনে গিয়ে ডাকলো জ্যাঠামশাই —

এসো শুভব্রত, আমি এখানে —

ভেতর থেকে ডাক পেয়ে অবণীর ইজিচেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল পাপান। বলল, একি জ্যেঠামশাই, আপনার হাতে —

তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না অবণী। বললেন, না শুভব্রত, এ বইখানা শেক্সপিয়ারের লেখা নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের বই।

আপনি গানও ভালবাসেন।

বাসি, গানের মধ্যে দিয়েই প্রাণের চেতনা-নদীর স্রোতকে ছোঁয়া যায় শুভব্রত।

হাতের বইখানা মুরিয়ে পাশে রেখে অবণী উঠে দাঁড়ালেন, আমি শুনেছি চলে যাচ্ছ তোমরা?

হ্যাঁ, কাল যাচ্ছি এখান থেকে। হাওড়ায় গিয়ে গাড়িতে উঠতে হবে।

অবণী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি এখন সামান্য বিষণ্ণ। উদাসীন। তাঁর একখানা হাত পাপানের কাঁধের ওপর।

পাপানের বুকের মধ্যে একটা নিশ্বাস ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেটা কোনো বেদনা বোধের যন্ত্রণাকর নিশ্বাস নয় বরং উল্টো। মনে হচ্ছিল — তার এই মুহূর্তে বুকের ঘূর্ণাবর্তটিতে কান পাতলে সমুদ্রের কলতান শুনতে পাওয়া যাবে।

চলি জ্যেঠামশাই, হেঁট হয়ে অবণীকে প্রণাম করলো পাপান, আবার আসবো।

বাইরে এসে জানলাটার সামনে একবার দাঁড়াল পাপান, যে জানলাটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো বীথি। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

(৩০)

হাওড়া হইতে ট্রেন ছাড়িবার পর পাপান ঘন্টার পর ঘন্টা জানলার পাশে বসিয়া প্রকৃতির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চতুষ্পার্শের দৃশ্যমান জগৎ তাহাকে আপন গর্ভে ধারণ ও লালন করিবার জন্য আহ্বান জানানোর ছলে ক্রমেই তাহাকে দূরে ঠেলিতে লাগিল। এক সময় সে ক্লান্ত হইয়া পকেট হইতে টিকিটের কাগজখানি বাহির করিল। কী আশ্চর্য তাহাতে শুভব্রত নামটি লেখা আছে। কে শুভব্রত — পাপান তাহাকে চিনিতে পারিল না।

(৩১)

ঠিক তিনমাস পর পাপান ডাকে তার নামে মেয়ের হাতে লেখা একখানা খামের চিঠি পেল। চিঠিতে লেখা আছে তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছ। আমার এত আনন্দ হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল তোমার কাছে ছুটে চলে যাই।

ইতি — তোমার

চিঠির নীচে কোন নাম নেই।

মনের মধ্যে মোহনা

কলকাতার নামী একটা কলেজের মেয়েদের হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আজ সকালে তিনজন মেয়ে হারিয়ে যাবে বলে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসেছিল। শহরের নানা পথ পেরিয়ে হলুদ ট্যাক্সিখানা সল্টলেকের যে রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল তার একদিকে পাঁচতলা বাড়ির সারি।

বাড়িগুলোর ঠিক উল্টোদিকে একটা পার্ক। দিনের এই সময় পার্কটা ফাঁকাই থাকে। আজও ফাঁকা। জনমানুষহীন। সবুজ ঘাসের গালিচায় একদল শালিক খুব শান্ত হয়ে বসে আছে। পার্কের উত্তরদিকে তিনটে বড় ছাতার মতন কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাদের মাথার ওপর আকাশে এখন রোদ্দুরের হাল্কা ছিটে।

ট্যাক্সিটা দাঁড়ানোর পর তিনটি তরুণী গাড়ি থেকে নেমে এলো এবং ট্যাক্সিওলা ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

যে ভাড়া দিল তার নাম গাযত্রী।

বয়স বাইশ। একটু কমও হতে পারে। পরনে সাদা রং-এর গলা ও হাতে এমব্রয়ডারীর কাজ করা সালোয়ার কামিজ। সঙ্গে দোপাট্টা।

গায়ত্রী বেশ ফর্সা। খুব লক্ষ্য করলে তার মুখে কোমলতার সঙ্গে একটু কাঠিন্যও চোখে পড়ে। চোখদুটো গভীর এবং প্রাণবন্ত।

গায়ত্রী পাঞ্জাবী তনয়া। এই শহরেই তার জন্ম। তার ফলে ঝড়ের মতো বাংলা বলতে পারে। এখন তার কাঁধে একটা ছোট ঝোলা ব্যাগ।

দ্বিতীয় মেয়েটির নাম কাজল। ছিপছিপে শরীর। চোখ মুখ মিলিয়ে একটা অন্য রকম লাবণ্য। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

কাজলের ছোট্ট কপালের মাঝখানে একটা মেরুণ টিপ। কাজল একটু চাপা স্বভাবের। কথা বলে কম। তার পরনে এখন হলুদ শাড়ি। সঙ্গে রং মিলিয়ে লম্বা হাতাব ব্লাউজ।

আন্নু অর্থাৎ অনুরাধা তৃতীয় মেয়েটির নাম। তিনজনার মধ্যে সেই মাথায় লম্বা। পাঁচ-ছয়। ছিলছিলে চেহারা। হাসলে গালে টোল পড়ে। মাথার চুল পিঠ ছাড়িয়ে। এখন বিনুনি করে বাঁধা। বিনুনিটা সাপের মতন পিঠের ওপর পড়ে আছে।

আন্নুব পরনেও সালোয়ার কামিজ। ওড়নাটা পাক দিয়ে গলার সঙ্গে জড়ানো।

যে কোন কারণেই হোক এই মুহূর্তে তাকে একটু উত্তেজিত এবং একই সঙ্গে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। তার হাতে একটা ছোট ব্যাগ।

এখন সময় সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি। আকাশে একটু আগের রোদের বদলে ছটফটে মেঘ। এতক্ষণ যে বাতাস বইছিল সেটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আন্নু বলল, উফ্ কি গরম লাগছে।

কাজ তার গরম লাগার কথা শুনে হাসলো। কথা বলল না।

গায়ত্রী বলল, তোর জন্যে একটা এ.সি. লাগানো বাড়ি খুঁজতে হবে।

কথাটা বলার পর সে ঝিরঝিরিয়ে হাসলো।

(২)

যে তিনজন তরুণীকে আমরা এতক্ষণ দেখলাম, অর্থাৎ গায়ত্রী কাজল আর অনুরাধা, তাদের এখানে আসার পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

বাড়ি যাবার নাম করে কলেজ হোস্টেল থেকে পালিয়েছে তারা। পালানোর বুদ্ধিটা গায়ত্রীর।

শুরুতে যা ঘটেছিল তা এই রকম।

কদিন আগে গায়ত্রী বন্ধুদের বলেছিল, ধ্যুৎ, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। দেখিস, একদিন ঠিক আমি হোস্টেল থেকে পালাবো।

আন্নু আর কাজল তার পালানোর কথা বিশ্বাস করেনি। তাও জিজ্ঞাসা করেছিল, এ্যাই, কোথায় পালাবিরে তুই?

জানি না।

তার মানে তুই প্রেমে পড়েছিস।

রাবিশ।

আন্নু বলেছিল, প্রেমে পড়লেই ছেলেমেয়েরা পালায়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে তার গালে টোল পড়েছিল। কাজল সিরিয়াস গলায় বলেছিল, তোর সঙ্গে আমরাও যাবো।

যাবি, ঠিক্ বলছিস যাবি?

আন্নু আর কাজল একসঙ্গে জবাব দিয়েছিল, যাবো—

আমরা কোথায় যাবো বলতো?

জানি না। জানিনা।

আমি জানি, গায়ত্রীর গলায় দৃঢ়তা। আমরা এখানেই থাকবো কিন্তু হোস্টেলে নয়।

এই শহরে! কি বলছিস তুই? কাজল আরো সিরিয়াস, এখানে থাকলে হেমামালিনী ঠিক আমাদের খুঁজে বার করে ফেলবে।

ঠিক বলেছিস। আন্নু বলেছিল, পুলিশের সঙ্গে হেমামালিনীর খুব ভাব।

পুলিশের সঙ্গে নয়। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, গায়ত্রী বলেছিল। ভদ্রলোক পুলিশে কাজ করেন।

অফিসার, গাড়ি হাঁকিয়ে আসে।

ভাঙা জিপ ওটা, ওকে গাড়ি বলে না।

দারুণ হ্যান্ডসাম কিন্তু—

তোর পছন্দ বুঝি—

ভাগ—গায়ত্রীর দিকে তেড়ে গিয়েছিল আন্নু। তারপর তিনজনের হিহি হাসি। অফুরন্ত।

(৩)

তারপর থেকেই তিন মেয়ে আনমনা।

পড়ায় মন নেই। ক্লাসে বসেও মন অন্য কোথাও উধাও। ক্লাসেই একদিন সকলের সামনে মিস মন্‌তা সিং গায়ত্রীকে যা-তা বললেন, কি হয়েছে তোমার, anything wrong...? দিন দিন তুমি যাচ্ছেতাই হয়ে যাচ্ছো গায়ত্রী। I have noticed that you are neglecting my class. পরদিন একই রকম বকুনি খেল কাজল আর আন্নু।

কলেজ থেকে হোস্টেল পায়ে হেঁটে তিন-চার মিনিট। রোজই তারা দলবেঁধে যায় আর আসে।

আজ কলেজ থেকে ফেরার সময় আন্নু বলল, নন্‌সেন্স।

কাকে বলছিস, হিস্ট্রি মিস্?

দূর, এই মুটকিকে কে পরোয়া করে। গায়ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়লো আন্নু, বলছি এই শহরের ছেলেগুলোকে।

কেন, তারা তোর কি পাকা ধানে মই দিয়েছে?

একশো বার দিয়েছে, এই দ্যাখনা আমরা তিনজনা, তিন সুন্দরী এবং যুবতী রোজ এই সময় এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হোস্টেলে ফিরি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হলে ফুচকা খাই। আইসক্রিম খাই। এক একদিন ভিড়ের সঙ্গে ধাক্কা খাই আর হাসি, গল্প করি এবং ঝগড়া করি তারপরেও—

তারপরেও কি?

আন্নু গালে টোল ফেলে বলল, তারপরেও কি কোনো ছেলে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে?

ঠিক বলেছিস তুই—

কাজ বলল, নিজের হাতে ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত একজনাও তোর কাছে কটা বাজে জানতে চায়নি।

আন্নু বলল, পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা হাল্কা খাম বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে এ পর্যন্ত কেউ তোকে অথবা গায়ত্রীকে বলেনি, উত্তর চাই কিন্তু—

আন্নুর গালে এখন আর টোল পড়লো না। গায়ত্রীর দুচোখের তারা দপ্ দপ্ করতে থাকলো। কাজল মাথা নিচু করে বলল, তুই ঠিক বলেছিস আন্নু, নন্‌সেন্স।

গায়ত্রী বলল, চল আমরা কালই পালাই।

কোথায় পালাবি?

কোথাও—

কাজল বিন বিন স্বরে দু লাইন কবিতা আওড়ালো—

কোথা নীড়। কোথা নীড়
নির্জন কোন্ কোনেতে দুজনা
হবো যে সন্নিবিড়।
আমি নীড় সন্ধানী
নিচে ধূসরিত পাষাণের রাজধানী
নীড় নেই। কোনো নীড় নেই—

কাজল থামার আগেই গায়ত্রী বলল, দীনেশ দাস?

হ্যাঁ।

আন্নুর মুখে লজ্জার রক্তিমাভা, এ্যাই, আমরা কিন্তু নীড় খুঁজছি না।

কাজল বলল, নির্জনতা খুঁজছি। যেখানে হেমামালিনী নেই। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ নেই—

গায়ত্রী বলল, প্রত্যেক হপ্তায় বাবার ফোন নেই। ভালো করে পড়াশোনা করো, রেজাল্ট ভলো হওয়া চাই কিন্তু—

কাজল বলল, না রে, "বুকের মাঝে লুকিযে থাকো দেখতে তোমায় পাইনি", আমরা বোধ হয় নীড়ই খুঁজেছি না জেনে।

তিনজনা একসঙ্গে হা হা করে হেসে উঠলো। পথচলতি মানুষ তাদের দিকে চকিত দৃষ্টি তুলে দেখতে দেখতে চলে গেল। একটা রাজহাঁস রং-এর ছোট্ট গাড়ি তাদের গা ঘেঁসে গেল। গাড়ির ভেতরে বসা খুব মোটা নাদুস নুদুস মাঝবয়সী মানুষটা তাদের দেখে হাসলো। হাসিটাতে কোন মলিনতা নেই।

কাজল বলল, লোকটার হাসিটা ঠিক আমার বাবার মতো। এরপর তারা

নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে একটি কথাও বলল না। বাকি পথটুকু নীরবে অতিক্রম করে এলো।

(৪)

কাজল আর গায়ত্রী একঘরে থাকে। পাশের ঘরে আন্নু।

মেয়েদের হোস্টেল বাড়িটা বড় রাস্তার ওপর।

তিনতলা। সামনে এককালে হয়তো সাজানো বাগান ছিল। এখন একটা বয়স্ক শিউলি গাছ ছাড়া সবটা ফাঁকা জমি।

সামনে গেট। গেটে সবসময় তালা থাকে না কিন্তু তার সঙ্গে লাগা দারোয়ানের ঘর থেকে দুটো সতর্ক চোখ সবসময় খেয়াল রাখে কে এলো কে গেল। সামনের লোহার গেটটা বেশ উঁচু। তার ফলে বাইরে থেকে ভেতরে চোখ যায় না।

দোতলায় টানা বারান্দা। তেতলায় কোনো বারান্দা নেই। তবু সামনের রাস্তা দিয়ে যারা যায় আসে তারা সময় থাকলে তেতলার দিকেই তাকাতে তাকাতে যায়। কারণ সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত অবধি তেতলার ঘরগুলোতে সুন্দরী ফাজিল মেয়েদের মাত্রা ছাড়া হাসি-গল্প মাঝে মাঝে ছিটকে বড় রাস্তা অবধি চলে আসে।

হাসি এবং গল্পের অফুরন্ত ফোয়ারা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় যখন দারোয়ান হরবচন দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিয়ে যায় কংসাবতী মেননের সাদা জিপসি মারুতিখানা গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

হোস্টেল সুপারিটেনডেন্ট কংসাবতী মেনন রীতিমতো সুন্দরী। আড়ালে মেয়েরা তাকে হেমামালিনী বলে ডাকে। কংসাবতীর তা অজানা নেই।

কলেজে মেয়েদের তিনি অঙ্ক শেখান আর অবসর সময়টুকু সারা শহর মারুতি জিপসিতে চেপে দাপিয়ে বেড়ান।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও এখনো অবধি কুমারী। মেয়েরা কংসাবতীকে ভয় করে, হিংসে করে, আবার ভালোও বাসে।

তাঁর ভেতরে একটা এলোমেলো ঝড়ের গতি আছে। কলেজের অন্য অধ্যাপকরা তাঁকে বলেন ফাগুন হাওয়া। আড়ালে নয়, সামনেই বলেন।

গাড়ি বন্ধ করে হরবচনের দিকে দৃকপাত না করে আজ সটান তেতলায় উঠে এলেন কংসাবতী। রাত এখন দশটা। মেয়েদের শুযে পড়ার কথা। তাও বেশির ভাগ ঘরেই এখনো আলো জ্বলছে।

গায়ত্রী, গায়ত্রী! কংসাবতীর ডাক শুনে সামনে এসে দাঁড়াল গায়ত্রী, আপনি

এত রাত্রে—?

তোমার ঘরে এখনো আলো জ্বলছে, কি করছিলে?

পড়ছিলাম।—

নিশ্চয় ফিল্ম ম্যাগাজিন?

ওগুলো আজকাল সিক্সের বাচ্চারা পড়ে ম্যাম—

তার পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন কংসাবতী। তোমার নামে অনেক কমপ্লেন শুনতে পাচ্ছি।

কথা বলতে বলতে কংসাবতী বিছানার ওপর উপুড় করে রাখা বইখানা তুলে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখলেন—ম্যাকবেথ—

শুয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি। রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে—

কংসাবতী দরজার কাছে যাবার আগেই গায়ত্রী বলে উঠলো, আমার বাবা আপনার কথা বলছিলেন।

তোমার বাবা, আই মিন—বাবার চিঠি পেয়েছ বুঝি—?

বাবার চিঠি! গায়ত্রী নিপাট অবাক হলো। আমার বাবা এখানেই থাকেন। আমাদের গ্যারেজ আছে। বাবা আপনার দারুণ ফ্যান—

Don't be silly গায়ত্রী। কংসাবতীর দুই ভ্রু ধনুকের মতো বেঁকে গেল।

বাবা বলেন, আপনি—

তোমার বাবা কি বলেন তা আমি জানতে চাই না।

গায়ত্রী বলল, আমার বাবারও আপনার মতো একই মডেলের জিপসি আছে তো, তাই বলেন যারা জিপসি পছন্দ করে তারাই কেবল গাড়ি চেনে—

তোমার বাবাকে আমার thanks জানিও—। Good night—

কংসাবতী দ্রুত নিচে নেমে গেলেন।

গাড়িখানা রাস্তায় অদৃশ্য হবার আগেই আন্নু দৌড়ে এসে গায়ত্রীর ঘরে ঢুকলো—এই হেমামালিনী কি বললো রে?

গাযত্রী বিছানায় লুটিয়ে পড়ে হাসছিল। তার কথার জবাব দিতে পারলো না। আন্নু তার পিঠে কিল মেরে বলল, তুই নিশ্চয়ই তোর বাবার গল্প বলেছিস্?

পরদিন সকালে উঠে চা খেতে খেতে গায়ত্রী বলল, আমরা আজ কলেজ যাচ্ছি না।

কাজল বলল, আজই তাহলে—

আন্নু নিঃশ্বাস বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

গায়ত্রী তার কাঁধে হাত তুলে দিল, আজই পালাবো আমরা।

আর কোনোদিন ফিরে আসবো না?

আসবো। আমরা কি চুরি-ডাকাতি করে পালাচ্ছি নাকি যে আর কোনোদিন ফিরে আসবো না। তুই মাঝে মাঝে এমন ন্যাকার মতো কথা বলিস কেন রে?

কাজল বলল, আমরা কিন্তু হোস্টেল থেকে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে তারপর ট্যাক্সিতে উঠবো।

Good suggestions—গায়ত্রী বলল, কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কি বলবি?

বলবো, এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে কাজল উত্তর দিল, ঋত্বিক রোশনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। একটা কাগজ লিখেছে দেখলাম ঋত্বিক রোশন কাল কলকাতায় আসছে।

ভাগ্। আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আন্নু কথা বলতে বলতে অভ্যাস মতন ঘাড় তুলে তাকালো। এই তাকানোটা এতই সুন্দর যে গায়ত্রী টপ্ করে তার গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, আমার তোকে নিয়ে পালাতে খুব ভয় করছে রে আন্নু।

(৫)

আগের দিন কাজল বলেছিল, চল্ আমরা একটা জায়গায় যাই—

কোথায়, কোথায় বল শিগগির?

সল্টলেক—

সল্টলেক নামটা মুহূর্তের মধ্যে তিন মেয়ের নয়নের মণি হয়ে বুকের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

সামান্য পরে কাজল বলেছিল, সল্টলেক কোথায় তুই চিনিস?

গায়ত্রী বলল, কাছেই।

আন্নু বলল, কাগজে পড়েছি ওখানে সব বড়লোকরা থাকে।

কাজল বলল—তারা নাকি ভীষণ ন্যাকা।

আলমারি টারি খুলে রেখেই সিমলা, দার্জিলিং বেড়াতে চলে যায়। তারপর চোররা এসে একটুও পরিশ্রম না করে খোলা আলমারি থেকে হীরের গহনা টহনা নিয়ে পালায়। তারপর পুলিশ রেচারাদের ভীষণ ভীষণ পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে এবং প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে হীরের চোরকে ধরতে হয়।

ধ্যাৎ—আন্নু গুনগুনিয়ে বলল, এই কথাটা তুই স্বপ্ন থেকে বললি। চোরটোর ধরা পড়েছে কখনো শুনেছিস?

ওখানে ধরা পড়ে, কাজল জিদ করে বলল। কেন জানো, চোররা নিজেই এসে ধরা দেয়।

কারণ—

কারণ—এবার গায়ত্রীও নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে কাজলের দিকে তাকালো।

কারণ হীরেটিরে সব নকল।

তিনজনা একসঙ্গে হেসে ফেলল।

ইতিহাস পড়ানো থামিয়ে ভারতী সিন্‌হা চেঁচিয়ে উঠলেন, এই, এই মেয়েরা, you last bench grils. তোমরা অতো হাসছো কোন? বলো শিগগির, অতো হাসছো কেন তোমরা?

গায়ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সম্রাট জাহাঙ্গীর বড্ড ন্যাকা ছিলেন—

—জাহাঙ্গীর! What do you mean! জাহাঙ্গীর কোথায় পেলে... আমি তো invation of Alexender পড়াচ্ছি—

সামনের বেঞ্চ থেকে মৈত্রী উঠে দাঁড়ালো—

ম্যাম, গায়ত্রী ঠিক বলেছে, আলেকজান্ডারও তাই ছিলেন।

তাই—তাই মানে কি?

ওই যে গায়ত্রী যা বলল, ন্যাকা—।

Do you know moitri he was a great soldier—মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে—

মাঝামাঝি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল কান্তা—। বলল, ন্যাকা না হলে কেউ ম্যালেরিয়ায় মারা যায় না ম্যাম।

Alexnder ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছিলেন একথা কোথায় লেখা আছে? ভারতী সিন্‌হার মুখে রাগে থমথম কবছে। পরক্ষণে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, Welcome girls, তোমরা যদি এটা আবিষ্কার করতে পারো যে Alexender ম্যালেরিযায় মাবা গিয়েছিলেন তাহলে...তাহলে...বই বন্ধ করে ভারতী হন হন করে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

(৬)

জামাকাপড় গোছাতে তিন মিনিট। ঠিক তিন মিনিট। বুকের মধ্যে কাঁপছে। অকারণে ভারি হয়ে আছে মনটা। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বিছানার ওপর আলুথালু হয়ে বসে পড়লো আন্নু।

বিছানাটার জন্যে মন কেমন করছে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। কোনো দিনই হয়তো আর ফেরা হবে না এখানে।

নিঃশব্দ পায়ে গায়ত্রী আন্নুর ঘরে এলো, কি রে রেডি?

হ্যাঁ।

ভয় লাগছে নাকি?

না, নাহ—।

মন কেমন করছে?

আন্নু ঘাড় ঝাঁকালো, কথা বলল না।

এই কার জন্যে মন কেমন করছে রে তোর, গায়ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি জানি তোর কেউ নেই।

মেয়েরা বিশেষ একটা শব্দকে এমনভাবে উচ্চারণ করে যে সারা বিশ্ব পলকে রামধনুতে ভরে যায়।

আন্নু তার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলো। তারপর হাসলো, তুই আমার কি জানিস?

সব জানি—সব। আমাদের ইংরিজির প্রদ্যোৎ স্যার তোকে একবার দামি বিদেশি সেন্ট পাঠিয়েছিলেন, তুই সেটা আমাদের গাট্টু সিংকে দিয়ে দিয়েছিলি।

এতো সবাই জানে, আন্নু উঠে দাঁড়াল, কাজল রেডি—?

এ্যাই কাজল কি করেছে জানিস?

কি করেছে?

গায়ত্রী হাসলো, চারটে ছোট জামা নিয়েছে।

আন্নু তার পিঠে একটা কিল মেরে বলল, তুই একটা বদমাস।

এই বদমাস ছেলেদের বলে। আমি কি ছেলে, আমায় বললি—

তিনজনা হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এলো। চুপচাপ।

গাট্টু সিং তার ঘরে বসে রুটি বানাচ্ছে।

রাস্তায় যেতে যেতে গায়ত্রী বলল, তোরা দুজনা আমার planটা শুনেনে। আমরা প্রথমে গিয়ে সল্টলেকে নামবো। তারপর তিনজনা তিনটে বাড়ি ম্যানেজ করে ঢুকে পড়বো।

ঢুকতে না দিলে?

কাজলের কথায় গায়ত্রী রেগে গেল—স্টুপিড। যে ভাবেই হোক ম্যানেজ করতে হবে। কিন্তু মনে থাকে যেন আমাদের সত্যি নামটা আর পরিচয় কাউকে

বলবো না। সাতদিন পর আমরা আবাব হোস্টেলে ফিরে আসবো। দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে।

কাজল বলল, আমরা এতদিন এই শহবে আছি অথচ কাউকে চিনিনা, কি অদ্ভুত না।

আন্নু বলল, এই, সন্ধ্যের পরেও আমরা ফিরছি না দেখে হেমামালিনী কি করবে বলতো?

গায়ত্রী বলল, আগে গাট্টু সিং-এর ঝাড়পোঁছ হবে তারপর লালবাজারে ছুটবে।

কাজল বলল, একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার আছে দারুণ হ্যান্ডসাম... তোরাও দেখেছিস, মাঝে মাঝেই হেমামালিনীর কাছে আসে—

আন্নু বলল, আমি দেখিনি—

ঠিক আছে, হেমামালিনীর সঙ্গে ওর এনগেজমেন্টের সময় দেখে নিও—

ওমা, ওরা বুঝি—

গায়ত্রী বলল, এ্যাই চুপচাপ..., এই যে ট্যাক্সি—ট্যা-ক্সি-

চলন্ত ট্যাক্সিওলা জানলা দিয়ে তাদের দেখেও দাঁড়াল না। গায়ত্রী ঠোঁট মুচরে একটা ইংরিজি শব্দ উচ্চারণ করলো—পটাসিয়াম।

ওরা যখন ট্যাক্সি খুঁজছে তখন একটা বিপদ ঘটলো। দেখা গেল উল্টোদিক থেকে শিপ্রা আসছে। তাদের সঙ্গে একই হোস্টেলে থাকে সে।

কাছাকাছি এসে শিপ্রা দাঁড়িয়ে পড়লো, ওমা তোরা?

গায়ত্রী বলল, হ্যাঁ আমরা—

কোথায় যাচ্ছিস রে?

ঋত্বিক রোশনের কাছে—।

সত্যি! শিপ্রা বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে দুলতে দুলতে বলল, কই সকালে তো কিচ্ছু বলিসনি।

ঋত্বিক বারণ করে দিয়েছিল, কাজল অম্লান মিথ্যেটা বলে গেল, বলেছিল বেশি মেয়েরা গেলে দেখাই করবে না। রাত্তির দুটোর সময় আন্নুকে ফোন করেছিল, জিজ্ঞেস করে দ্যাখ ওকে—

ফোন...ফোন..., আমাদের ঘরে তো

আন্নুর দাদার সেলফোনটা এখন ওর কাছে থাকে। ওর দাদা তো হল্যান্ড গিয়েছে। তাই—

এই ঋত্বিক—বুঝি—

তুইও যা না ওর কাছে। তাজবেঙ্গলে উঠেছে। কালই চলে যাবে আবার।

গায়ত্রী বলল, চল্ চল্, চলিরে শিপ্রা। হেমামালিনী জিজ্ঞেস করলে বলিস আমরা সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসবো।

কিছুদূর যাবার পর আবার দাঁড়াতে হলো তাদের।

দেখা গেল শিপ্রা দৌড়তে দৌড়তে তাদের দিকেই আসছে।

কিরে, কি হলো আবার—কাজল বলল।

শিপ্রা হাঁফাচ্ছিল। নিঃশ্বাস টেনে বলল, আমার একটা কাজ করবি, Please—

কি কাজ—শিগগির বল।

আমার এই রুমালটা ঋত্বিকের গায়ে একটু ছুঁয়ে আনবি।

ঠিক আছে, দে তোর রুমাল।

শিপ্রার হাত থেকে গায়ত্রী ছোঁ মেরে রুমালখানা নিয়ে বলল, এবার যা, ভাগ—

(৭)

চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে কাজল বলে উঠলো, ওমা, এতো আমাদের কলকাতার মতনই। তাহলে যে লোকে বলে সল্টলেক অন্যরকম?

গায়ত্রী বলল, অন্যরকমই তো, কোনো বাড়িতে রক্ নেই দেখেছিস?

তাই তো! তাহলে এখানকার ছেলেগুলো আড্ডা দেয় কোথায় বসে?

আড্ডা দেয় না।

গায়ত্রীর কথা শুনে ঠোঁট বেঁকাল কাজল, আড্ডা দেয় না, তাহলে কি করে?

গাড়ি চড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর রাস্তায় সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বলে, আসুন না, আপনাকে পৌঁছে দিই।

কাজল বুঝতে পারলো গায়ত্রী এতক্ষণ তার সঙ্গে ঠাট্টা করছিল। আন্নু একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতে পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার দিকে তাকিয়ে গায়ত্রী বলল, শোন, আমরা যেখানেই থাকি রোজ দুপুরে এই পার্কে আসবো। এখানে আমাদের কথা হবে। আর কারুর যদি খুব অসুবিধে হয় সে সোজা হোস্টেলে ফিরে যাবে। O.K.?

কথার পর গায়ত্রী বাড়িগুলো দেখতে দেখতে বলল, আন্নু, তুই এদিকটাতে যা, আমি প্রথমে ওই চারতলা বাগানওলা বাড়িটাতেই ট্রাই করবো।

কাজল পা বাড়িয়ে বলল, best of luck.

আন্নু দুপা এগিয়ে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে বন্ধুদের দেখলো। হাত নেড়ে বিদায় জানালো। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

হোস্টেল থেকে বেরনোর মুহূর্তে যে সাহসটুকু ছিল এখন তার বদলে অনিশ্চয়তাব উৎকণ্ঠা। জীবনে কখনো এইভাবে একলা তাকে আশ্রয়ের খোঁজে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়নি।

হোস্টেলেব ঘবখানা, বাড়ি, বাবা মার কথা মনে পড়ছিল। এবং তারই মধ্যে তার হঠাৎ মনে হলো, দুর, এইভাবে না এলেই হতো।

দিদি, আপনি কি কোনো ঠিকানা খুঁজছেন—? একটা লাল রং এর মারুতি। চালকের আসনে বসা প্রশ্নকর্তার বয়স বছর কুড়ি। চোখ দুটোতে সাহায্য করার আগ্রহ। এই চোখকে বিশ্বাস করা যায়।

মনে মনে বলল আন্নু। কিন্তু মুখে বলল, না। ছেলেটি গাড়ি চালিযে চলে যেতে যেতে আবার দাঁড়াল। বলল, আমি আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি, আপনি ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছেন না। জানেন, আমার মা এখনো একলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বাড়ি আসতে পারে না।

আন্নু হাসলো। তার গালে টোল পড়ল।

বলল, থ্যাংস—

সাদা পাজামা, পাঞ্জাবী আর চোখে গোলফ্রেমের চশমা। আর দ্বিতীয় কথা না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

এক মিনিট মাথা নিচু করে হেঁটে এলো সে। তারপর চোখ তুলল।

সামনেই মস্ত বড় একটা ফ্ল্যাট বাড়ি।

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ—হ্যাঁ পাঁচতলা।

একতলায় অনেকগুলো গাড়ি এলোমেলো করে রাখা আছে। দোতলার বারান্দায় বাচ্চাদের রঙিন ফ্রক আর সার্ট প্যান্ট মেলা রয়েছে।

বাচ্চা খুব ভালো লাগে আন্নুর। কিন্তু এখন কেন যেন হঠাৎ তার লজ্জা পেল। না দেখেই বুঝতে পারলো তার গাল লাল হয়ে যাচ্ছে।

নাহ্—আবার পা চালাল সে।

এবারও চারতলা বাড়ি। একতলার গাড়ির জটলা। বারান্দার গ্রিলগুলো একদম নতুন ডিজাইনের।

ছোট্ট ব্যাগটা কোলের কাছে নিয়ে এক সেকেন্ড চোখ বুঁজে ভাবলো সে। তারপর আবার এগিয়ে গেল। এবং দশ পা গিয়েই দাঁড়াল—দোতলার বারান্দায় একটা খাঁচার মধ্যে ময়না পাখি।

পাখিটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে চেনা একটা বাতাস পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। ঠাকুরমারও ঠিক এই রকম একটা ময়না ছিল। রোজ ঘি দিয়ে ছাতু মেখে তাকে খেতে দিতেন ঠাকুমা।

এক নিঃশ্বাসে দোতলায় উঠে এলো সে। তারপর হাত তুলে কলিংবেলটা ছুঁলো।

ভেতরে জলতরঙ্গের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা হাল্কা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে দরজার দিকে।

আন্নুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। হৃৎপিন্ড থেমে থেমে চলছে।

পরমুহূর্তে খোলা দরজার ওদিকে একটি বৃদ্ধের হাসি মুখ—কাকে চাই মা?

কৌশিককে একটু ডেকে দেবেন?

একবারও ঢোক না গিলে ডাঁহা মিথ্যে কথাটা বলে গেল আন্নু, বলুন ওর দিদি ডাকছে।

বৃদ্ধ একটু থমকে গেলেন। তবু তাঁর মুখের হাসিটা লেগেই থাকলো, কৌশিক—কৌশিক বলে তো কেউ এখানে থাকে না।

এটা সতেরো নম্বর সি.এফ. নয়?

হ্যাঁ।

তাহলে—অল্প চেষ্টাতেই আন্নুর মুখে চোখের আলো নিভে বিষণ্ণতা ঘন হলো—কিন্তু ওতো এখানেই—মানে...

কি নাম বললে?

কৌশিক। কৌশিক মিত্র। লম্বা। এই—এই পাঁচফুট দশ এগারো...খুব ভালো ফুটবল খেলে। একটানা কথা বলে নিঃশ্বাস নিল আন্নু। বৃদ্ধ এখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আন্নু মনে মনে দ্রুত হিসেব নিকেষ করে নিল। যারা পাখি পোষে তারা দয়ালু হয়। তারা কখনো কাউকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয় না।

তুমি কোথা থেকে আসছো মা?

কৃষ্ণনগর।

হুম,—তোমাকে তোমার ভাই এই ঠিকানার কথা বলেছে?

হ্যাঁ—কদিন আগেই চিঠি পেয়েছি। ইস্ চিঠিটা যদি সঙ্গে আনতাম—গলা থেকে ওড়না টেনে নিয়ে মুখ মুছলো আন্নু। কাঁধ থেকে ব্যাগটা হাতে নিল, ঠিক আছে, আপনাকে শুধু শুধু ডিসটার্ব করলাম, সরি—

দাঁড়াও—বৃদ্ধের পেছনে একটি মহিলার মা মা মুখ। ছোট্ট কপালে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে টকটকে লাল সিঁদুরের টিপ। গালের সঙ্গে লেগে আছে কগাছা খুচরো চুল। অবিকল মার মতন।

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলে ঠিক এই রকম দেখায়।

হঠাৎ আন্নুর বুকের মধ্যে মন কেমন করা উঠে আসছে। দুচোখ ছল ছল।

মহিলা বললেন, তখন থেকে কাকে পুলিশি জেরা করছিলে...ওমা...কি মিষ্টি মুখখানা...আহা...এসো এসো, ভেতরে এসো তুমি—

বৃদ্ধ নিরুত্তরে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। আন্নু তাও বাইরেই দাঁড়িয়ে।

ও কি, দাঁড়িয়ে আছো কেন ম, বৃদ্ধা তার হাত ধরলেন। কোথায় তোমার বাড়ি বললে, কৃষ্ণনগর...ওখানকার কলেজে পড়েছি আমি...বাবার বদলি হয়ে যাবার পর...

আন্নু ভেতরে পা দিয়েও দাঁড়াল—আমি মানে আপনাদের এই অসময়ে...এখন শেয়ালদা থেকে একটা ট্রেন...

হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঘরের ভেতর এনে বিছানায় বসালেন উদ্ধারকর্ত্রী। বললেন, তোমার নাম কি—?

অনুরাধা—আন্নুর ঠোঁটে হাসির আলোছায়া, গালে টোল।

আমি তোমাকে এখন কিছুতেই যেত দেব না, বৃদ্ধা টপ্ করে তার গালে একটা চুমু খেলেন। বললেন, আমার ছেলে ফিরে আসুক। সেই তোমার ভাইকে খুঁজে দেবে। এই রাত্তিরে একা একা কোথায় যাবে?

এখনো তো সন্ধ্যেই হয়নি,—

বৃদ্ধর পদশব্দ ঘরের বাইরে এসে থামলো, কইগো, তখন থেকে শুধু গল্পই করছো, ওকে কিছু খেতে দাও—

না না, আন্নু চট্ করে উঠে দাঁড়াল, আমার একটুও খিদে পায়নি।

পেয়েছে—বৃদ্ধা বললেন, আমাকে তুমি কি বলে ডাকবে বলতো,—ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন, তোমার যা ইচ্ছে তাই বলে ডেকো। আমি কিছু মনে করবো না।

দরজার ওদিকে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। আন্নু খাটের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে নিজের মনের মধ্যে ডুব দিল—

এখন নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে করছে না সে বানিয়ে বানিয়ে এতো কথা বলতে পারে। গায়ত্রী আর কাজল শুনলে অবাক হয়ে যাবে। তাদের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকখানা মুচরে উঠলো তার—ওরা দুজন কি করছে কে জানে।

ইস্—হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল নিজের আসল নামটাই বলে ফেলেছে সে। গায়ত্রী বারবার নিষেধ করেছিল তাকে।

মাসীমা ঘরে এলেন...।

মাসীমা—মাসীমা—মাসীমা—মনে মনে আওড়ে নিল আন্নু।

মাসীমার হাতে কাঁসার থালায় লুচি, পটল ভাজা, বাটিতে আলুর দম।

ছোট টেবিলটা টেনে সামনে আনার আগেই আন্নু হাত বাড়িয়ে থালাখানা নিয়ে নিল, টেবিল লাগবে না। আপনি বসুন মাসীমা।

বাড়ির কর্তা ঘরে এলেন। ইতিমধ্যে পাজামা ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে নিয়েছেন। বললেন, এখানে একটা ক্লাব আছে। ফুটবল-টুটবল খেলে ছেলেরা। তারা হয়তো তোমার ভাইকে চিনতে পারে। একবার তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখি। তোমার ভাইয়ের নাম তো কৌশিক?

আন্নু ঘাড় নাড়লো।

তুমি বাড়িতে একটা ফোন করে দিও মা। তাঁরা হয়তো ভাববেন। পাশের ঘরে ফোন আছে।

আন্নু বলল, আমাদের বাড়িতে ফোন নেই।

থালা থেকে লুচি তুলে নিয়ে মুখ দেবার আগে আবাব বলল, বাবা জানেন আজ আমি ভায়ের কাছে থাকবো। না ফিরলে ভাববেন না।

আন্নুর সদ্য পাওয়া মাসীমা বললেন, শোনো, যখন এসেই পড়েছে, অনুরাধা কদিন আমাদের কাছে থাকবে। তুমি এক কাজ করো, ওর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। হঠাৎ লুচি পটল ভাজার টুকরো আন্নুর গলায় আটকে যাবার মতো হলো। কাশতে থাকলো সে। মাসীমা দুহাতে তার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথায় ফুঁ দিতে দিতে বললেন, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

এই ফ্ল্যাটে মোট তিনখানা ঘর। দক্ষিণ খোলা। বারান্দায় দাঁড়ালে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। বাড়িটার পেছন দিকে অনেক গাছপালা। একটা ছাতার মতন প্রকান্ড গাছে আন্নুর অচেনা ফুল ফুটে আছে।

মাসীমা খাবার ঘরে ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে তার জন্যে ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম বার করেছিলেন। সেইভাবেই বললেন—সন্দীপ কালই ফিরে আসবে—।

সন্দীপ—আন্নু ফুলভর্তি গাছটা থেকে চোখ সরিয়ে আনলো।

ওমা, তোমায় বলিনি বুঝি, আমার ছেলে।

ও, আন্নুর চোখের মণি কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকলো, তিনি বুঝি এখানে নেই?

না, বহরমপুর না কোথায় যেন গিয়েছে।

খাবার ঘরে একটা গোল পাথরের টেবিল। চারপাশে চারখানা লাল রং-এর ফোল্ডেড প্লাসটিকের চেয়ার। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ফুলদানিতে রাখা রজনীগন্ধাগুলো বাসি হবার জন্যে মলিন দেখাচ্ছে। তাও সেগুলো ফেলে দেওয়া হয়নি।

জানলায় কাঠের বদলে কাচের পাল্লা। বাইরে একতলার কার্নিসে একটা শালিক আর একটা কাক পাশাপাশি বসে আছে। রাস্তা দিয়ে মাথায় ঝুড়ি ভর্তি স্টিলের বাসন নিয়ে একটা বাসনউলি চলে গেল। তার সঙ্গে তার কালো কুচকুচে ছেলে।

মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে এ ফ্ল্যাটে পা রেখেছে আন্নু। চারপাশে দেয়াল আর মাথার ওপর একটা ছাদ—শুধু এই নির্ভরতাটুকু নিয়েই মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না। ভালবাসা নামের এই অদেখা অজানা বস্তু না পাওয়া অবধি তার স্বস্তি নেই।

একটু আগে যিনি কৌশিককে খুঁজতে গেলেন আর এই মুহূর্তে যিনি আন্নুর জন্যে ব্যস্ত হয়ে আইসক্রিম বার করছেন তাঁদের দুজনার চোখেই ঐ মহার্ঘ বস্তুটি আবিষ্কার করেছে আন্নু। এখন এ সংসারের তৃতীয় জন, যার নাম সন্দীপ, যার কথা এইমাত্র শুনলো সে... তার চোখে দুটো না দেখা অবধি আন্নুর মন কাঁটা হয়ে থাকবে। তার এই আশ্রযের আয়ু কতোটুকু তার হিসেব না মেলাতে পারলেও আন্নু বুঝতে পারলো আজ রাতটুকুর জন্যে সে নিশ্চিন্ত। আঃ—কি শান্তি, বারান্দায় এসে ময়নার খাঁচাটা হাতের ছোঁয়ায় ঘুরিলে দিল সে।

তার একটু পরেই ফিরে এলেন স্বরাজ। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গম্ভীর গলায় বললেন, অনুরাধা কই, অনুরাধা—

এই যে মেসোমশাই, আমি এখানে—বেণী দুলিয়ে দৌড়ে এলো আন্নু, ভাইয়ের খোঁজ পেলেন?

নাহ্, ওরা বলতে পারলো না কিছু। হয়তো পাশের ব্লকে আছে। ওখানেও একটা বড় ক্লাব আছে। কলকাতায় যায় মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলেরও সঙ্গে ম্যাচ খেলতে।

থাক্, আপনাকে অতো কষ্ট করে খুঁজতে হবে না। আমি কাল ফিরে যাবো। আন্নু কথাটা শেষ করার আগেই তার বুকের মধ্যে তীব্র একটা আশ্চর্য হওয়া তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় বিদ্ধ করে দিল।

ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ানো মাসীমার দুচোখের কোলে দুফোঁটা অশ্রু চিক্ চিক্ করছে।

আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোর দিকে তাকালোই না কাজল। অনেকখানি রাস্তা পার হয়ে এসে লালটালি ছাওয়া একটা বাংলোর সামনে দাঁড়াল। গেটের পাশে সাদা পাথরের বাড়িটার নামে খোদাই করে লেখা—"পাখির বাসা।"

ভারি অদ্ভুত নাম তো বাড়িটার। আপনমনে হাসলো কাজল। এর মালিকও নির্ঘাত বিচিত্র ধরনের হবেন।

গেটের কোথাও কোনো তালাচাবির চিহ্নও নেই। ঠেলতেই হাট হয়ে খুলে গেল। ঘন সবুজ ঘাসের লন অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ডান দিকে একটা মাঝারি আকারের ম্যাগনোলিয়া, এখন সিজন নয় বলে গাছে একটাও ফুল নেই। তার পাশেই একটা ঝুপড়ি পাতার লম্বা একহারা গাছ।

আহ্—হাততালি দিতে ইচ্ছে করলো কাজলের। এই গাছটাও তার চেনা। তেজপাতা গাছ। গত বছর শিলিগুড়িতে মামাতো দাদার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে তেজপাতা গাছ দেখছিল সে। লনটার পাশ দিয়ে বাড়ির পোর্টিকো অবধি লাল মোরামেব রাস্তা।

হাঁটতে হাঁটতে কখন বাড়িটার কাছটাতে চলে এসেছে তা বুঝতে পারেনি কাজল।

কিরে বাবা, ভূতের বাড়ি নাকি এটা... কাজল মনে মনে বলল, এতক্ষণ ধরে সে এখানে আছে অথচ একজনারও দেখা পায়নি।

মানুষের জন্যে এপাশ ওপাশ তাকালো সে। কেউ কোথাও নেই।

না আছে। টানা বারান্দার ওপর সার সার সাজানো বেতের চেয়ারের একটাতে প্রকান্ড একটা লোমওলা কুকুর নিঃশব্দে বসে তাকেই লক্ষ্য করছে। কুকুরটা নড়ছে না চড়ছে না, ডাকছেও না। অথচ কাজল এ বাড়ির কেউ না। এমনকি সে মালিকের অনুমতি না নিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বারান্দার ওপর উঠবে কি উঠবে না ভাবতে ভাবতে শেষ অবধি উঠেই পড়লো সে।—ইস্, এক্ষুনি বারান্দায় তার পা পিছলে আলুর দম হয়ে যাচ্ছিল। কুকুরটা এখন আড়মোড়া ভাঙছে। এই ধরনের কুকুরগুলোর কি নাম তা জানতো সে কিন্তু এখন কিছুতেই মনে আসছে না।

পর পর চারখানা ঘর। দরজায় সিল্কের দামি পর্দা দেওয়া। পর্দায় ডানা মেলা উড়ন্ত পাখির ছবি।

কিরে বাবা, এ বাড়ির মালিক মানুষটার পাখি নিয়ে এতো মাতামাতি কেন!

মজাই লাগছিল কাজলের। এমন সময় সেই ঘটনাটা ঘটলো—টুনটুনি পাখির মতন চিকন গলায় কে যেন অদৃশ্য থেকে তাকে আন্টি-ই বলে ডেকে উঠলো।

কাজল চনমনে চোখে চারপাশে তাকালো। কেউ কোথাও নেই। সমস্ত বাড়িটা শব্দহীন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কাজলের ভূতের ভয় নেই। ডাকাতের ভয় নেই, এমনকি জলে ডুবে যাবারও ভয় নেই—শুধু স্তব্ধ সন্ধ্যায় সরসরিয়ে গাছের পাতা নড়লে কোথা থেকে যেন তার বুক জুড়ে একটা দুর্বোধ্য ভয় উঠে আসে।

আ-ন্টি-ডাকটা আবার। এবার আরো স্পষ্ট। দ্রুত পায়ে একটা দরজা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। একটানে দরজার পর্দা সরিয়ে ফেলল—নাহ্, কেউ কোথাও নেই। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

কেউ আছেন—বাড়িতে কেউ আছেন...hello! কে আছেন বাড়িতে—

কাজলের গলার শব্দ বাতাসে ভর করে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যাচ্ছে। একবার...দুবার...তিনবার...তাও কোনো সাড়া এলো না।

নীরবে বারান্দা থেকে নেমে এলো সে। হাত তুলে বাড়িটার উদ্দেশ্যে বলল, সরি, তোমাকে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল কিন্তু তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না বলে ফিরে যাচ্ছি আমি। Good bye.

হেঁটে কাজল গেট অবধি আসা আগেই আর একটা ঘটনা ঘটলো। একটা প্রকাণ্ড কালো রং-এর গাড়ি গেটের বাইরে এনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে স্যুট-টাই পরা একটি যুবক নেমে সোজা তার দিকেই এগিয়ে এসে বলল, এই যে কতক্ষণ এসেছেন? বাড়ি চিনে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো...? আমি আপনাকে আনার জন্যেই স্টেশনে গিয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে মানুষটি কাজলের ব্যাগটা তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো, আসুন, ভেতরে যাই।

যে মানুষটা তাকে সরাসরি ভেতরে যাবার জন্যে ডাকছে তাকে আগে কোনদিন দেখেইনি কাজল। নিশ্চয় কোথাও একটা মস্ত ভুল থেকে যাচ্ছে।

কাজল বলল, আপনি কি আমাকে—

চলুন, ভেতরে চলুন আগে, তারপর যা বলার আছে বলবেন। মানুষটি যেতে যেতে দাঁড়াল, আমার নাম অর্জুন। আপনার আমাকে স্যার-ট্যার বলার দরকার নেই।

কাজল তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

একটু আগেই এই বাড়িটা তাকে এতো গভীর ভাবে টেনেছিল যে তার মন বলছিল—এখানেই থেকে যাই। অথচ এখন ডাক আসার পরে তার মনে হচ্ছে এই হাতছানি অন্য কারুর জন্যে—সে অন্য কাউকে ঠকিয়ে নিচ্ছে।

নিজের মনকে বলল সে, আজকের রাতটুকু শুধু সব ভুলটুল উপেক্ষা করে থেকেই যাই এখানে। কাল অন্য কোথাও চলে যাবো। গুনগুন করে গাইল—"হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন্ খানে।"

এটা আপনার ঘর—দেখুন পছন্দ হয় কিনা—, অর্জুন ঠিক একই রকম পাখির ছবিওলা পর্দা সরিয়ে একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

ছোট একটা টেবিলে তার ব্যাগটা নামিয়ে রাখার পর বলল, এ.সি.টা একটু ট্রাবল দিচ্ছে, খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, কাল এসে সারিয়ে দিয়ে যাবে। শুধু আজকের রাতটুকু আপনার একটু কষ্ট হবে।

কথা বলতে বলতে অর্জুন হেঁট হয়ে এ.সি.র সুইচটা অন করতেই বিনবিন করে মৌমাছি ওড়ার মতন একটা শব্দে ঘর ভরে গেল। সেই সঙ্গে অদৃশ্য একটা ঠান্ডা অনুভূতি—।

এই তো, এখন চলছে দেখছি, রুমালে হাত মুছতে মুছতে অর্জুন বলল, চলুন আগে চা খাই, অনেকক্ষণ চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। আপনারও নিশ্চয় চা খাওয়া হয়নি। নিরুত্তরে তার পেছন পেছন বাগানের মুখোমুখি একটা চৌকো মতন পাথর বাঁধানো জায়গায় এসে দাঁড়াল কাজল। চারখানা বেতের চেয়ার আর একটা চারকোনা বেতের টেবিল পাতা আছে সেখানে।

আমরা রোজ বিকেলে এখানে বসে চা খাই—বসুন please.

কাজল নিঃশব্দে বসে পড়ল।

অর্জুন বলল, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, চা খেতে খেতে সেগুলো সেরে ফেলবো। আকাশ এক্ষুনি এসে পড়বে। ওহো, তার সঙ্গে তো আপনার এখনো দেখাই হয়নি...। আমার ছেলে, ওর ডাক নাম পিনু। আপনি ওকে পিনু বলেই ডাকবেন।

রহস্যের জট খোলার বদলে ক্রমশই আরো জটিল হয়ে যাচ্ছে। কাজল একদম চুপচাপ।

কাল সকাল হোক—তারপর এ বাড়িতে কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। মনে মনে ভাবলো সে।

একটা দৈত্যের মতন লোক চা নিয়ে এলো। তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো কাজল। রূপোর ট্রেতে দামি বনচায়নার কাপ ডিস। রূপোর ছোট ডিসে

চৌকো এবং খুব ছোট ছোট বিস্কুট। আর একটা ডিসে অন্য একটা কি যেন।

লোকটি ট্রে-টা নামিয়ে দিয়ে কাজলের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ইস্, ঐ একটা দৈত্যের মতো মানুষের মুখে একটা বাচ্চার পবিত্র হাসি!

আহ্—আজকে কি সব উল্টোপাল্টা হচ্ছে—।

চায়ে চুমুক দিয়ে চোখ তুলল কাজল। অর্জুন এখন অন্যদিকে তাকিয়ে। বাগানের পেছনে দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তেজপাতা গাছের মাথা ছুঁয়ে শেষ দিন।

কাজল সাহস করে নিজেই বলল, কি যেন বলবেন বলছিলেন।

হ্যাঁ—অর্জুন চায়ের কাপ না তুলে বিস্কুট তুলে নিয়ে দাঁতে কাটলো। আজ ঠিক দুমাস হলো আমার স্ত্রী left this house. এখন বোধহয় তার বাবার কাছেই আছে। কদিন আগে একটা উকিলের চিঠি পাঠিয়েছে। ডিভোর্স চেয়েছে।

অর্জুনের গলার স্বরে কোনো উত্তাপ নেই। আফশোসও নেই।

Women's liberation-এর যুগ এটা—কাজলের দিকে তাকিয়ে হাসলো অর্জুন।

আপনার চা—

হ্যাঁ খাচ্ছি, অর্জুন কাপ তুলল। ঠোঁট ডোবাল তাতে। বলল, আপনার নিশ্চয় মনে হচ্ছে এই লোকটা একটা শয়তান। তা না হলে তার বৌ বাড়ি থেকে চলে গেল কেন, ডিভোর্স চাইল কেন।

কথার পর আবার চা খেল সে। Anyway—,

উকিল বুঝবে ডিভোর্সের কি হবে। আমার চিন্তা পিনুকে নিয়ে। বাড়িতে মা না থাকলে বাচ্চারা খুব আইসোলেটেড ফিল করে এবং আলটিমেটলি খারাপ হয়ে যায়।

কথা থামিয়ে এক সেকেন্ড চুপচাপ সে। তারপর আবার মুখ খুলল, এই সব ভেবেই কাগজে গভর্নেস চেয়ে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। গোটা কুড়ি অ্যাপ্লিকেশন এসেছিল। একটাও পছন্দ করার মতন নয়,—হঠাৎ কথা বন্ধ করে অর্জুন কাজলের দিকে বিস্কুটের ডিসটা ঠেলে দিল, একি, আপনি তো একটাও বিস্কিট নেননি-—নিন Please...

কাজল যারা বিস্কুট না বলে বিস্কিট বলে তাদের খুব পছন্দ করে। যে মেয়েরা বাঁ হাতে লেখে তাদেরকেও তার খুব পছন্দ। আন্নু বাঁ হাতে লেখে।

ঝপ্ করে দিনের আলো নিভে গেল। দিন শেষ হবার আগেই। খাবার জায়গাটাতে আগে থেকেই একটা ছোট্ট ঝড়ের মধ্যে আলো জ্বলছে। আলোটাও স্নিগ্ধ ছায়ার মতন।

আপনি দেখবেন যখন যেটা আপনার দরকার তখন সেটা পাবেন না। আমার একজন গভর্নেসের খুব দরকার অথচ কিছুতেই পাচ্ছিনা। তাই এলাহাবাদে শংকরকে telegram করলাম। শংকর আমার কলেজের বন্ধু। আমি জানতাম ও একটা ব্যবস্থা করবেই—

এখানে রাস্তায় কলকাতার মতন মানুষের, গাড়ির এবং শব্দের মিছিল থাকে না। গাড়িও চলে প্রায় নিঃশব্দে। এই সব শব্দহীনতা কাজলকে নাড়া দেয়। এখন দিচ্ছে।

সে বলল, আমার কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলা উচিত। আমি, মানে আমি—

Please, আপনার যা বলার সব আমি শুনবো। এখন শুধু আপনার নামটা বলুন—

কাজল বলল, আমার নাম অনুরাধা।

একটু বড় কিন্তু সুইট,—চায়ের কাপ খালি।

যে বাতাসটা বন্ধ ছিল এতক্ষণে সেটা আবার বইতে শুরু করেছে।

অর্জুন বলল, আপনার স্যালারি মাসে পাঁচ করে পাবেন। কি, কম হয়ে গেল নাকি? আপনার যখন যা লাগবে বলবেন, সব পেয়ে যাবেন। কাকে বলবেন, দাঁড়ান সনৎকে ডাকি। সনৎ এ বাড়ি সবকিছু দেখাশোনা করে।

দৈত্যের মতন লোকটা এসে নিঃশব্দে খালি কাপ-ডিস নিয়ে গেল।

অর্জুন বলল, চলুন পিনুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। ও বোধহয় এখন ওর ঘরেই আছে।

(৯)

হাতে হকিস্টিক্ নিয়ে যে রকম ভাবে প্লেয়াররা অলিম্পিকের খেলায় মাঠে ছোটে ঠিক সেই রকম ভাবে গায়ত্রী লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে সটান তেতলায় উঠে এলো। তার মনের কোথাও এতটুকু ভয়, এতটুকু দ্বিধা নেই। এই বাড়িটাও চারতলা, নিচের তলায় গ্যারেজ।

বাড়িটার বারান্দাগুলো তার একটুও পছন্দ হয়নি। কেমন যেন ছিরিছাঁদহীন। তাও সে এই বাড়িটাতেই ঢুকেছে। ঢোকার আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হেড-টেল করে নিয়েছে।

দরজায় কোনো নেমপ্লেট নেই কেন?

গায়ত্রী যে দরজার সামনে দাঁড়াল সেটার কাঠের গায়ে বিচিত্র ড্রাগনের মুখ খোদাই করা। এই মরেছে—, চীনারা থাকে নাকি এখানে? ডোরবেল হাত ছোঁয়ানোর আগে একবার ভাবলো সে। তারপর বেলটার বোতামে আঙুল রাখলো। টং করে একটা কর্কশ শব্দ হলো। তারপরেই সব চুপ।

নির্ঘাৎ একটা ভুল জায়গায় এসে পড়েছি আমি—ব্যাগটা হাতে নিয়ে জোরে জোরে বার কয়েক দুলিয়ে নিয়ে আবার ডাকলো। এবার বেল নয়, দরজায় ধাক্কা—। এক ধাক্কাতেই দরজাটা খুলে হাট হয়ে গেল—চিচিং ফাঁক না কিরে বাবা!

দু তিনবার শিস্ দিল সে।

সিঁড়িটা অন্ধকার অন্ধকার। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে অনেকগুলো গলার সোচ্চারে হাহা হিহি হাসির আওয়াজ।

নাহ, মনে হচ্ছে তাকে অন্য একটা বাড়িতে ট্রাই করতে হবে। আন্নু আর কাজল কি করছে কে জানে।

হঠাৎ তার কলেজের কথা মনে পড়ে গেল।

আজ তিনজনাই তারা ক্লাসে যায়নি। একসঙ্গে তিনজনার একই দিনে ক্লাসে অনুপস্থিতি এর আগে কখনো ঘটেনি।

সন্ধ্যের পরেও তাদের ফিরতে না দেখে কংসাবতী ম্যাম নিশ্চয় দুশ্চিন্তা করবেন। তারপর রাত যত গভীর হতে থাকবে ততই ছুটোছুটি বাড়তে থাকবে। তাদের নিয়ে নানা রকম গল্পও তৈরি হবে। কংসাবতী ম্যামের মুখখানা মনে পড়তেই হাসি পেল গায়ত্রীর।

এবং পরক্ষণে যা ঘটলো তা তার কল্পনার বাইরে। পাশের ফ্ল্যাটের হাসির ঝড় এতক্ষণে থেমেছে। সেখান থেকেই সে তার খুব চেনা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল...সে কণ্ঠস্বর কংসাবতীর। নির্ঘাত আমি ভুল শুনেছি...না হলে আমার মাথায় গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে,—এখানে, মানে আমি সিঁড়ির অন্ধকারে যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি তার দুহাত দূরে একটা দেয়ালের পেছন থেকে হোস্টেল সুপারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে পারে কি ভাবে? গায়ত্রীর মনের মধ্যে থেকেই আর একটা গায়ত্রী তার প্রশ্নের উত্তর দিল—নিশ্চয় পারে। পাশের ফ্ল্যাটটা হয়তো কংসাবতীর বোনের। অথবা অন্য যে কোনো আত্মীয়ের এবং কংসাবতী সময় পেলেই তাঁর মারুতি জিপসি চালিয়ে এখানে চলে আসেন।

মারুতি জিপসি...মারুতি জিপসি...কথাটা জিবের ডগায় নিয়ে একছুটে তেতলা থেকে একতলায় নেমে এলো গায়ত্রী—।

Oh God... ওইতো সেই বিখ্যাত ছাই ছাই রং-এর মারুতি জিপসি...কংসাবতীর ড্রাইভার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।

গাড়িটা এইখানেই দাঁড়িয়েছিল অথচ ঢোকার সময় গায়ত্রী খেয়ালই করেনি। ...I am a stupid...

নিজেকে গালাগাল দিল সে।

তারপর ভাবলো, কি করা যায় এখন। দিন শেষ। একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে। নতুন কোনো বাড়িতে চেষ্টা করা যায়। পর পর বাড়ির মিছিল। একটা একটা করে বাড়িতে আলো জ্বলতে শুরু করেছে।

নানা রকম ভাবতে ভাবতে গায়ত্রী আগের তেতলার ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজাটা খোলাই রয়েছে, সে একটু আগে ঠিক যে রকম দেখে গিয়েছিল। এবং ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। সে প্রথম ঘরখানায় এসে দাঁড়াল একটু।

আহ্—আলোটা জ্বালেনি এখনো কেউ। আলোর সুইচ কোনদিকে কে জানে। একদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল গায়ত্রী।

না, সে দেয়ালে কোনো সুইচবোর্ড নেই। তার ব্যাগে একটা ছোট টর্চ আছে সেকথাটাও এখন তার মনে পড়লো না। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকলো সে।

শব্দটা এখন স্পষ্ট।

মানুষের গলার আওয়াজ—ঘড়ঘড়ে—হঠাৎ তার বুকের চেতনায় ধাক্কা লাগলো—মানুষ মরে যাবার আগের মুহূর্তে ঠিক এই রকম করে নিজের প্রাণের জন্যে আর্তি জানায়।

ভাবনাটা মাথা থেকে রক্তের কোষে ছড়ানোর আগেই আলোর সুইচটা খুঁজে পেল সে। দপ্ করে আলো জ্বলে উঠলো। মুহূর্তে চারপাশের অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোর বন্যা।

গায়ত্রী শব্দটা যেখান থেকে আসছে সেদিক লক্ষ্য করে দৌড়ে গেল।

ঘরে একটা খাট। বিছানা বালিশ সব এলোমেলো। একদিকের জানলা খোলা, অন্যটা বন্ধ। একটা দেহ মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। গায়ত্রী হেঁট হয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো—গলার ঘড়ঘড় শব্দটা এখন না থাকলেও মানুষটা বেঁচে আছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে দৌড়লো সে। কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের দরজা অবধি পৌঁছনোর আগেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে—কংসাবতী স্বয়ং

চলে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে পাশের বাড়ির দুজন মহিলা।

রাস্তায় কংসাবতীর জিপসির স্টার্ট নেবার শব্দ কানে আসার আগেই পাশের দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়লো গায়ত্রী—শিগগির আসুন আপনারা—আপনাদের পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক মারা যাচ্ছেন।

বীরুবাবু! কেন কি হয়েছে তার!—এক মোটা মহিলা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

গায়ত্রী বলল, জানিনা কি হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন।

এক মিনিটের মধ্যে ভিড় জমে উঠলো এদিকের ঘরে। দুতলা তিনতলা চারতলা মিলিয়ে জনা দশেক পুরুষ মহিলা। এক বৃদ্ধ গুজরাটি ভদ্রলোক একটি ছোকরাকে ডেকে বললেন, জলদি যাও, ডাক্তার সেনকো ফোন লাগাও—জলদি—ছেলেটি দ্রুত পায়ে চলে গেল।

বৃদ্ধ এবার গায়ত্রীর দিকে ফিরলেন,

আপ কৌন...?

আমি, গায়ত্রী ঢোক গিললো। আমি মানে—

বীরুবাবুর সিস্টার হলেন। ঠিক আছে আর কুছু বলতে হবে না। আমি সব সমঝে গেলো।

একটি যুবক বিছানার বালিসের তলা থেকে এক টুকরো কাগজ টেনে বার করলো—সর্বনাশ, পড়ুন এটা, দেখুন কি লেখা আছে।—সুইসাইড!

—সর্বনাশ।

গায়ত্রী কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল—"আমি চোদ্দটা ঘুমের বড়ি খেয়েছি। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। মেয়েদের যে বিশ্বাস করবে সে ঠকবে।"

নিচে বীরুবাবুর হাতের সই।

হায় রাম, বীরুবাবুতো বহুৎ আচ্ছা লেড়কা, উনি আত্মহত্যা করবেন কেন, সব ঝুট...বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, আভি হাসপাতালে যেতে হবে। আমি গাড়ি বার করছি, আপনারা বীরবাবুকে জলদি নিচে নামিয়ে আনেন।

এমন একটা ঝামেলার মধ্যে যে পড়ে যাবে গায়ত্রী তা কল্পনাই করেনি। তার ভয় লাগছে না কিন্তু একটা অস্বস্তি মনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা সে এখানে একদম রবাহুত। নিজের ইচ্ছেয় এসেছে। এবং তার সঙ্গে এই মানুষটার কোনই সম্পর্ক নেই।

সবকিছু ছাপিয়ে এই প্রথম নিজের ওপরেই রাগ হল গায়ত্রীর। হোস্টেল ছেড়ে পালানোর বুদ্ধিটা তারই। আন্নু আর কাজলকে সেই উসকেছে।

আপনি, একি আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, গাড়িতে উঠুন—সেই ছেলেটি যে বীরুবাবুর লেখা কাগজের টুকরোটা পেয়েছিল।

আমি, গায়ত্রী বলল, আমি শুধু শুধু কেন...

তার কথা শেষ করতে পারলো না সে।

একজন গাড়ির দরজা খুলে বলল, আপনি বীরুদার রিলেটিভ, আপনি না গেলে হাসপাতালে ভর্তিই করতে চাইবে না—। It is the case of an attempted to suicide.

একটি বৌ পেছন থেকে ঠেলে গায়ত্রীকে গাড়ির সামনের সিটে তুলে দিল। পেছনের লম্বা সিটজুড়ে বীরু নামের মানুষটা, যাকে জীবনে এই প্রথমবার দেখলো গায়ত্রী।

মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে বীরু। চোখের কোনো ভাষা নেই। তবু আশ্চর্যভাবে গায়ত্রীর কেন যেন মানুষটাকে মমতা করতে ইচ্ছে করলো।

ভালবাসায় হেরে গেলে ছেলেরা কেন যে আত্মহত্যা করে...? কাকে ভালবাসতো এ? কে এই হৃদয়হীনা?

দাঁত দিয়ে গায়ত্রী নিজের ঠোঁট এত জোরে কামড়ালো যে রক্ত বেরোনোর যোগাড়। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল—যদি মেয়েটার সঙ্গে কখনো তার দেখা হয় তাহলে এর শোধ নেবে।

সত্যিই তিনটে হাসপাতাল ঘুরে শেষে একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলো বীরুকে। বৃদ্ধ হরিন্দরবাবু নার্সিংহোমের কাগজপত্রে সব সইপত্র করলেন। একজন ডাক্তার এসে বললেন, আপনারা এখন যান, আমরা চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছি। গায়ত্রী ঘরের এককোনে একটা টুলের ওপর চুপচাপ বসেছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। তক্ষুনি আবার বসে পড়লো—এই রাতে তার কোথাও যাবার জায়গা নেই। এবং সেই ভাবেই বসে থাকতে থাকতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়লো।

অনেক রাত্তিরে, গায়ত্রী জানে না সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে। হঠাৎ একটি হাতের ধাক্কায় তার ঘুম ভাঙলো। তাকিয়ে দেখল একজন নার্স। নার্সটি বলল, এবার আপনি পেশেন্টের কাছে যেতে পারেন। আপনার হাজব্যান্ড নাও আউট অব ডেঞ্জার। Don't worry.

কথার পর নার্সটি একদিকে চলে গেল। গায়ত্রী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

এখনো ঘুম পুরো কাটেনি। ভীষণ খিদে পেয়েছে। প্রচন্ড ক্লান্তি সারা শরীরে। তাও ফিক্ করে হেসে ফেলল সে। হাজব্যান্ড—

(১০)

রাত এখন ঠিক নটা।

সালোয়ার কামিজ ছেড়ে শাড়ি পরেছে আন্নু। তাঁতের সাদা শাড়ি লালপাড়। শাড়িখানা তাকে জোর করে পরিয়েছেন হেমলতা। আর তাতেই সবকিছু উথাল পাতাল।

হেমলতা কতোবার যে তাকে দেখে গেলেন, কতবার যে তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন তার ঠিক নেই। আর আন্নু নিজে, চুরি করে দুবার আয়নায় নিজেকে দেখার পর তার মনে হয়েছে—এ মেয়েটা আবার কে?

একখানা মাত্র শাড়ি তাকে যে কতো আমূল বদলে দিতে পারে আগে জানতো নাকি সে? তারপর থেকে সেই যে বুকের মধ্যে চেনা অচেনার কাঁপন শুরু হয়েছে তা থামার নাম নেই।

এতক্ষণে এ বাড়ির খুঁটিনাটি সবকিছুই জানা হয়ে গিয়েছে তার। তার কল্পনার কৌশিক—যার অস্তিত্বই কোথাও নেই তারই হাত ধরে এমন একটা পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে যে যেখানকার সব নাটকে সব সংলাপে সে ছাড়া দ্বিতীয় কারুর অস্তিত্ব নেই। একটু আগে স্বরাজ ঘরে এসেছিলেন, হ্যাঁরে, রোজ এই সময় আমি এককাপ কফি খাই। আমার জন্যে কফি হচ্ছে, তুই খাবি নাকি?

আন্নু আধশোয়া হয়ে একটা ইংরিজি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছিল। সোজা হয়ে বসে হাতের বইখানা কোলের ওপর রেখে বলল, বারে, আমাকে না দিয়ে তুমি একলা কফি খেতে পারবে?

সেই জন্যেই তো জানতে চাচ্ছি। তোর মাসী বললে বাচ্চাদের রাত্তিরে কফি খেতে নেই। ঘুম হয় না।

আমি বাচ্চা, আন্নু উঠে দাঁড়াল। এই যে তখন বললে আমি তোমার মা।

তাই তো, কথাটা আমার মনেই ছিল না। দাঁড়া, আমার কাপটাও এখানেই নিয়ে আসি।

স্বরাজ চলে গেলেন।

আন্নু হাতের বইখানা দুহাতে তুলে মুখে চাপা দিল—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড বিদীর্ণ করে কান্নার সমুদ্র উঠে আসছে। বুকের গভীর থেকে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে।

সবই ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু রাতে খাবার টেবিলে কোথা থেকে এক টুকরো ঝড় উঠে এলো হঠাৎ। হেমলতা বললেন, সন্দীপ ফিরে এলে তোর ভাইকে খুঁজে বার করতে একঘণ্টাও লাগবে না।

আন্নু বললে, তখন থেকে দশবাব বললে তোমার ছেলে ফিরে এসে আমার ভাইকে খুঁজে দেবে কিন্তু তোমার ছেলে কোথায় আছে তা একবারও বলছো না।

তোকে বলিনি বুঝি, হেমলতা একটা মাছের বড় পেটি তার পাতে চাপালেন, সন্দীপ বহরমপুর না কোথায় যেন গিয়েছে। ওখানে একটা খুনের তদন্ত করবে. ., যাবাব আগে বলে গিয়েছে দুদিনের মধ্যে ফিরবে, বেশি দেরি হবে না।

আন্নুর ভাতসুদ্ধু হাতখানা মুখের কাছ থেকে নেমে এলো—, তোমার ছেলে তাহলে--

স্বরাজ বলে উঠলেন, আই.পি.এস. এ খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল সন্দীপ। এখন লালবাজারে পোস্টিং। আমি চাইনি আমার ছেলে পুলিশে চাকরি করুক।

শেষের শব্দগুলোতে আক্ষেপের চেয়ে হতাশা বেশি। আন্নু খাওয়া ভুলে বড় বড় চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার বুকের মধ্যে ঝড়টা প্রবল আক্রোশে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আর একটা ভয়। পালাতে হবে।

ওকি, ওকি, উঠে পড়লি কেন? পাতে যে সব পড়ে রইল! মাখা ভাত, মাছ, ফুলকপির তরকারি, কাচের বাটিতে রাবড়ি। তোর জন্যে আমি নিজে গিয়ে রাবড়ি কিনে আনলাম।

আন্নু উড়তে উড়তে বেসিনের সামনে পৌঁছে মুখ ধুলো, চোখে মুখে জল দিল তারপর আবার খাবার টেবিলের কাছে ফিরে এলো—আমি কি রাক্ষস, এত খেতে পারি।

হেমলতা একটু ম্লান হলেন, নিশ্চয় আমার রান্না তোর পছন্দ হয়নি। তুই কি ঝাল বেশি খাস? সন্দীপও তাই।

না বাবা, না, কথা বলতে বলতে আন্নুর গালে টোল পড়ল। তোমার রান্না তাজবেঙ্গলের হেডকুকের চেয়েও ভালো, আমার ভীষণ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কোন ঘরে শোব বলে দাও।

ঝড়টা এখন ঠিক গলার কাছে। আর একটু এখানে থাকলেই তার চোখদুটো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

হেমলতা বললেন, তোর যে ঘরটা পছন্দ গিয়ে শুয়ে পড়।

আচ্ছা—প্রজাপতির মতন বাতাসে ভেসে সেখান থেকে সরে গেল সে।

তুমি থেকে তুইয়ে পৌঁছতে কতক্ষণ লেগেছিল হেমলতার, আধঘন্টাও নয়।

স্বরাজ বলেছিলেন, তোর মাসীমা যখন তুই বলছে আমি বাপু তুমি আপনি বলতে পারব না।

স্বরাজ কথা বলতে বলতে চারপাশটা চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন, ফাঁকা ঘর, বারান্দায় এমনকি জিনিসঠাসা রান্নাঘরটাও কী দারুণ ·একটা আলোয় ভর্তি দেখাচ্ছে। এ বাড়িতে এত রং সকালেও ছিল না।

কী আশ্চর্য, ঐটুকু একটা মেয়ের মধ্যে এতো রঙ ছিল নাকি!

ভাগ্যি তোর ভাইকে খুঁজে পাসনি,—স্বরাজ বলছিলেন, নইলে কোনদিন তোর সঙ্গে দেখা হতো না—।

ওমা, এরকম করে বলে নাকি, আন্নু বলেছিল। আমি যে আমার ভাইকে খুঁজে পেলাম না, আমার মন কেমন করছে না বুঝি। আমার একটাই ভাই।

এই তখন যে বললি তোরা দুভাই এক বোন, রান্নাঘর থেকে হেমলতা বলে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা সামলে নিল আন্নু। আমার নিজের ভাই একটাই। আমাদের বাড়িতে পিসির ছেলেও থাকে। পিসি তো নেই, তাই। রজত। ওকেও আমার নিজের ভাইয়ের মতন—

স্বরাজ স্ত্রীর কথায় রেগে গেলেন, তুমিও তোমার ছেলের মতন পুলিশে ভর্তি হয়ে যাও। সব কথায় সন্দেহ আর জেরা, এই চল্, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।

আন্নু আড়চোখে রান্নাঘরের মধ্যে এই মুহূর্তে ম্লান হয়ে যাওয়া হেমলতাকে দেখে নিয়ে বলল, তুমি যাও, আমি মাসীমার কাছে যাচ্ছি—

এ সব সকাল আর দুপুরে ঘটে যাওয়া কয়েকটা ঘটনার টুকরো— বালিসে মুখ গুঁজে হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে নিল সে।

কাল ভোর হবার আগেই আমি এখান থেকে পালাবো। আমাকে খুঁজে খুঁজে যখন আর কোথাও পাবে না, এই দুজন মানুষ তখন কি করবে? কাঁদবে? বিষণ্ণ চোখ তুলে সারাদিন সারারাত রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে যদি সে আবার ফিরে আসে?

ধ্যাৎ, এখানে না এলেই হতো। মানুষ দুটো শুধু শুধু কেন যে তাকে এতো ভালবেসে ফেলল কে জানে—

হেমলতার পায়ের শব্দ এদিকেই আসছে।

চোখ বুজে ফেলল আন্নু।

হেমলতা ঘরে ঢুকে বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিস। গলা তুলে স্বরাজকে ডাকলেন, শোনো, মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর মশারিটা একটু টাঙিয়ে দিয়ে যাও।

(১১)

আকাশ—আকাশ কোথায় তুমি?

আমি এখানে—

Please come here.

অর্জুন কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর মা চলে যাবার পর থেকে এই এক খেয়াল হয়েছে, সারাদিন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়।

এতক্ষণে মানুষটাকে ভালো করে দেখালো কাজল। বেশ হ্যান্ডসামই বলা যায়। চোখে চশমা। ঠোঁটদুটো চাপা এবং সারামুখে কোথাও কোনো বিষণ্ণতার ছায়া পর্যন্ত নেই।

আমার একটা ছোট কারখানা আছে। অর্জুন কথাগুলো কাজলকে লক্ষ্য করে বললেও মনে হলো যেন নিজেকেই বলছে। যা তৈরি হয় বেশির ভাগই বিদেশে চলে যায়। গতবছর আমরা সরকারের কাছ থেকে প্রাইজ পেয়েছি। It is my life। হ্যাঁ, কারখানাটা আমার প্রাণ। I am a self made man.

একটু চুপ করেই প্যান্টের দুপকেটে হাত দিয়ে সামান্য পায়চারি করে নিল অর্জুন। থামার পর বলল, আমাদের বিয়েটা love marriage, বুঝলেন।

তার কথা শুনতে শুনতে কাজলের মনে হলো, দরজার ওপাশ দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। সেদিক থেকে চোখ সরালো না সে।

মানুষ বড় অদ্ভুত জানেন, সকলের সব কিছু সহ্য হয় না। আমার স্ত্রীর কথা বলছি। She hate my success. আমি কেন সারাদিন আমার কারখানা নিয়ে থাকবো, আমি কেন স্টাফদের সঙ্গে জরুরি মিটিং বাতিল করে দিয়ে বাড়ি চলে আসবো না, আমি কেন বাংলা সিনেমা হলেই সারাক্ষণ টিভি খুলে তার সামনে বসে থাকবো না—আপনার কাছে আছে এ সবের উত্তর? আমার কাছেও নেই, and that is why she left me.

নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে কাজল পর্দার আড়ালে খপ্ করে একটা হাত চেপে ধরলো, আকাশ।

আকাশ বাইরে এলো। পরনে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। বাবার মতো মুখ নয়। তাহলে নিশ্চয় মার মতো দেখতে হয়েছে ছেলেটাকে।

একমুহূর্ত সময়ের মধ্যে ভেবে নিল কাজল। তারপর বলল, তুমি জানো আমি কে?

জানি।

কে?

আন্টি—।

থ্যাংস। তোমার বুঝি বাগান খুব ভাল লাগে?

হ্যাঁ। আর পাখিও ভালো লাগে।

কোন্ পাখি?

পরে বলবো।

আচ্ছা। কাজল তার হাত ছেড়ে দিল।

আমাদের বাগানে একটা দোলনা আছে তুমি দেখেছ?

হ্যাঁ।

মা ওতে উঠে যখন দোল খেতো ঠিক পাখির মতন লাগতো।

কোন্ পাখি?

বললাম যে পরে বলবো।

বাগানের মধ্যে নেমে গেল আকাশ।

অর্জুন কাছে এগিয়ে এলো. দেখলেন?

কাজল ঘাড় ঝাঁকালো, মার কথা ভুলতে পারছে না।

কদিন আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেখানেও থাকেনি। চলে এসেছে।

দু'জনে পাশাপাশি বারান্দায় হাঁটছে এখন। অর্জুন বলল, আর আপনি কি যেন বলবেন বলেছিলেন, আমার মনে আছে। কাল শুনবো আপনার কথা। আমার বন্ধু যে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে তাকে বলেছিলাম একজন soft hearted মহিলাকে পাঠাতে—I am happy to see you.

চলে যাবার জন্যে এগিয়েও আবার দাঁড়াল অর্জুন, আজ আমি ডিনারের সময় থাকতে পারবো না। সরি—।

কিছুক্ষণ পর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গাড়িটা বেরিয়ে যেতে দেখলো কাজল। চালকের আসনে অর্জুন। সেই দৈত্যের মতন মানুষটা গেট বন্ধ করে ফিরে আসছে। কাছে এসে তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। তারপর অন্যদিকে চলে গেল।

কাজল মনে মনে ভাবলো, যাই আকাশ কোথায় আছে তাকে খুঁজে বার করি। এ বাড়িটা তার ভালোও লাগেনি, খারাপও লাগেনি। চারপাশে বৈভবের চিহ্ন ছড়ানো। সে আজ রাতে যে খাটটাতে শোবে সেরকম খাটে সিনেমার নায়ক-নায়িকারা শোয়।

হোস্টেলের ছোট ঘরে পাশাপাশি দুটো বিছানা। মাথার দিকে দুটো সাদামাটা টেবিলে বইখাতার স্তূপ। একটা সেকেলে ঘোমটা দেওয়া টেবিল ল্যাম্প। তার সঙ্গে এ ঘ;রের কোনো তুলনাই চলে না। তবু সেই পরিচিত ঘরখানিই তাকে এখন

টানছে। হোস্টেলে তার ঘরে খাটের পাশে জানলার ধারেই একটা চাঁপা গাছ। সারাবছর ফুল হয়। ঘুমের আগে ঘুম থেকে ওঠার পর তার গন্ধ এসে নাকে লাগে। এখানে জানলার দামি পর্দা না সরানো অবধি প্রকৃতির কাছ থেকে নির্বাসন।

কিন্তু ওই মানুষটা...যার নাম অর্জুন... চোয়াল শক্ত করে যে অক্লেশে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা বলে গেল, তাকে ছেড়ে পালানো তো বেইমানি।

রাতে খাবার টেবিলে সে আর আকাশ। আকাশকে ডাকতে হয়নি। নিজেই এসেছে।

এখন পরনে গেঞ্জি আর হাফপ্যান্টের বদলে স্লিপিং স্যুট। জামাটার বুকে উড়ন্ত বকের ছবি সুতো দিয়ে আঁকা।

স্কুলে তোমার কোন্ ক্লাস?

টু।

কোন্ স্কুল?

অরবিন্দ ভবন।

কাজল সামান্য ধাক্কা খেল। শহরের নামিদামি কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নাম শুনবে আশা করেছিল সে।

ওকি, তুমি ঠিক করে খাচ্ছো না কেন?

খাচ্ছি তো--

ভীম, অর্থাৎ সকালের সেই দৈত্যের মতন মানুষটা সারাক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো তাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এতক্ষণ এ বাড়িতে এসেছে সে, অথচ মানুষটাকে একটাও কথা বলতে শোনেনি। ভীম বোবা নয়তো?

কী আশ্চর্য, কাজল যা ভেবেছে ঠিক তাই। যে মানুষরা কথা বলতে পারে না তারা হাসি দিয়ে সকলের মন জয় করে। আকাশ বলল, আমি আমার ঘরে শুই, তাও মা রোজ শোবার পর আমার ঘুম না আসা অবধি আমার কাছে থাকতো।

মার কাছে গান শুনতে বুঝি?

নাহ্—মা গান জানেই না।

তাহলে গল্প—?

গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে না।

একটু বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে এখন কাজলকে। এই বাচ্চা ছেলেটাকে বুঝতে পারছে না সে, কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

হাত মুখ ধুয়ে সামনে এসে আকাশ বলল, গুড্ নাইট আন্টি—

গুড্ নাইট।

ভীমের সঙ্গে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল সে। কাজল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো। অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার গায়ত্রী আর আনুর কথা মনে পড়লো। তারা নিশ্চয় তার মতো এই রকম সমস্যার মধ্যে পড়েনি।

গভর্নেসকে কি করতে হয়, কি করতে হয় না কিছুই জানে না সে। তাছাড়া আসল গভর্নেস মেয়েটি, যার আসার কথাছিল সে যদি এসে হাজির হয় তখন কাজল কি করবে? এ বাড়িতে তার পরিচয় একটা মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

অর্জুন তার কথা এখনই শুনতে না চাইলেও তারই জোর করে বলা উচিত ছিল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে কিছু না ভেবেই আকাশের ঘরে ঢুকে পড়লো সে।

ঘরের এ.সি. চলছে। তার বিন বিন শব্দ। হালকা সবুজ আলো এবং পাতলা ওড়নার মতো অন্ধকারের মধ্যে দিয়েও মশারির মধ্যে ঘুমন্ত আকাশের মুখ দেখতে পেল সে। ঘুমন্ত বাচ্চাদের মুখে বোধহয় স্বর্গ আঁকা থাকে। এবং সেখান থেকে নিঃশব্দে অসংখ্য প্রজাপতি হয়ে উঠে আসে অদ্ভুত এক মন কেমন করা।

আচমকা নিজের বুকের মধ্যে সেই মন কেমন করা টের পেয়ে মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে থাকলো সে। তারপর পা টিপেটিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই আকাশ ডেকে উঠলো, আন্টি—।

কাজল একইভাবে নিঃশব্দে আবার পিছিয়ে এলো। তারপর মশারিটা সরিয়ে আকাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

(১২)

একটা ঘরে পাশাপাশি চারটে বেড। তার শেষেরটাতে বীরু শুয়ে আছে। গায়ত্রী ধীর পায়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল—হ্যালো!

মুখ থেকে এখন মৃত্যুর ছাপ মুছে গিয়েছে বীরুর। চোখ বুজে আছে সে। গায়ত্রীর ডাকে একবারের জন্যে চোখ খুলে তাকে দেখে আবার চোখ বুজলো সে।

গায়ত্রীর কেন যেন মনে হলো বীরু তার উপস্থিতিটা পছন্দ করছে না।

তবু খাটের পাশের টুলটাতে বসে পড়লো সে।

ছেলেগুলো প্রেমে পড়লে কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে যায়। বোকা না হলে কেউ আত্মহত্যা করতে যায়।

এই যে মশাই, গায়ত্রী বলল, আপনার বিপদ কেটে গেছে। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। কাল সকালেই ছেড়ে দেবে আপনাকে। কথার

পরে হাতের ঘড়ির দিকে চোখ রাখলো সে—ইস্, রাত এখন তিনটে।

এতক্ষণ সে হাসপাতালের টুলে বসে কাটিয়েছে। তাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু করার আগে সেই কখন তারা রাস্তার ধারের একটা দোকান থেকে চা আর সিঙাড়া খেয়েছিল। এখন পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে।

নিচে রাস্তার ধারেই অনেক খাবারের দোকান আছে। এখন সব বন্ধ।

এই মানুষটাও তো কিছু খায়নি।

মনে মনে হেসে ফেলল গায়ত্রী, খেয়েছিল একগাদা ঘুমের বড়ি।

গায়ত্রী বলল, এই যে বীরুবাবু, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? না, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন না। তাহলে কেটে পড়ছি আমি...। আমি আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম বলেই কিন্তু আপনি বেঁচে গেলেন। গায়ত্রী উঠে দাঁড়াল।

বীরু চোখ খুলল—আপনি কে?

আমি? বলুন তো আমি কে?

গায়ত্রী আবার টুলে বসলো, আপনার পাশের ফ্ল্যাটের একটা বৌ বলেছিল আমি আপনার বোন। একটু আগে এখানকার একজন নার্স গিয়ে আমায় বলে এলো, যান, আপনার হাজব্যান্ডের জ্ঞান ফিরেছে। ওরা এখনকার খাতায় বোধহয় তাই লিখেছে।

কি লিখেছে?

আপনি আমার হাজব্যান্ড।

এ্যাবসার্ড—, বীরু সটান উঠে বসলো। চোখে-মুখে বিভ্রান্তি আর অস্বস্তি।

গায়ত্রী তার অস্তিত্বটাকে আমল না দিয়ে বলল, আপনি মশাই কি রকম ধরনের লোক, একটা ফালতু মেয়ের ওপর রাগ করে মরে যাচ্ছিলেন?

জয়তি মোটেই ফালতু মেয়ে নয়—

একশো বার ফালতু, গায়ত্রী ঝগড়া কন্দল্সর ভঙ্গিতে বলল, শুনুন মশাই, আমি জানিনা আপনি কি করেন টরেন, তাছাড়া অন্য সব, মানে আপনার কে কে আছেন, যদি কেউ থাকেন তাহলে বলুন ফোন করে দিই তাদের। আপনাকে ছেড়ে দেবার আগে বোধহয় কাগজপত্রে সইটই করতে হবে।

আমাকে এখানে ভর্তি করলো কে?

আপনার পাশের ফ্ল্যাটের লোকরা। কি ঝামেলা, দুটো তিনটে হাসপাতালে ঘুরেছি। কেউ ভর্তি করতে চায়নি। শেষে এই নার্সিং হোমটাকে নিতে রাজি হয়েছিল। টাকা পয়সা আপনার পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ো ভদ্রলোক দিয়েছেন। উনি না থাকলে কি যে হতো,—কই বললেন নাতো আপনার কে কে আছে?

মা, বাবা।

ইস, আপনি একটা বিচ্ছিরি লোক, বলুনতো তাঁরা যদি শোনেন আপনি আত্মহত্যা—

বীরু বলল, টেবিলের ওপর থেকে জলের বোতলটা একটু দেবেন, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

গায়ত্রী উঠে জলের বোতলটা এনে তার হাতে দিল। বলল, এখন জলটল খাওয়া যাবে কিনা নার্সকে জিজ্ঞাসা করে নিলে হতো—

তার কথা শেষ হবার আগেই জলের বোতলটা থেকে জল খেতে শুরু করেছে বীরু।

জলখাওয়া শেষ হলে হাসার চেষ্টা করলো বীরু। জানেন, আমি নিজেও এখন ভাবছি ওটা করা আমার উচিৎ হয়নি।

কোনটা?

সুইসাইডের চেষ্টা।

ওই ফ্ল্যাটটাতে মনে হলো আপনি একাই থাকেন?

হ্যাঁ।

নিজের ফ্ল্যাট?

হ্যাঁ। জানেন, জয়তিও প্রথমদিন জানতে চেয়েছিল ফ্ল্যাটটা আমার নিজের কিনা।

বিচ্ছিরি, নোংরা, বাজে, গায়ত্রী নাক কুঁচকে বলল, পর্দাগুলো কে পছন্দ করে কিনেছে, নিশ্চয়ই আপনি। একদম থার্ড ক্লাস। নিশ্চয় ফুটপাথ থেকে কেনা। পর্দাটর্দা না পাল্টালে ওখানে আমি একদিনও থাকতে পারবো না বলে দিচ্ছি—

কথাটা বলে ফেলেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গায়ত্রী, তার মুখ ফস্কে এমন একটা কথা কি করে যে বেরিয়ে গেল কে জানে।

মুহূর্তের মধ্যে তার সারামুখ লজ্জায় লাল।

বীরু অবাক দৃষ্টি মেলে তার দিকে নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে আছে।

রাস্তায় এখনও গাড়ির চলাচল শুরু হয়নি। এমনকি ভোর হতেও বেশ দেরি আছে এখনও। সবে রাত চারটের কাছাকাছি। নিজেকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আমি চলে যাচ্ছি—একথাটাও সে বলতে পারলো না। অনেকক্ষণ পর এলোমেলো গলায় গায়ত্রী বলল, সরি—

বীরু চোখ সরিয়ে নিয়েছে। আবার শুয়ে পড়েছে সে। দুচোখ বোজা তার।

সেই ভাবেই অন্য একরকম গলায় বীরু বলে উঠলো, ফ্ল্যাটটা আমার, হ্যাঁ

আমার। আমি একটা কম্পিউটার কোম্পানীতে কাজ করি। আমার সৎ মা কিন্তু আমায় খুব ভালোবাসেন। হ্যাঁ, বাবার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। তাও তাঁদের কাছে থাকতে আমার ভালো লাগে না। কেন লাগে না জানিনা।

বীরু চোখ খুলল। হাসলো, আপনি তখন যা বললেন...ওই যে থাকার কথা। যতোদিন আপনার ইচ্ছে থাকতে পারেন, কিন্তু—

কিন্তু কি—? প্রশ্নটা করলো না গায়ত্রী। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকলো বীরু কি বলে তা শোনার জন্য।

বীরু বলল, প্রথম যেটা বলেছিলেন সেটাই ভালো, কি, আমার সিস্টার হয়ে থাকতে পারবেন না! আমি একটু ভালো হয়ে গেলে দু'জনে মিলে একটা পর্দা কিনে আনবো—, কি রাজি?

এবারে গায়ত্রী অবাক হয়ে বীরুর দিকে তাকিয়ে থাকলো। কি সুন্দর দেখাচ্ছে বীরুকে। ঝকঝকে মণি দু'টোতে স্বপ্ন চিক্‌মিক্‌ করছে।

এখন ভোরের প্রথম পাখিটার বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা। ইস্‌, এই মানুষটা সে হঠাৎ গিয়ে না পড়লে এতক্ষণ—

মনে মনে নিজের ভাবনাটাকে শাসন করলো গায়ত্রী। বলল, কই, জানতে চাইলেন নাতো, আমি কে?

(১৩)

টুক্‌ করে একটা শব্দ হলো ছিটকিনি খোলার।

একবার পেছনে তাকালো আন্নু। সারা বাড়ি ঘুমে অচেতন। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা এতো জোরে লাফাচ্ছে যে ভয় পেয়ে গেল সে।

কাল এখানে এসে ঢোকার পর থেকে একবারও বেরনো হয়নি। নিশ্চয়ই কাছাকাছি ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। ট্যাক্সি না পেলে বাস মিনিবাস যাই পাওয়া যাক তাতেই উঠে পড়বে সে। সেখান থেকে হোস্টেল। নিজের ছোট্ট ব্যাগটা হাতে।

ইস্‌ কি সাংঘাতিক ভুল হয়ে যাচ্ছিল এক্ষুনি, কালকের শাড়িটাই পরে আছে এখনো।

থাকগে—পরে একদিন পার্সেল করে পাঠিয়ে দিলেই হবে। এখন শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজ পরার সময় নেই। চারপাশে পাখি-টাখির ডাকাডাকি শুরু হয়ে গিয়েছে। রোদ না উঠলেও আলোর মুখে আর ছায়া নেই।

নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বাইরে এসে আবার বন্ধ করে দিল। জুতো জোড়া

হাতে, আর ব্যাগটা কাঁধে নিয়েছে। হতচ্ছাড়া জুতোটা পরলেই বিচ্ছিরি খট্ খট্ আওয়াজ হয় পাহারাদারদের জুতোর মতন। এই জুতোটা কেনার সময় গায়ত্রী তার সঙ্গে ছিল। সেই পছন্দ করেছিল ডিজাইনটা।

গায়ত্রীর কথা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস দ্রুত হলো—পুরো ষোলো ঘন্টা তার সঙ্গে দেখা হয়নি। নির্ঘাত মজায় আছে দুজনা। গায়ত্রী আর কাজল।

তার মতো একেবারে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েনি তারা। এত বড় সল্টলেকে তার আর যাবার জায়গা জুটলো না, পুলিশের বাড়িতে। ওরে বাবা—

আজই খুনের এনকোয়ারি শেষ করে বহরমপুর না কোথা থেকে যেন ফিরে আসবে সন্দীপ। সন্দীপ—মনে মনে দুবার নামটা উচ্চারণ করলো আন্নু। মোটেই পুলিশের নাম সন্দীপ হওয়া উচিৎ নয়...।

সন্দীপ স্যার তাদের সেক্সপিয়ার পড়ান। কালো, মোটা, মুখে ঝাঁটা গোঁফ, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। chain smoker. ছিঃ।

অথচ মাসী আর মেসোর তুলনা হয় না। ওই দুজনের জন্যে, হ্যাঁ শুধু ওঁদের জন্যেই তার এখান থেকে পালাতে মন চাইছে না। শুধু এই পুলিশটা যদি না থাকতো—

সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল আন্নু—

গেটের মুখেই স্বরাজ। মর্নিংওয়াক শেষ করে ফিরছেন। কিরে চলে যাচ্ছিস?

মাথায় হাত রাখতেই আন্নু কেঁদে ফেলল। ঠিক আছে, আমরা আর তোকে আটকাবো না, স্বরাজ বললেন, চল্ ওপরে চল্। শুধু মুখে চলে যাবি? একসঙ্গে এককাপ করে চা খাই চল্ দুজনে। আমি কি সুন্দর করতে চা করতে পারি দেখবি, এখান থেকে চলে যাবার অনেকদিন পরেও মনে থাকবে আমাদের।

আন্নু নীরবে তাঁর পেছন পেছন ওপরে উঠে এলো। চোখের জল মোছার পরেও এখনো তার চোখে জলের দাগ লেগে আছে।

রান্নাঘরে গ্যাসে চায়ের জল চড়িয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বরাজ—তোর মাসী ওঠার আগেই চলে যা। সেই ভালো নইলে উঠে পড়লে খুব কান্নাকাটি করবে। তখন আর যেতে পারবি না।

আন্নু বলল, তুমি এখানে বসো, আমি চা করছি।

না, ওই যে তোকে বললাম, চলে যাবার আগে আমার হাতের তৈরি চা খেয়ে তবে যাবি।

রান্নাঘরে ফিরে গেলেন স্বরাজ।

এমন করে মানুষ দুজনকে আঘাত দিতে চায়নি আন্নু...ঐ পুলিশ যদি এ বাড়িতে না থাকতো—ভগবান কাউকে কখনো সবকিছু একসঙ্গে দেন না—।

কাজল ভগবান মানে না। ঠিক করে কাজল। ইস্, এখন যদি একবার কাজলের সঙ্গে দেখা হতো।

একি, এটা আবার কি!

মিষ্টি, মাত্র দুটো দিয়েছি। বাসি মুখে কেউ বাড়ি থেকে যায় না।

আমি যাচ্ছি কে বলল—আন্নুর গালে টোল। চোখদুটো এই মুহূর্তে হাসছেও না কাঁদছেও না। একটা দুষ্টুমি ছায়ার মতো লেগে আছে দুচোখের মণিতে।

স্বরাজ দুলছেন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে—ঠিক তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মাথার চুল বেশির ভাগই সাদা। এখন এলোমেলো। আদ্দির পাঞ্জাবীর দুটো বোতাম খোলা।

বাবারও ঠিক এমনি করে পাঞ্জাবীর বোতাম খোলা থাকে।

আন্নু চায়ের কাপ মুখের কাছে তুলে আবার নামিয়ে নিল। দুম করে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার ছেলের গোঁফ আছে?

আছে, ঠিক উত্তমকুমারের মতো।

উত্তমকুমারের মোটেই গোঁফ ছিল না।

তাহলে, তাহলে বোধহয়—

আন্নু এক ঢোক চা খেয়ে বলল, গোঁফ আমার দুচক্ষের বিষ।

তার কথা শুনে হেসে ফেললেন স্বরাজ, তুই গোঁফের ভয়ে পালাচ্ছিলি বুঝি?

মোটেই না..., এসব বললে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

প্রসঙ্গ পাল্টে স্বরাজ জিজ্ঞেস করলেন, চা টা কি রকম হয়েছে বললি না তো?

দারুণ, শুধু চিনি দিতে ভুলে গেছ।

আন্নুর বাসি চুল কপালের ওপর এলোমেলো হয়ে লেপ্টে আছে। দুই ভ্রুর মাঝখান থেকে লাল টিপটা উধাও।

দেখে দেখে মন ভরে না। স্বরাজের চা খাবার কথা মনে থাকছে না। ভগবান বড় কৃপণ। এই মেয়েটা তাঁর মেয়ে হয়েও তো জন্মাতে পারতো। তাহলে তাঁর সব স্নেহ উজার করে দিতে পারতেন।

ওকি, একটা মিষ্টি খা অন্তত। আমি হাতে করে দিলাম, খাবি না।

তুমি কিচ্ছু জানো না, মেয়েরা মিষ্টি খায় না। কেন খায় না জানো?

না।

মোটা হয়ে যাবে বলে। কথা বলতে বলতে আন্নু একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে একসঙ্গে মুখে পুরে দিল। বাঃ, দারুণ তো সন্দেশটা—

ওটাও খেয়ে নে তাহলে।

বাধ্য মেয়ের মতন আন্নু সেটাও তুলে মুখে ফেলল, শোনো, তোমার ছেলের সঙ্গে কিন্তু আমি যেচে আলাপ করতে পারবো না।

ঠিক আছে, আমি আলাপ করিয়ে দেব। স্বরাজ হাসছেন কথা বলতে বলতে, তোর কথা তাকে বলা হয়ে গেছে।

কখন? সত্যি সত্যি অবাক হলো আন্নু, কখন বললে আমার কথা? ইস্, না বললে বেশ মজা হতো। বাড়িতে পৌঁছে দেখতো কোথা থেকে একটা খেঁদিপেঁচি মেয়ে এসে হাজির হয়েছে।

আমি বলিনি, তোর মাসি। সন্দীপ অনেক রাত্তিরে ফোন করেছিল, তুই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিস।

একটু কি আপন মনে ভাবলো আন্নু। তারপর বলল, চলো বেড়াতে যাবে। তোমাদের এখানে সকালটা খুব সুন্দর।

খুব শব্দটা সে এমনভাবে বলল যেন শব্দটা তার বুকের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে।

স্বরাজ উঠে দাঁড়ালেন, চল্ যাই—, ফেরার সময় গরম গরম রাধাবল্লভী কিনে আনবো। রাধাবল্লভী ভালোবাসিসতো তুই?

অনেকখানি ঘাড় কাত করলো আন্নু। বলল, একটু দাঁড়াও, শাড়িটা ছেড়ে আসছি—

না না, ওটাই পরে থাক— প্রায় আঁতকে ওঠার গলায় বললেন স্বরাজ। কিন্তু যা বলতে পারলেন না তা হল শাড়ি পরা আন্নুকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আন্নুর সঙ্গে স্বরাজের মার না বয়সে, না চেহারা কোথাও কোনো মিল নেই, তাও অসংখ্য অমিলের মধ্যে থেকেই কোন্ জাদুতে যেন বারবার মিলটাই উঠে আসছে। সাদা খোলের লাল পাড় শাড়ি, পান পাতা মুখের টিপহীন ছোট্ট কপাল আর—আর—

স্বরাজের ভাবনাটা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল।

নিচের রাস্তায় একটা জিপ থামার শব্দ হয়েছে। সন্দীপের জিপ।

স্বরাজ তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললেন, চল্ সন্দীপ এসেছে।

তুমি যাও,—দুঃখী দুঃখী মুখ করে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো আন্নু। যে ঝড়টা আসার কথা ছিল সেটা এসে পড়েছে। মনে মনে নিজেকে ঝড়টার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আন্নুর মনে হলো তার বুকের মধ্যে আর নিঃশ্বাস তৈরি হচ্ছে না। হৃৎপিন্ডটা তার সাহস আর ইচ্ছের হয়ে লড়াই করার বদলে আগেই বিকল হয়ে বসে আছে।

গায়ত্রী আর কাজলের কথা মনে পড়লো তার। তারপরেই সিঁড়ি দিয়ে একজনের ভারী পায়ের শব্দ উঠে আসতে শুনলো।

(১৪)

নিজের ভিজিটিং কার্ডখানা কাঁচ ঢাকা বিরাট টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসলেন কংসাবতী মেনন।

সামনের মানুষটি ফোনে কোনো জরুরি কথা বলার ফাঁকে চোখের ইশারায় কংসাবতীর কাছে মার্জনা চেয়ে নিলেন। তারপর চাপা স্বরে কথা বলে যেতে থাকলেন।

এক মিনিট, পুরো এক মিনিট পর মানুষটি রিসিভার নামিয়ে রেখে তাঁর দিকে তাকালেন, সরি—বলুন এবার—

কংসাবতী ঠান্ডা হিমশীতল গলায় বললেন, আমাদের কলেজের হোস্টেল থেকে তিনজন মেয়ে উধাও হয়েছে।

কখন?

কাল।

তিনজনা একসঙ্গে পালিয়েছে?

পালিয়েছে কিনা জানি না, হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। কাল ওরা কেউ কলেজেও যায়নি।

Pre-planned বলে মনে হচ্ছে আপনার?

আমার কিছু মনে হচ্ছে না, they all are good girls. কোনো যদি বিপদে পড়ে থাকে তাহলে... কথাটা শেষ করতে পারলেন না কংসাবতী।

গার্জেনদের ইনফর্ম করা হয়েছে?

না।

হোস্টেলের অন্য মেয়েরা কি বলছে?

ওদের সঙ্গে রাস্তায় একটি মেয়েব দেখা হয়েছিল, তাকে বলেছে ঋত্বিক রোশনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

ঋত্বিক রোশন, সে কে?

কংসাবতী অবাক হয়ে অফিসারটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, হিন্দি সিনেমার হিরো—

এক মিনিট—

কাত হয়ে গাঢ় সবুজ রং-এর ফোনের রিসিভারটি তুললেন অফিসার ভদ্রলোক—ঋত্বিক রোশান বলে কারুর নাম শুনেছ নাকি? শুনেছ—গুড্, ওহো... তোমার বৌ মেয়ে সবাই তার ফ্যান... strange, আমি দেখছি ব্যাকডেটেডই থেকে গেলাম...হ্যাঁ বলো...yes...কাল ওই ভদ্রলোক এ শহরেই ছিলেন না...এখন হংকং-এ স্যুটিং করছেন...ঠিক আছে ছাড়ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ভদ্রলোক কংসাবতীর দিকে মুখ তুললেন, cooked up story...মনে হচ্ছে, আপনার মেয়ে তিনটে প্ল্যান করেই পালিয়েছে। আমি ফোন করে দিচ্ছি। আপনি kindly একবার ডি.সি. ডি.ডি.র সঙ্গে দেখা করুন। মেয়েগুলোর ছবি থাকলে দিয়ে যাবেন... আর হ্যাঁ, খবরের কাগজকে কিচ্ছু বলবেন না যেন...ওরা তিলকে তাল করে ফেলবে। এখন অ্যাসেম্বলী চলছে—একটু চিন্তিত দেখাল এবার ভদ্রলোককে,—শহর থেকে তিনটে মেয়ে উধাও...এমন মুখরোচক খবর পেলে কাগজগুলো সরকারকে ছেড়ে দেবে ভেবেছেন? এই ইস্যুর ওপর বাংলা বন্ধ না হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।

থ্যাংস্—কংসাবতী উঠে দাঁড়ালেন।

কাল সারারাত তাঁর কিভাবে কেটেছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। হোস্টেলের অন্য মেয়েগুলো এক একটা আস্ত শয়তান। সবাই মুখে কুলুপ এঁটে আছে...ওরা সবাই জানে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানে কিন্তু তাঁর কাছে মুখ খুলছে না।

করিডোর দিয়ে অনেকখানি হেঁটে এসে একটা নেমপ্লেটের ওপর চোখ রেখে দাঁড়ালেন কংসাবতী। ডি.সি. ডি. ডি.-র চেম্বার।

কাকে চাই?

মিস্টার সোম।

নেই।

আমাকে মিঃ সামন্ত পাঠালেন।

কে সামন্ত? পিওনটি দরজা থেকে সরার কোনো লক্ষণ দেখাল না।

মিঃ জগদীশ সামন্ত—

এতক্ষণ বলবেন তো হোম সেক্রেটারীর লোক আপনি। যান, সোজা ভেতরে

চলে যান। বাঁ দিকের দরজা।

কংসাবতী ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। রুমালখানা আবার হাতব্যাগে রাখলেন। তারপর এগোলেন—

চেম্বারটা বেশ বড়। চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার সার দিয়ে সাজানো। জানলায় ভারি পর্দা। মিঃ সোমের মাথার পেছনের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ফটো দামি ফ্রেমে বাঁধানো।

বসুন, বসুন ম্যাডাম—সোম একপাক ঘুরলেন, বলুন কফি খাবেন না ঠান্ডা কিছু—?

কফি—

থ্যাংস। আপনি এখানে আসতে আসতে আমি ব্যাপারটা সব শুনে নিয়েছি। খুবই সিরিয়াস ব্যাপার—তিনজন যুবতী হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আর ফিরলো না—

কংসাবতী চুপ।

আমি হাওড়া স্টেশনে আর এয়ারপোর্টে বোম্বের সব ট্রেন আর ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট সার্চ করতে বলে দিয়েছি...

কংসাবতী বললেন, Mumbai...... but.......

আজকাল উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই বোম্বে যাচ্ছে...মাধুরী দীক্ষিত আর ঋত্বিক রোশন হবে সবাই—হা হা হা—

নিন, কফি খান, ও কি, বিস্কুট নিচ্ছেন না কেন, সোম চেয়ারে পিঠ ঠেকালেন—total degradation..........আজকাল কেউ আর বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ হতে চায় না। এ্যানি বেশান্ত আর সিস্টার নিবেদিতার নাম জানে কিনা সন্দেহ—সোমের কপালে কটা রেখা, এক এক সময় ইচ্ছে করে গোটা জাতটাকে ধরে—

কথাটা শেষ না করে হাঁপাতে থাকলেন সোম।

বাইরের দেয়ালে নেমপ্লেটে আমার নামটা লেখা আছে নিশ্চয় পড়েছেন ম্যাডাম, হর্ষবর্দ্ধন সোম। আমার ঠাকুরদাদা রেখেছিলেন। ভদ্রলোক গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। লোকে যারা জানতো না তারা পাগল বলতো। ইংরিজি বাংলা ডিক্সনারীতে বেছে বেছে প্রসটিটিউসন, রেড লাইট এরিয়া এই রকম যতো শব্দ ছিল তাঁর মতে সব ছিল পড়ার ও জানার অযোগ্য। ছোট ছোট কাগজের টুকরো কেটে শব্দগুলোর ওপর আঠা দিয়ে মেরে দিয়েছিলেন।

কথা শুনতে শুনতে কংসাবতীর চোখে রূপকথা শোনার আগ্রহ ফুটে উঠেছিল।

তিনি বললেন, your grand father was a great man, বেঁচে আছেন?

না।

সোম বললেন, ভাববেন না, they will come back..... তিনজনকে একসঙ্গে কিডন্যাপ করা যায় না.....কংসাবতী মুখে হাত রেখে কাশলেন, যদি শেষ অবধি— আমরা এখন থেকেই খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে দিচ্ছি .... আপনি ভাববেন না ম্যাডাম, সোম বললেন, আপনার সঙ্গে কোনো গন্ডগোল হয়নি তো?

না। না—

তিনজনার মধ্যে দলের পান্ডা কাকে মনে হয় আপনার?

গায়ত্রী।

তার সম্বন্ধে একটু বলুন—।

সি ইজ আ নাইস গার্ল। মা বাবা পাঞ্জাবী। এখানেই জন্ম। নাচ গান জানে। রবীন্দ্রনাথের গান দারুণ গায়। স্কুলের সব ফাংশানে ওই হচ্ছে লিডার।

ফোন বেজে উঠতে থামলেন কংসাবতী। সোম রিসিভার তুলে কয়েক সেকেন্ড কথা বলার পর তাঁর দিকে তাকালেন, নাহ্, বোম্বে যায়নি ওরা। কনফার্মড। আপনার হোস্টেলের আশেপাশে যে সব ট্যাক্সি রেগুলার দাঁড়ায় তাদের কাছে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

আবার একটু চুপচাপ। কফির কাপ খালি। প্লেটের সব বিস্কুট পড়ে আছে, কেউ ছোঁয়নি।

সোম পিঠ সোজা করে বসতে বসতে বললেন, আসলে কোথাও একটা কিছু গন্ডগোল হয়ে গেছে। আমরা কেউই ধরতে পারছি না ব্যাপারটা।

আমার নিজের দুই মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আমাদের অমতে তার নিজের পছন্দের একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে। ছেলেটা খারাপ না, বাট নিজের মত অনুযায়ী চলে। এখন একটা মফঃস্বলের স্কুলের মামুলী মাস্টার। আমার মেয়ে কিন্তু তাতেই খুব হ্যাপি। yes happy.

ছোট মেয়ে brilliant girl. স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গিয়েছিল পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে। ফরেন সার্ভিসের ঝকঝকে একটা ছেলেকে আমার স্ত্রী ভাবী জামাই হিসেবে পছন্দ করে রেখেছিলেন। মেয়ে কি বলল জানেন, আমরা নাকি দুজনাই ওল্ড ফ্যাশানের মানুষ! বিয়ে টিয়ে ওর দ্বারা হবে না। এখন কি করছেন জানেন?

কংসাবতী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কি করছে?

হর্ষবর্দ্ধন পেছনে মুখ ঘুরিয়ে রবীন্দ্রনাথের ফটোটা দেখে নিয়ে বললেন, সেক্সওয়ার্কারদের ছেলেমেয়েদের জন্যে তাদের পাড়াতেই একটা অবৈতনিক স্কুল খুলেছে। একটি আমেরিকান ছেলে আর দুটো গ্রীস দেশের মেয়ে ওর সঙ্গেই পড়ায় সেখানে।

হর্ষবর্দ্ধনের ঠিক কতো বয়স তা আন্দাজ করা শক্ত। চওড়া কাঁধ, মেদহীন পেটানো শরীর। এবং দুটি স্বপ্নিল চোখ। বেশ সুপুরুষই বলা যায় তাঁকে। কিন্তু এই মুহূর্তে কংসাবতীর মনে হলো তিনি একটা ভাঙাচোরা মানুষের সামনে বসে আছেন, যার প্রাণশক্তি প্রায় নিঃশেষিত এবং একটা ছেদহীন দৌড়ের বাজিতে হেরে যাবার পরেও মাথা উঁচু করে ভিক্ট্রি স্টান্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাহলে—কংসাবতী নড়ে চড়ে বসলেন।

মিঃ সোম বললেন, আমরা ওদের আজই খুঁজে বার করবো dead or alive, আপনি এখন যান। ওদের ফটোগুলো আমার কাছেই থাকুক। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কংসাবতীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন হর্ষবর্দ্ধন, একদিন আমার বাড়িতে চলে আসুন, একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে। তাছাড়া আমার মিসেস ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত জানেন। শুনতে চাইলে—

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ানোর আগেই কংসাবতীর মন খারাপ হয়ে গেল।

হর্ষবর্দ্ধনের মেয়েদের থেকে তিনি নিজেও আলাদা কিছু নয়। নিজের বাবা মাকে ছেড়ে চোদ্দশো কিলোমিটার দূরের একটা অচেনা শহরে একা পড়ে আছেন কিসের লোভে? কেউ না জানলেও কারণটা তাঁর নিজের কাছে অজানা নেই।

হোস্টেলের সামনে নিজের জিপসি থেকে নামার পর কংসাবতী দেখতে পেলেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর প্রেসিডেন্ট দুজনা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।

দোতলার বারান্দায় মেয়েদের ভিড়। সামনের গেট হাট করে খোলা। হোস্টেল থেকে কিছুটা দূরে একটা পুলিশের জিপ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

(১৫)

সকালে চোখ খোলার পর কাজলের প্রথম মনে হলো সারারাত তার ঠান্ডায় খুব কষ্ট হয়েছে। বারবার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তারমধ্যেও সে এ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের স্বপ্নটা দেখেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য তার স্বপ্নের মধ্যে বারবার একটা তেজপাতা গাছ এসে পড়েছে। ঘুম ভাঙার পর ভুলটা ধরা পড়লো—এ.সি. মেসিনটা সারারাত খোলা ছিল। পাখাও ফুল স্পিডে ঘুরেছে। এয়ার কুলারের সুইচটা বন্ধ করার পর নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসলো কাজল।

এ্যালিস নয়, সে নিজেই একটা ওয়ান্ডারল্যান্ডে এসে পড়েছে। যেখানে অফুরন্ত বৈভবের মধ্যে একটা দুঃখী শিশু মনখারাপ করে ঘুরে বেড়ায়। আর একটা জেদি পুরুষ নিজের গুহার মধ্যে আড়াল করে রেখে নিজের শাসন চালায়। তারই মধ্যে একটা তেজপাতা গাছের মাথায় সকাল সন্ধ্যায় আপনমনে খেলা করে যায় শুরু আর শেষ বেলার রোদ্দুর।

Thanks গায়ত্রী। তোর জন্যেই আমরা হোস্টেল থেকে পালিয়েছি। আর না পালালে কোনোদিনই আমার এই এ্যালিসের ওয়ান্ডারল্যান্ডে আসা হতো না।

ভীমকে বারান্দায় আসতে দেখলো কাজল। তার হাতের ট্রেতে বেডটি। তার কাছেই আসছে ভীম। আরে, ওয়ান্ডারল্যান্ডে ভীমও তো আর একজন অদ্ভুত মানুষ। কাজল নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে ট্রেটা নিল। বলল, গুডমর্নিং ভীম।

ভীম কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসলো।

না ভীম, না, তুমি আমাকে কখনো স্যালুট করবে না। আমি কি বললাম বুঝেছ?

ভীম ঘাড় কাত করে জানালো সে কাজলের কথা বুঝেছে। চায়ের কাপে চুমুক দেবার পর তার মনে পড়লো, কাল বিকেলের পর থেকে তার অর্জুনের সঙ্গে আর দেখাই হয়নি। ভদ্রলোক রাত্তিরে কখন ফিরেছেন কে জানে। নিশ্চয়ই অনেক রাত্তিরে। রাত দশটা পর্যন্ত কাজল নিজেই জেগে ছিল। অর্জুন ফিরলে তার সঙ্গে দেখা হতো।

চায়ের কাপ নামিয়ে এক মিনিট ধরে সে ভাবলো এখন কি করা যায়। এত সকালে আকাশ নিশ্চয় ঘুম থেকে ওঠেনি। স্রেফ কিছু করার নেই বলেই শাড়ি জামা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লো সে।

হোস্টেলে কমন বাথরুম। চানের জন্য লাইন দাও। অন্য কাজের জন্যেও লাইন দাও এবং কপাল খারাপ হলে হঠাৎ জল চলে যাবার জন্যে সাবান মেখে আবার জল না আসা অবধি দাঁড়িয়ে থাকো।

এখানে বাথরুম মানে একটা পুরো শোবার ঘরের চেয়েও বড়। এ্যালিসের ওয়ান্ডারল্যান্ডে তাই তো হবার কথা। মেঝেয় পা দিয়ে আবার চমকে গেল কাজল। মেঝেটা মোটা কাচ দিয়ে আগাগোড়া মোড়া। সেখানে জল পড়ে প্রতিটি জলের ফোঁটা হীরের কুচি হয়ে যাচ্ছে।

এখান থেকে সাতদিন বাদে ফিরে গিয়ে হোস্টেলের বন্ধুদের কাছে গল্প করলে কেউ তার কথা বিশ্বাসই করবে না।

চান করে ওঠার পর দরজায় টোকার শব্দ শুনে বাইরে এলো কাজল—নমস্কার দিদি, আমি সনৎ। আপনার কি কি লাগবে আমায় বলে দিন। আমি এনে দেব।

আমার কিছু লাগবে না।

বাবু বলে গিয়েছেন, রাত্তিরে পরার ড্রেস কি বাজার থেকে কেনা হবে, না তৈরি করে নেবেন? আপনি বললে আমি দর্জিকে বলে দেব। এখানে এসে আপনার মাপটাপ নিয়ে যাবে।

শাড়িটাড়ি আমার সঙ্গেই আছে, কাজল হেসে ফেলল। নাইট গাউন পরলে রাত্তিরে আমার ঘুমই আসবে না।

সনৎ বলল, সাবান, তেল, ক্রিম, পাউডার এসব?

সব আছে।

বাবু বলে গেছেন, সনৎ বলল, বাবুর পড়ার ঘরে অনেক ইংরিজি উপন্যাস, গল্পের বইটই আছে, আপনার ইচ্ছে হলে ওখান থেকে বই নিয়ে নেবেন।

তোমার বাবু, মানে অর্জুনবাবু কোথায়, তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছিনে?

কাজলের কথা শুনে সনৎ একমুহূর্ত তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর বলল, বাবু তো এখানেই নেই।

নেই?

না, বেজিং গিয়েছেন। সাতদিন পরে ফিরবেন। কেন, আপনাকে কিছু বলে যাননি?

কাজল মাথা নাড়লো, না।

সনৎ বলল, বাবু এই রকমই হুটহাট চলে যান। অনেক সময় আমরাই জানতে পারি না। মেমসাহেব তো এই জন্যেই—কথাটা শেষ না করে চুপ করে গেলেন সনৎ। যখনই আপনার দরকার হবে আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমি যাচ্ছি।

কাল বিকেলের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে কাজলের। অর্জুন বলেছিল, ডিনারের সময় থাকতে পারবে না। তার সেই বলাটা এতো স্বাভাবিক আর এতোই ঘরোয়া ছিল যে শোনার পর তার মনে হয়েছিল—শুধু সন্ধ্যেটুকু, তারপরেই ফিরে আসবে মানুষটা। কাজল কল্পনাও করেনি তার যাওয়াটা মানে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে চীনের বেজিং শহরে চলে যাওয়া।

নাহ্—আমি এখানকার কোনো কিছুতেই আর অবাক হবো না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো সে। কিন্তু যদি সাতদিন পরেও না ফেরে অর্জুন? তখন কি করবে কাজল? এখানে, এই স্বপ্নের সংসারে এখনো তার মনে বসেনি। এখনো চেনা অচেনার ছমছমানিতে তার বুকে দুর্বোধ্য এক ভালোলাগা না লাগার শিহরণ। শুধুমাত্র তেজপাতা গাছটার পাতা নড়ানোর গান কি এখানে তাকে

বেঁধে রাখতে পারবে? না—। না।

অর্জুনের সংসারে মন বসার আগেই মন ভাঙার খেলা শুরু হয়ে গেল কাজলের মনে। মৌসুমী পাখির মতো তারও কোনো পিছুটান নেই—

কাজল নিজেকে শুনিয়ে ফিসফিস করে বললো, আমি পালাবো—আজই পালাবো এখান থেকে।

(১৬)

কই জানতে চাইলেন না তো, আমি কে?

দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করলো গায়ত্রী—।

আপনি, একটু সময় নিয়ে ভাবলো বীরু। তারপর বলল আপনি আমার একনম্বর এনিমি। আপনি আমাকে মরতে দেননি।

এখনো মরতে চান?

বীরু ঘাড় নাড়লো, না। আমি মরে গেলে প্রতিশোধ, মানে revenge নেবে কে।

কার ওপর revenge নেবেন?

সে একজন আছে।

আপনি তাকে এখনো ভালোবাসেন কিন্তু?

মোটেই না, কে বলল?

আমি বলছি। ছেলেরা ভালবাসা না মরা পর্যন্ত বুকের মধ্যে রেখে দেয়।

আর মেয়েরা—

গায়ত্রী হাসলো, মেয়েরা বড্ড স্বার্থপর, তারা—

এ কি, আপনি নিজে মেয়ে হয়ে এই সব বলছেন—?

গায়ত্রী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন। অনেকক্ষণ বসে আছেন। আমি বাইরে গিয়ে দেখি সকাল হলো কিনা—।

বীরু বলল, শুনুন শুনুন—

গায়ত্রী ফিরে এলো—কি হলো আবার?

আপনি চলে যাচ্ছেন না তো—?

না। গেলে আপনাকে বলেই যাবো।

থ্যাংস। চোখ বুজলো বীরু। তার ঠোঁটের কোলে জয়ের হাসি।

সত্যিই সকাল হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি জুড়ে তার আয়োজন। গায়ত্রীর

কপালে নতুন ভোরের আলো। অপলক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। আমাদের আপনি ক্ষমা করে দেবেন কংসাবতী ম্যাম, আমরা হোস্টেল থেকে পালাইনি। আমরা খুব কাছ থেকে মানুষ দেখতে চেয়েছিলাম। মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছিলাম। হোস্টেলের বদ্ধ ঘরে থাকলে বীরুকে কোথায় পেতাম।

আরে আপনি এখানে—সেই নার্সটি গায়ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াল। সকাল হওয়া দেখছেন?

গায়ত্রী হাত বাড়িয়ে তার হাত স্পর্শ করলো। কথা বলল না।

আসুন আমার সঙ্গে—নার্সটি বলল।

কোথায় যাবো?

আসুন না।

তার পেছন পেছন একটা ঘরে ঢুকলো গাযত্রী।

বসুন, এই খাটটাতেই বসুন। কেন ডেকে আনলাম আপনাকে বলুন তো?

গায়ত্রী দুপাশে মাথা ঝাঁকানো, জানি না।

কফি করেছি। আপনার জন্যেও করেছি, নিন।

গায়ত্রী বিনা প্রতিবাদে কফিতে চুমুক দিল—আঃ।

কি হয়েছিল, ঝগড়া করেছিলেন বুঝি? আমরাও খুব ঝগড়া করি। আবার একটু পরেই ভাব হয়ে যায়।

গায়ত্রী চোখ তুলে বলল, কার কথা বলছেন?

ঐ যে উনি, আপনার—

উনি আমার কেউ হন না, গায়ত্রী বলল, এমনকি আগে কোনদিন দেখিওনি—

সেকি, আমি তো ভেবেছিলাম, মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়লো।

আসলে কি হয়েছে জানেন, আমি রাত্তিরে থাকার মতো একটা জায়গা খুঁজছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ওনার ঘরে ঢুকে পড়ে দেখি—মরার জন্যে।

আজকাল এক শিশি বিষ খেলেও কেউ মরে না মেয়েটি বলল, আর একটু নেবেন?

না। গায়ত্রী বলল, আমি আর আমার দুই বন্ধু পালিয়ে এসেছি।

তাই—সেকি, পালালেন কেন....?

জানি না। অনেকদিন থেকে পালাতে ইচ্ছে করছিল।

অন্য বন্ধু দুজন, তারা কোথায়?

জানি না। জানি না।

এখন তাহলে কি করবেন? গায়ত্রীর হাত ধরলো সে। চলুন, আমার বাড়ি থাকবেন।

এখন আর তা হয় না জানেন, গায়ত্রী বলল। একজনকে কথা দিয়েছি, যে কদিন পালানোটা শেষ না হচ্ছে সে কদিন তার কাছেই থাকবো।

কাকে কথা দিয়েছেন?

চোখের ইশারায় গায়ত্রী বীরুর ঘর দেখিয়ে দিল।

(১৭)

সন্দীপ। এই হচ্ছে তাহলে সন্দীপ—নিজেকে আড়ালে রেখে সন্দীপকে দেখছিল আন্নু। ধ্যাৎ, বড্ড বেশি ফর্সা। ছেলেরা বেশি ফর্সা হলে কেমন যেন বোকা বোকা লাগে। আবার গোঁফও আছে বাবুর। নাহ্, পুলিস বলে একটুও মনে হচ্ছে না। টেনিস খেলোয়াড় মার্কা চেহারা, হাতে শুধু র‍্যাকেটখানা নেই।

লুকোচুরি খেলার মতো করে আন্নু এ দরজা থেকে ও ঘরের দরজার পেছনে, পর্দা টেনে তার আড়ালে—এবং শেষ অবধি ধরাই পড়ে গেল।

স্বরাজ ডাকলেন, আয় বেরিয়ে আয়। অতো লজ্জা করতে হবে না।

পুলিশের মার্কা মারা পোষাক ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরেছে সন্দীপ।

ইস্, আমি না একটা যাচ্ছেতাই। কালরাতের সেই শাড়িখানাই এখনো পরে আছি— মনে মনে নিজেকে গালাগাল করতে ইচ্ছে করছিল আন্নুর, কি ভাববেন এই ভদ্রলোক?

বাইরে বেরিয়ে সন্দীপের মুখোমুখি দাঁড়াল আন্নু, নমস্কার, আপনি কিন্তু মোটেই পুলিশের মতন দেখতে নয়।

আপনাকে কিন্তু ঠিক একজনার মতো দেখতে—

সন্দীপ নমস্কার ফিরিয়ে না দিয়েই বলল।

কার মতো দেখতে আমাকে? বলুন।

সন্দীপ হাসছে। বলল, বাড়ি থেকে যারা পালায় তাদের মতো।

মোটেই না। মোটেই না—

এই, এই তুই ওকে কি বললি, মাসী এগিয়ে এলেন। বেশ করেছে পালিয়ে এসেছে, তাতে তোর কি?

এ বাড়ির দুজনাই এখন পুরোপুরি আন্নুর দিকে। হঠাৎ দমকা বাতাসের মতো উড়ে আসা ভয়টা তার বুকের মধ্যে থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে। গালে এখন টোলটা নেই, তাও সন্দীপের দুচোখে নীরব বন্দনা।

রাগ করলেন নাকি?

আন্নু সন্দীপের কথার উত্তর না দিয়ে মাসীর পেছনে গিয়ে মুখ আড়াল করলো।

সরি—সন্দীপ একই জায়গায় বসে আছে। মা, তোমার মেয়েকে বলো পুলিশের কথায় রাগ করতে নেই।

হেমলতার কাঁধের ওপর আন্নুর থুতনি। চোখ দুটো অন্যদিকে চেয়ে আছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আছে হেমলতাকে।

মা, একজন যদি কথা না বলে তাহলে বরং লালবাজার চলে যাই। ড্রাইভারকে ছাড়িনি এখনো।

তোমার তো আজ ছুটি, বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ স্বরাজের, ফোনে তো তাই বলেছিলে তুমি।

ছুটি—সন্দীপ উঠে দাঁড়ালো, পুলিশের ডিক্সনারিতে ছুটি শব্দটা নেই বাবা। but তোমাদের মেয়ে কথা বলুক আর নাই বলুক, আমি আজ কোথাও যাচ্ছি না।

আন্নুর বুকের মধ্যে এইমাত্র একটা ঝর্ণা বইতে শুরু করেছে। গালের টোলটা ফিরে এসেছে। কপালে থুতনিতে লালের টান।

হেমলতা তাকে ছুঁয়ে বললেন, চল্। আমার সঙ্গে রান্নাঘরে চল্ ও যেমন তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছে, থাকুক একা একা।

হেমলতার সঙ্গে যেতে যেতে চকিত দৃষ্টি ফেলে সন্দীপকে একবার জরিপ করে নিল আন্নু।

বাইরে এসে বলল, চা খাবার সব আমি করবো কিন্তু।

হেমলতা অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকে দেখতে দেখতে বললেন, আচ্ছা।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল কিন্তু চা খেতে খেতে কৌশিকের কথাটা তুললেন স্বরাজ, শোনো। তোমাকে একটা আরজেন্ট কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

সন্দীপ পাল্টা প্রশ্ন করলো।

অনুরাধার ভাই কৌশিক এখানেই কোথাও থাকে। ওকে খুঁজে বার করতে হবে। তুমি এসে এ কাজটা করে দেবে বলে অনুরাধাকে আমরা আটকে রেখেছি।

এই কাজ—সন্দীপ ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দিতে চাইল না, ঠিক আছে, আমি লোকাল থানায় বলে দেব।

না না—

আন্নুর হঠাৎ আপত্তিতে তার দিকে ঘুরে তাকাল সন্দীপ, কি হলো?

পুলিশকে বলতে হবে না, আপনি নিজে—

আমাকে খুঁজতে হবে, well, আপনার ভাইয়ের নামটা কি যেন?

কৌশিক।

কি রকম দেখতে, মানে চেহারা টেহারা আর কি।

লম্বা, রোগাও না মোটাও না। ফুটবল খেলে...। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানকার একটা নাম করা ক্লাবে। চিঠিতে তাই লিখেছিল।

কই চিঠিটা দেখি—

বারে, ওটা সঙ্গে করে এনেছি নাকি—

তাহলে এ বাড়ির ঠিকানাটা মুখস্ত করে রেখেছিলেন বলুন। এ বাড়ির ঠিকানা কথাগুলো সন্দীপ এমন করে বলল, যাতে আবার রেগে গেল আন্নু—উঠে দাঁড়িয়ে বলল. আর কিছু বলবো না আমি, কিচ্ছু বলবো না আপনাকে—

ওকি, চা টা খেয়ে যান—

স্বরাজ এতক্ষণ দুজনার কথাবার্তা উপভোগ করছিলেন। সুখ যখন আসে কত সহজেই না আসে। কতো নিরাভরণ হয়ে আসে।

একটা স্বপ্ন, যেটা কালও সাহস করে দেখতে পারেননি আজ মনে মনে দুহাত বাড়িয়ে তাকেই আহ্বান জানালেন স্বরাজ—আয়, আয় আমার বুকজুড়ে আয়। এই স্বপ্নটা দেখবো বলেই তো এতকাল বেঁচে আছি।

(১৮)

Sorry মিস মেনন, আপনাকে আজও ভালো খবর দিতে পারছিনা।

হর্ষবর্দ্ধন সোম হতাশ ভাবে হাত নাড়লেন, আশ্চর্য মেয়ে তিনটে যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। No trace. কংসাবতী নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন।

সোম তাই দেখে বললেন, ওকি উঠছেন কেন, বসুন। আমরা ট্যাক্সিওলাটাকে ধরার চেষ্টা করছি। তাকে পেলে দেখবেন ওদের ধরে ফেলতে আর বেশি সময় লাগবে না।

কংসাবতী চুপচাপ কথা শুনছেন।

হর্ষবর্দ্ধন একজনকে ডেকে দুকাপ কফি দিতে বললেন। এবং মুদ্রাদোষের মতো পেছন ফিরে রবীন্দ্রনাথের ছবিখানা দেখে নিলেন।

কংসাবতী এতক্ষণ ধরে যে কথাটা বলবেন কিনা ভাবছিলেন সেটা বলেই ফেললেন, মিঃ সোম, আমি কলেজে রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছি।

What—, এই একটা সাধারণ কারণে resignation দিয়ে দিলেন! সোম মুখ সিরিয়াস করলেন, আপনাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল?

না। মিস মেনন বললেন, আজ তিনদিন হয়ে গেল। মেয়েগুলোর কোনো

খোঁজ নেই। আপনারাও কিছু করতে পারলেন না। এই অবস্থায় আমার responsibility আমি অস্বীকার করবো কি ভাবে?

আপনারা মেয়েরা বড্ড sentimental। সোম সহজ গলায় বললেন, যতক্ষণ না তাদের ডেডবডি পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা—জাস্ট এ মিনিট।

ফোনের রিসিভার তুললেন সোম, বলো ....good.... বাঃ, কিছু বলেছে? বলেছে. fine. Salt Lake ঠিক আছে। ও কে মারধর কোরো না যেন—

রিসিভার নামিয়ে সোম হাসলেন, ট্যাক্সিটা পাওয়া গেছে। ড্রাইভার বলেছে ওদের Salt Lake এ নামিয়েছে। ওই একটা জায়গা হয়েছে, সবরকমের ক্রিমিন্যাল ওখানেই shelter নিচ্ছে আজকাল। কদিন আগেই কাগজে দেখেছেন বোধহয়। একটা drug চোরাচালানকারীদের বড় দলকে ওখান থেকেই ধরা হয়েছে।

দাঁড়ান, আর একবার কফি দিতে বলি। হ্যাঁ, এখান থেকে গিয়েই resignation টা withdraw করে নেবেন, my request মিস মেনন।

ওদের পাওয়া যাবে মিঃ সোম?

যাবে। আজ রাতের মধ্যেই আমরা ওদের নেট করে ফেলবো।

কফি খাবার ফাঁকে ফাঁকে হর্ষবর্দ্ধনকে দেখছিলেন কংসাবতী। বাইরে থেকে বোঝা যায় না এই মানুষটাকেও একটা স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। নিজের মেয়েদুটোকে নিজের স্বপ্নের সঙ্গে মেলাতে পারেননি।

আশ্চর্য, দুঃখ ছাড়া মানুষ হয় না।

একটু সময় চুপচাপ থাকার পর কি বলবেন না ভেবেই কংসাবতী দুম করে বলে ফেললেন, ঠিক আছে মিঃ সোম, আপনি বলছেন, registration আমি তুলে নেব।

হর্ষবর্দ্ধন কথা না বলে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখে নিলেন।

তারপরেই দরজার বাইরে একটা ছায়া পড়লো। পর্দাটা সামান্য ফাঁক হয়ে একটি মুখ ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বললো—গুড মর্নিং স্যার।

এসো—এসো, সন্দীপ।

সন্দীপ ভেতরে এসে দাঁড়াল। তারপর সোজা হয়ে জুতোয় জুতো ঠেকিয়ে স্যালুট করলো—।

সোম আরাম করে চেয়ারে পিঠ রাখলেন, কোথায় গিয়েছিলে মরতে।

বহরমপুর স্যার। একটা মার্ডার কেসের—

কবে ফিরেছো, গতকাল?

Yes sir.

হুম, যাও আরও দিন কতক বাড়িতে শুয়ে ঘুমোও, গেট আউট—

স্যার, খুনের কেসটা solve হয়েছে। আমরা খুনিকে অ্যারেস্ট করেছি—

তুমি এক কাজ করো সন্দীপ, ওই খুনটুন মাথা থেকে দূর করে দাও। যদি তোমার আমার দুজনার চাকরি রাখতে চাও তাহলে go and meet O.C. Salt Lake থানা। বসো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন।

কংসাবতী বুঝতে পারছিলেন না তাঁর এখানে থাকা উচিত কিনা। তাঁর মনের কথা সোম বোধহয় বুঝতে পারলেন, আপনার যাবার দরকার নেই মিস মেনন্। সন্দীপ—

ইয়েস স্যার—।

Meet Ms. Menon.

সন্দীপ হাত বাড়িয়েই হাত সরিয়ে নিল, নমস্কার—

সোম বললেন, আপনি ওকে কি কি হয়েছে সব বলুন মিস মেনন্। আপনার মেয়েদের খুঁজে বার করার দায়িত্ব এখন থেকে ওর।

(১৯)

বিকেলের আগে থেকেই পার্কটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কাজল। সে দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর দূরে আন্নুকে দেখতে পেল। সে তার দিকেই আসছে।

হাই—

হাই—।

কতক্ষণ এসেছিস?

একটু আগে। কাজলের পরনে শাড়ি। শাড়ির চওড়া পাড়টা তার কাঁধের ওপরেই পড়ে আছে।

আন্নু বলল, এই কোথায় আছিস রে? কেমন আছিস? শিগগির বল, শোনার জন্যে বুকের মধ্যেটা—

কাজল বলল, আগে তুই বল্ কেমন আছিস—

আন্নুর হাতের মুঠোয় ওড়নার একটা অংশ। সেটা পাকাতে পাকাতে বলল, থ্রিলিং, আমি যে এতো মিথ্যে কথা বলতে পারি আমি নিজেই জানতাম না। জানিস আমার বাড়ি কোথায়? কৃষ্ণনগর। জানিস আমার ভাইয়ের নাম কি? কৌশিক—কথা বলতে বলতে ঝর্ণার মতন হাসতে থাকলো সে।

কাজল প্রশ্ন করলো—বাড়িতে কে কে আছে রে?

Only বুড়ো এন্ড বুড়ি। এন্ড তাদের একমাত্র ছেলে। তুই কাছে থাকলে এতক্ষণে ঠিক জমিয়ে ফেলতিস, কিস টিস করাও হয়ে যেতো তোদের।

ভালো দেখতে বুঝি?

ভাবতে পারবি না তুই—হিন্দি ফিল্মের টপ হিরোও নখের যুগ্যি নয়।

এই—এই তুই—

না, নাহ্, মোটেই না, আন্নুর চোখের মণি দুটোতে ছায়া পড়লো। লোকটা পুলিশ.....

পুলিশ—সর্বনাশ! কাজল অবাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাওয়াটাকে গোপন করলো না। এখনো ওখানে আছিস, পালা শিগগির।

না, তা হবে না, আমিও ভেবেছিলাম পালাবো—কিন্তু, আন্নু পার্কের ওপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে আনলো, মেশোমশাই মাসীমাকে ছেড়ে কিছুতেই।.......... জানিস কাজল, সারারাত আমার গায়ের ওপর হাত দিয়েছিলেন, যাতে আমি না পালাতে পারি—

মাসীমা, মেশোমশাই,—কাজল ভুরু কুঁচকে তাকালো, তোকে আর ভগবানও বাঁচাতে পারবেন না।

আন্নু বলল, এই যাবি আমার সঙ্গে, সন্দীপের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

নারে, আমার সময় নেই—

আন্নু তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। বলল, তুই এমন করে কথা বলছিস যেন বাড়ির গিন্নি আর গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ের মা।

Yes, কাজল সিরিয়াস হবার চেষ্টা করলো। একছেলের মা। তার সঙ্গে গোটা একটা সংসার। বুঝলে বৎসে, আমার কত্তা, একটু আসছি বলে কোথায় গিয়েছেন জানো?

কোথায়?

বেজিং—।

সেখানে কেন গিয়েছে রে?

ব্যবসা, ব্যবসা, এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট, আরো যেন কি কি সব আছে।

চলবে, আন্নু হাততালি দিয়ে উঠলো, বুড়ো?

ধ্যাৎ, বুড়ো তোর কপালে জুটুক। জোয়ান। দুমাস হলো বৌটা পালিয়েছে।

বৌ পালিয়েছে, সেকি! কেন?

কেন তা কি করে জানবো।

বৌ পালিয়েছে, তোকে কে বলল?

যার বৌ নেই, সেই বলেছে।

নির্লজ্জ, রাবিশ—আন্নু ঠোঁট বেঁকাল, খবরদার ও বাড়িতে থাকিস না কাজল, নির্ঘাত লোকটার চরিত্র খারাপ।

কাজল তার কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, এই, তুই তেজপাতা গাছ দেখেছিস কখনো?

না।

আমাদের বাড়িতে আছে—,

আন্নু তেজপাতা গাছ নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ না করে বলল, গায়ত্রী তো এলো না এখনো—, তার কি হয়েছে বলতো?

কি করে বলবো, কাজলকে একই রকম চিন্তিত দেখাল, ও আবার হোস্টেলে ফিরে যায়নি তো। নিশ্চয় আসবে গায়ত্রী। আন্নু দূরের চৌরাস্তার দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আর কিছুক্ষণ দেখি। কাজলও একই দিকে তাকিয়েছিল। চোখ না ফিরিয়ে বলল, আন্নু চল ফুচকা খেয়ে আসি। কাছেই একটা ফুচকাওলা ফুচকা বিক্রি করছে।

চল্, তার পাশে পাশে পা চালিয়ে আন্নু প্রশ্ন করলো, নাম কিরে?

কার?

স্টুপিড—

ওহ, ভদ্রলোকের নাম অর্জুন। তোর?

সন্দীপ।

সত্যি কথা বলছিস তো—?

এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

ফুচকা খাবার পর ভুলটা ধরা পড়লো। দুজনার কারুর কাছেই পয়সা নেই।

কতো হয়েছে ভাই?

বারো টাকা মাইজি—

এই, ফুচকাওলা তোকে মাইজি বলল। আন্নু মুখে হাত চাপা দিয়েও হাসি চাপতে পারলো না।

কাজল ফুচকাওলা তোকে মাইজি বলল। আন্নু মুখে হাত চাপা দিয়েও হাসি চাপতে পারলো না।

কাজল ফুচকাওলাকে বলল, টাকার ব্যাগটা আনতে ভুলে গিয়েছি ভাই, তোমার টাকার কাল দিলে হবে?

ঠিক আছে, কাল পরশু যবে ইচ্ছে দিয়ে যাবেন।

উল্টোদিকে থেকে একটা স্কুটার আসছিল। কাজলকে দেখে স্কুটারটা তার প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়লো—একি ম্যাডাম, আপনি এখানে কি করছেন?

ফুচকা খেতে এসেছিলাম।

খেয়েছেন ফুচকা?

হ্যাঁ, আমি আর ও।

উনি, সনৎ একটু হোঁচট খেল। এখানে আসতে না আসতে আপনার ফ্রেন্ড হয়ে গেল? ফুচকার দাম দেননি তো?

কাজল মাথা নাড়লো।

কতো হয়েছে, আমি দিচ্ছি—। এই কতো হয়েছে তোমার? স্কুটার থেকে নেমে দাঁড়াল সনৎ, এই নাও তোমার টাকা। ভাগ্যি আপনি দামটা দিয়ে দেননি, বাবু শুনলে আমাকে খুব বকতেন।

স্কুটারে উঠে স্টার্ট দিল সে, চলি, একটা জরুরি কাজ আছে, সেটা সেরেই চলে আসবো।

সে চলে গেলো।

আন্নু বলল, কে রে?

সনৎ। কেয়ার টেকার। কাজলের মুখের ওপর খুচরো চুল উড়ে এসে পড়েছে। এখন কেমন যেন অন্য রকম দেখাচ্ছে তাকে।

আন্নুকে লক্ষ্য করে সে বলল, কি ভাবছিস রে?

সনৎ লোকটা কিন্তু—

সনৎ লোকটা কি?

আন্নু বলল, তোর অর্জুনের ইনফরর্মার নয়তো? হয়তো তোর ওপর নজর রাখছিল। তুই কি করছিস, কোথায় যাচ্ছিস—তারপর—

ভাগ—কাজল তার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলল, দেখেছিস, তুইও পুলিশ হয়ে যাচ্ছিস—কিন্তু, মাত্র দু রাত্তির বাস করেই তোর গায়ে সন্দীপের হাওয়া লেগে গেছে!

দু'জনাই একসঙ্গে হি হি করে হেসে উঠলো। হাসি থামার পর দুজনার মুখেই চিন্তার মেঘ জমলো, গায়ত্রীর নিশ্চয় কিছু বিপদ হয়েছে। আমারও তাই মনে হচ্ছে, কাজলের হাত ধরে টানলো আন্নু। চল্, ওই দিকের বাড়িগুলোয় দেখি।

(২০)

গায়ত্রী ঘরে ঢুকে বীরুকে বলল, চলুন, ট্যাক্সি এসেছে।

বীরু একটু ইতঃস্তত করছিল, একানকার টাকা পয়সা?

সব দেওয়া হয়ে গেছে।

কে দিল?

বাড়িতে গিয়ে শুনবেন, চলুন এখন।

আর কথা না বাড়িয়ে বীরু গায়ত্রীকে অনুসরণ করলো। সে যখন এখানে

এসেছে তখন তার জ্ঞান ছিল না। এখন ফিরে যাচ্ছে সজ্ঞানে, নিজের পায়ে হেঁটে। সালোয়ার কামিজ পরা যে মেয়েটি তার সামনে সামনে হাঁটছে সত্যিই যে কে তা এখানে জানে না সে। তবু তার মন বলছে, চেনা অচেনা যেই হোক ওর জীবনটা সেই বাঁচিয়েছে এবং সারারাত নার্সিংহোমের একটা টুলে তার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষাতেই বসে থেকেছে। মরা বাঁচার সীমারেখাটাও বড় অদ্ভুত। ছাব্বিশ বছরের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বীরু চৌধুরী, মৃত্যুটা তুমি অতো কাছ থেকে না দেখলে হয়তো নিজেকে এমন করে আবিষ্কারই করা হতো না তোমার—

বীরু নিজের সঙ্গে কথা বলছিল। সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। বলল, একটু দাঁড়ান, আসছি এক্ষুনি। স্বাভাবিক পা ফেলে ওপরে উঠে গেল সে।—এই যে আপনাকেই খুঁজছি—।

নার্স মেয়েটি বলল, আমাকে?

হ্যাঁ। আমি চলে যাচ্ছি।

জানি। আর কক্ষনো ওই রকম ভাবে এখানে আসবেন না। ছেলেদের হেরে যেতে দেখতে ইচ্ছে করে না।

যা বলবে বলে এসেছিল বীরু তা তার বলা হলো না।

ট্যাক্সিতে উঠে বসার পর আপন মনে বলল, পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ কি জানেন?

গায়ত্রী মাথা নাড়লো, জানি না।

বীরু বলল, মানুষ চেনা।

তারপর চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে চারপাশের চলমান ছবির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। ইস্ কি সুন্দর করে দুটি মানুষ গাড়ির ভিড় টপকে ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে উঠলো।

বুকের মধ্যে করকর করে উঠলো তার।

(২১)

কদিন পর বিকেলে তেজপাতা গাছের পাশের সবুজঘাসে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছিল কাজল আর আকাশ। এরই মধ্যে কখন নিঃশব্দে অর্জুনের গাড়ি ভেতরে ঢুকেছে বিন্দুমাত্র টের পায়নি তারা।

অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে তাদের খেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে এলো, গুড ইভিনিং—কেমন আছেন? পেছনে মুখ ফিরিয়ে কাজল অপ্রস্তুত একি আপনি, আপনি মানে—

ভালো ছিলেন? কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

রাকেটখানা পেছনে লুকিয়ে কাজল বলল, না না, কোনো অসুবিধে হয়নি।

ভাব হয়ে গেছে তাহলে?

আকাশের দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকালো কাজল। মার জন্যে বায়না করেনি?

না।

গুড্। খেলা শেষ করে একবার আমার ঘরে আসবেন kindly.

আচ্ছা।

অর্জুন ছেলের দিকে হাত তুলে নিঃশব্দে চলে গেল। সে যাবার পর কাজলের মনে হলো—ইস্ একটা খুব ভুল হয়ে গেল—। ভালো আছেন তো এই কটা কথা অর্জুনকে সে জিজ্ঞেস করলে পৃথিবী রসাতলে চলে যেত না।

কপালে ঘাম, থুতনিতে ঘাম। সেই ঘাম মুছতে মুছতে অর্জুনের ঘরের বাইরে এসে একটু দাঁড়াল সে। তারপর কি ভেবে নিজের ঘরে ফিরে এলো। সেখান থেকে জলের ঝর্ণা ধারার নিচে।

তার ব্যাগে সালোয়ার কামিজ আছে। কটকি কাজ করা সারা গায়ে। বাবার অফিসের কে এক বন্ধু সপরিবারে পুরীতে বেড়াতে গিয়ে তার জন্যে এনেছিলেন।

কটকি সালোয়ার কামিজটা ব্যাগ থেকে বার করে হাতে নিযে দেখল। তারপর আবার ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখলো। শাড়ি পরলো। মুখ পরিষ্কার করার পর যেটুকু ক্রিম মাখলে বোঝা যায় না সেইটুকু ক্রিম মুখে দিয়ে দু আঙুলে ঘসে ঘসে শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে দিল। আয়নার সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ানোর পর বেরিয়ে এলো।

আগে কখনো অর্জুনের ঘরে ঢোকেনি কাজল। অর্জুনও ডাকেনি তাকে। আজ হঠাৎ কেন ডাকলো কে জানে। নাহ, এই নিয়ে একবারও ভাবলো না সে। স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল, আসবো—?

আসুন—আসুন—।

একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে অর্জুন। গায়ে সিল্কের ড্রেসিং গাউন। কোমরের দড়িটা বাঁধা নেই। নিচের ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবিটা দেখা যাচ্ছে।

বসুন।

কাজল নিঃশব্দে বসলো।

আমি ইচ্ছে করেই একটা কথা আপনাকে বলিনি, অর্জুন তার দিকে তাকিয়ে থেকে কথা বলছে। কারণ আমি চেয়েছিলাম আপনি এ বাড়ির একজন হয়ে

থাকুন। I am very happy to see my son....। ওর সঙ্গে আপনার ভাব হয়ে গেছে, আপনি ওর গভর্ণেস জানলে ও আপনাকে মানতে চাইতো না।

একটু চুপচাপ সময়।

আমাকে মাঝে মাঝেই বাইরে চলে যেতে হয়।

অর্জুন কথা বলতে বলতে অল্প অল্প দুলছে। কখনো কাছে, কখনো দূরে। অনেক সময় আমি নিজেও খুব কম সময় পাই...., আপনাকে না বলতে পারলে রাগ করবেন না।

আর একটা কথা, আমি যখন থাকি না তখন গাড়িটা থাকে। আকাশকে নিয়ে যেখানে ভালো লাগে চলে যাবেন।

আমি ড্রাইভিং জানি না—

কাজলের না জানাটাতে বোধহয় একটু অবাক হলো অর্জুন। তার অবাক হওয়াটা এতই ক্ষীণ যে বুঝতেই পারলো না কাজল।

অর্জুন বলল, সনতের কাছে শুনলাম এখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে। তাকে আসতে বলবেন, তাহলে আপনার আর একা একা লাগবে না। আর আটকাবো না আপনাকে, আকাশ বোধহয় আপনার জন্যে wait করছে—

কাজল উঠে দাঁড়াল।

এক মিনিট, এটা আপনার জন্যে এনেছি—

থ্যাংস্—

ছোট্ট মোড়কটা হাতে করে নিজের ঘরে এলো কাজল। ভালো মন্দ কিছুই ভাবছে না সে। বুকের মধ্যে হৃদপিন্ডটা স্বাভাবিক ছন্দে চলছে। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই। তাও তাকে আশ্চর্য একটা বোধ ভেতরে ভেতরে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। দূর—বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসলো কাজল। মোড়কটা খুলে ফেলল—ছোট্ট এটা ঘড়ি—বিউটিফুল।

কিছু না ভেবেই কাজল ঘড়িটাকে মুঠোর মধ্যে করে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

(২২)

এই মেয়ে কোথায় গিয়েছিলি রে?

হেমলতা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে।

আন্নু বলল, ফুচকা খেতে। আচ্ছা সকাল থেকে একজনকে আজ দেখতে পাচ্ছিনা কেন বলতো?

কাকে রে!

আন্নুর চোখে দুষ্টুমি, কাকে আবার, তোমার বরকে। লুকিয়ে লুকিয়ে দুজনা ঝগড়া করেছ নাকি?

দূর ছুঁড়ি—আমার ঝগড়া আসে না। হেমলতা বললেন, গিয়েছে পেনশনের টাকা তুলতে। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবে।

আপনমনে হেমলতা হাসছিলেন দেখে আন্নুর কেমন যেন সন্দেহ হলো। বলল, কি হয়েছে বল তো, হাসছো কেন?

ওমা, হাসলাম আবার কখন। আয় ভেতরে আয়, কতক্ষণ থেকে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছি।

আন্নু নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলো।

সালোয়ার কামিজ পরেছে এখন। মাথার চুলে ক্লিপ আঁটা। দু' ভ্রূর মাঝখানে ছোট্ট লাল টিপ।

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলেন হেমলতা—বালাই ষাট, চোখ লেগে যাচ্ছিল তাঁর। হিংসা করতে ইচ্ছে করছিল সেই অদেখা নারীকে—যাকে এই মেয়ে মা বলে ডাকে।

তাঁর লোভের কথাটা বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করেননি হেমলতা, তাও টের পেয়ে গিয়েছেন স্বরাজ।

সন্ধ্যের আগে আগে ফিরে এলেন স্বরাজ।

পরিশ্রান্ত। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, কোথায় গেল?

কার কথা জিজ্ঞেস করছো?

জানো না কার কথা?

পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন হেমলতা।

তোমার ওপর রাগ হয়েছে।

স্বরাজ ব্যস্ত হলেন, আমি আবার কি করলাম?

ওকে না বলে গিয়েছ, তারপর এত বেলা অবধি দেখা নেই। দুপুরে কিছুতেই একলা খাবে না, শেষে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে খাইয়েছি।

স্বরাজের হাত ভর্তি জিনিস। অনেক জিনিস এখনো সল্টলেকে পাওয়া যায় না। কলকাতা গেলেই তাই নিয়ে আসেন স্বরাজ।

তাছাড়া পকেটে পেনসনের টাকা থাকে বলে মনটাও একটু অন্য রকম হয়ে যায়। একটু বেহিসেবী খরচা হয়ে যায়।

পাশের ঘরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেন স্বরাজ। এই কি করছিস রে?

আন্নু বসেছিল। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল—কখন এলে? দাঁড়াও তোমায় চা করে দিচ্ছি। এখন কিন্তু খবরদার বৌয়ের হাতের চা খেতে পারবে না।

হাল্কা প্রজাপতির মতন উড়তে উড়তে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল আন্নু। স্বরাজ সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, তোর হাতের তৈরি এই এককাপ চা খাবার জন্যে আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে পারি, তা কি তুই জানিস।

এই নাও চা, আর খাবার। খাবারগুলো আর একজনার তৈরি কিন্তু।

তোয়ালেতে মুখ মোছার পর সেখানা চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে স্বরাজ বললেন, বিকেলে কোথায় গিয়েছিলি রে?

কে বলল, অমনি আসতে না আসতেই রিপোর্ট হয়ে গিয়েছে বুঝি!

মুহূর্তের মধ্যে চোখেমুখে ঝড়ের আভাস।

তা দেখেও না দেখার ভান করলেন স্বরাজ। বললেন, রিপোর্ট না করলে তাদের যে চাকরি চলে যাবে।

আয়, তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি দেখে যা।

কি এনেছ শিগগির বলো কি এনেছ? শোন পাপড়ি? কেক না লঙ্কার আচার?

ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা বার করে সময় নিয়ে খুললেন স্বরাজ। ততক্ষণে আন্নু বুঝে ফেলেছে কি জিনিস।

শাড়ি, একি তুমি আমার জন্যে শাড়ি এনেছ কেন?

তুই পরবি বলে।

না, শাড়ি আমি নেব কেন.....?

নিবি না কেন তাই বল।

উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকলো আন্নু। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে বসে থাকলেন স্বরাজ। কঠিন বাস্তবটা কি করে ভুলে ছিলেন তিনি, মনে মনে নিজের কাছেই কৈফিয়ৎ চাইলেন।

হঠাৎ উড়ে আসা একটুকরো ঝড়কে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে আটকে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি আর হেমলতা। তাকে যে আটকানো যাবে না এই নির্মম সত্যটা জেনেও মন মানতে চায়নি তাঁদের।

কী আশ্চর্য দ্রুততায় তুমি থেকে তুই-এ নেমে এসেছিলেন হেমলতা। কী অসীম বিশ্বাসে একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন তিনি নিজে—ও কি, চা না

খেয়ে উঠছো যে— হাত ধরে টেনে স্বরাজকে আবার বসিয়ে দিল আন্নু, তুমি যদি আমার দেওয়া চা না খাও, তাহলে কিন্তু—

আজ দুপুরে কি হয়েছে জানো, আমি আর আমার বন্ধু দুজনে মিলে বারো টাকার ফুচকা খেয়ে দেখি দুজনার কাছেই টাকা নেই—

কথাটা বলতে বলতে স্বরাজের দিকে চোখ পড়তেই চুপ করে গেল সে। তারপর ঢোক গিয়ে বলল, আমি জানি, এক্ষুনি তুমি জিজ্ঞেস করবে এখানে তোর বন্ধু এলো কোথা থেকে। আমি কি করবো বলো, কেউ যদি এসে বলে আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে।

মেয়েটা কোথায় থাকে?

ওইদিকের একটা বাড়িতে।

কোন বাড়িতে?

আমি অতো নম্বর টম্বর জিজ্ঞেস করিনি। সেই বলছিল তাদের বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে। বাড়ির বাগানে তেজপাতা গাছ আছে—

কে কে আছে তাদের বাড়িতে?

রীতিমত জেরা করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছিলেন স্বরাজ। আন্নু বলল, সব্বাই আছে, ঠাকুর, চাকর। মালি, দারোয়ান। শুধু—

কথাটা শেষ করলো না সে—।

শুধু কি?

বৌটা পালিয়েছে— হেসে গড়িয়ে পড়লো সে।

হেমলতা বললেন, খবরদার ঐ মেয়েটার সঙ্গে মিশবিনা তুই।

ওর সঙ্গে আর আমার দেখাই হবে না।

স্বরাজ আর হেমলতা একমুহূর্তের জন্যে পরস্পর তাকাতাকি করলেন।

হেমলতা বললেন, শাড়িটা তাহলে কাল ফিরিয়ে দিও—

আচ্ছা—

ছোঁ মেরে স্বরাজের হাত থেকে শাড়ির প্যাকেটটা তুলে নিল আন্নু, আচ্ছা লোক তো তোমরা। শাড়ি আমি নিই না নিই, আমার পছন্দ হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করেছ?

কথা বলতে বলতে সে প্যাকেটটা খুলে ফেলল। শাড়িটা দুহাতে নিজের গায়ের ওপর মেলে ধরে বলল, তুমি কি করে জানলে এই রংটা আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ।

হেমলতা আর স্বরাজ আবার মুখ তাকাতাকি করলেন। আগের মেঘটা কেটে যাচ্ছে কিন্তু আর একটা অবাঞ্ছিত মেঘ কোথা থেকে যেন উড়ে আসার চেষ্টা

করছে—তেজপাতাওলা বাড়িটা খুঁজে বার করতে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। ও বাড়ির মেয়ে কেন গায়ে পড়ে আন্নুর বন্ধু হতে চায় তার খোঁজ নিতে হবে।

কথাটা মনে মনে স্থির করলেও মুখে কিন্তু স্বরাজ কিছু প্রকাশ করলেন না।

(২৩)

সন্দীপ বলল, মিস মেনন, আমার চেম্বারে চলুন, ওখানে বসে কথা হবে।

কংসাবতী উঠে দাঁড়ালেন।

হর্ষবর্দ্ধন বললেন, ম্যাডাম। আমার বাড়ির চায়ের নেমন্তন্নের কথাটা কিন্তু ভুলে যাবেন না।

উত্তরে কংসাবতী বললেন, না না ভুলিনি। নিশ্চয় যাবো। চায়ের সঙ্গে আপনার মিসেসের গান ও শুনে আসবো।

দু'জনে দরজার বাইরে চলে যাবার পর মিঃ সোমের পিওন দৌড়ে গিয়ে সন্দীপকে বলল, স্যার আপনাকে ডাকছেন।

ডাকছেন, চলো—

সরি সন্দীপ, হর্ষবর্দ্ধন চেয়ারে একপাক ঘুরলেন। বললেন, শয়তান মেয়ে তিনটের ছবিগুলো তোমায় দিতে ভুলে গেছি। এগুলো ছাড়া ওদের আইডেনটিফাই করবে কি করে?

থ্যাংকু স্যার, টেবিলের ওপর থেকে খামখানা তুলে নিয়ে ভেতরের ছবিগুলো দু আঙুলে তুলে আনলো সন্দীপ। প্রথম ছবি খানাই আন্নুর। হর্ষবর্দ্ধন চেয়ারে ঝুঁকে বসলেন, হাসছো কেন হে, চেনো নাকি?

না, না, কি করে চিনবো, স্যার।

হর্ষবর্দ্ধন পেছনে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে নিয়ে বিড় বিড় করলেন, চেনা অচেনা ব্যাপারটাই বড় অদ্ভুত হে। এ ব্যাপারে তুমি একটি একনম্বরের অপদার্থ তা আমি জানি। যাও। গেট আউট—বাইরের করিডোরে কংসাবতী তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

দ্রুতপায়ে সন্দীপ কাছে এসে বলল, সরি ম্যাডাম, হঠাৎ একটা জরুরি কাজ এসে পড়েছে। এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে Please come tomorrow....please.

কথা শেষ করেই হনহনিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল সে। যেতে যেতে স্পষ্ট শুনতে পেল বুকের মধ্যে এক সঙ্গে একশোটা সেতার বাজছে।

আহ্হ্—লিফটের দেখা নেই। এগুলো এখান থেকে উপড়ে তুলে ফেলে না কেন?

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ঝড়ের মতন নিচে নেমে এসে নিজের জিপে পাদানিতে পা রেখে রুদ্ধশ্বাসে ড্রাইভারকে বললো, জলদি, সল্টলেক—। কুইক। একশো মাইল স্পিড দাও—, হ্যাঁ একশো মাইল। স্পিড নিরানব্বই হলে রিভলবারের ছটা গুলিই তোমার মাথায় পুরে দেব।

সন্দীপের ড্রাইভারের নাম সুবোধ। সে অনেকদিন ধরে তার জিপ চালাচ্ছে। সাহেবের মনমেজাজ ভালো করে জানা আছে তার।

পেছনে তাকিয়ে সুবোধ বলল, চল্লিশের বেশি স্পিড তুললে আপনাকে আমাকে দুজনকেই ধরবে, স্যার।

কে ধরবে?

স্টিয়ারিং এ চোখ রেখে সুবোধ বলল, পুলিশ।

(২৪)

ঘরে পা দিয়েই বীরু বলল, যা একটা খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।

কি—

তেলটাই আনা হয়নি। কি দিয়ে মাংসা রান্না হবে—গায়ত্রী রান্নাঘরে জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রাখছিল। বলল, এ বেলা তাহলে বাড়িতে রান্নার পাটের দরকার নেই। বড় রাস্তায় একটা ধাবা আছে, সেইখানে খেয়ে নেব।

সে তো অনেক দূর! বাসে যেতে হবে।

বাসেই যাবো।

আচ্ছা। বীরু ঘরে গিয়ে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে খুচরো টাকা পয়সা বার করে টেবিলে রাখলো। একপাশে নীল খামগুলো সাজানো। ওগুলোর প্রতিটি বীরুর চেনা। ওর মধ্যের চিঠিগুলোও তার বারবার পড়া। প্রায় মুখস্তই বলা যায়।

কিন্তু এগুলো এখানে রাখলো কে?

গায়ত্রী ছাড়া আর কে রাখবে।

মোট একশো একুশ খানা আছে, গায়ত্রী এর মধ্যে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, for your information ভেতরের একখানা চিঠিও পড়িনি আমি।

চিঠির বান্ডিলটা হাত দিয়ে ছুঁলো না বীরু। বলল, দুটো এ্যালবামভর্তি ফটো আছে সেগুলো দেখেননি।

না।

ওগুলোও তো আলমারিতেই ছিল। একটু পরে বীরু নিজেই আলমারি থেকে দুখানা বড় সাইজের এ্যালবাম বার করলো, এই তো, ভেতরেই ছিল এগুলো।

গায়ত্রী প্রশ্ন করলো, এগুলো নিয়ে এখন কি করবেন?

পুড়িয়ে ফেলবো।

গায়ত্রী বলল, আপনার মা এসব জানেন?

জানেন। মা দেখেছেন একদিন। আমার ট্যাক্সি করে সিনেমা দেখে ফিরছিলাম। পরে মা বলেছিলেন। ওকে ভালোই লেগেছিল মার। গায়ত্রী চুপ করে বীরুর কথা শুনছিল।

প্রেমে পড়া ব্যাপারটাই গায়ত্রীর ধাতে নেই। কেমন যেন ন্যাকামী মনে হয় তার কাছে। তাছাড়া তার মনে হয় যে সব ছেলেদের পার্সোন্যালিটি বলে কিছু নেই তারাই কেবল প্রেমে পড়ে। ননসেন্স—

এখন এসব কথা কিছুই বলল না সে। বলল, আমরা তিনবন্ধু একসঙ্গে যুক্তি করে হোস্টেল থেকে পালিয়েছি। সাতদিন পর আবার ফিরে যাবো। আপনার মুখে আপনার মার কথা শুনে দেখতে ইচ্ছে করছে। নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে।

আজ যাবেন?

না না, অন্যদিন। এখন চলুন আগে ধাবা থেকে খেয়ে আসি, খুব খিদে পেয়েছে। তারা যখন দরজায় তালা দিচ্ছে ঠিক তখনি পাশের ফ্ল্যাটের একটি বৌ দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, বীরু ভাইয়া, কোথায় যাচ্ছেন?

খেতে।

কোথায় খেতে যাচ্ছেন, আমি তো আপনি আর আপনার সিস্টার দুজনার জন্যেই খানা বানিয়েছি। আপকো বাহার যানেকা কোই জরুরত নেহি। মাড়োয়ারি বৌটির বয়স ত্রিশের বেশি নয়। মুখখানা খুব মিষ্টি এবং সরল। কিন্তু গড়নটা মোটার দিকে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই বিশাল বপু মহিলায় পরিণত হবার সব লক্ষণ এখনই তার শরীরে ফুটে উঠেছে।

এবার বৌটি গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলো, আমার ছোট বহিনকে ঠিক আপনার মত দেখতে। আমার মতন মোটা হয়ে যাবে বলে রাতকো কুছ খাতা নেহি খাতা হায়।

গায়ত্রী বলল, আসুন না আমাদের ফ্ল্যাটে।

আপনি যান, আমি আপনাদের খানা নিয়ে আসছি।

তালা না লাগিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা দুজন। গায়ত্রী বলল, thank God.

বাইরের ঘরে একপাশে একখানা নেয়ারের খাট। তার ওপরেই সটান শুয়ে পড়লো গায়ত্রী। ও ভগবান তোমার তো অসীম করুণা, kindly গায়ত্রীর জন্যে

এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও না। দুদিন কি ভাবে কাটলো ভাবা যায় না। ইস্, এ রকম একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে সে পড়ে যাবে হোস্টেল ছাড়ার আগে তা কল্পনাই করেনি।

কি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে, কতো চড়াই উৎরাই পেরিয়ে জীবন এগিয়ে চলে। তার চেয়েও আশ্চর্য, তার ধারাবাহিকতা কখনো থেমে থাকে না।

হোস্টেলে ফেরার পর গায়ত্রী যখন তার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলবে, তার কথা গল্প মনে করে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এই গল্পময় জীবনকে কাছ থেকে দেখবে বলেই তো তারা হোস্টেল ছেড়ে এসেছিল।

কাজল আর আন্নু এখন কি করছে কে জানে। কাল একবার সেই পার্কটার কাছে অবশ্যই যেতে হবে—।

নানা রকম ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এসেছিল তার। ঘুমের মধ্যেই তার কানে গেল বীরুর কণ্ঠস্বর, ম্যাডাম—ম্যাডাম, হ্যালো গায়ত্রী।

গায়ত্রী চোখ খুলে উঠে বসলো—।

আপনার চা,—

আপনি তৈরি করলেন?

Yes, আমি ছাড়া আর কে করবে। আমার এসব করার অভ্যেস আছে, নিন, ধরুন জুড়িয়ে যাবে।

আজ সকাল থেকেই তার সব ইচ্ছাপূরণ হয়ে যাচ্ছে। কে করাচ্ছে এসব? কে করায়? ধ্যাৎ, ভগবান টগবান মানতে ইচ্ছে করে না। কাজল ভগবান মানে না। সবকিছুতেই কাজলের কেমন বিদ্রোহ বিদ্রোহ ভাব।

ওই জন্যেই মেয়েটাকে তার এতো ভালো লাগে।

আমি একটু বেশি চা খাই, বীরু বলল। তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে চায়ের কাপ হাতে। এখন তার পরনে একটা ডোরাকাটা গেঞ্জি আর জিন্স। বেশ কার্ত্তিক কার্ত্তিক দেখাচ্ছে।

চায়ের কাপ শেষ করার পর গায়ত্রী বলল, থ্যাংস।

নিন, আপনি রেস্ট নিন, পাশের ফ্ল্যাটের সীতা ভাবী খাবার নিয়ে এলে আমি আপনাকে ডাকবো। যেতে গিয়েও গেল না বীরু। বলল, একটা কথা বলুন তো, আমার কেসে পুলিশ টুলিশ এলো না কেন এখনো।

জানি না, গায়ত্রী ওপরে দুহাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলল, বোধহয় ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছু করেছেন।

নিচের ফ্ল্যাটের দোয়ারকা আংকেলের কথা বলছেন?

ওনার নাম জানি না আমি।

He likes me a lot...নিন শুয়ে পড়ুন।

এবার সত্যিই চলে গেল বীরু।

আবার হাত পা মেলে সেখানেই শুয়ে পড়লো গায়ত্রী। কিন্তু ঘুম এলো না তার চোখে। একদম নতুন একটা চিন্তা তাকে জাগিয়ে রাখলো—এইভাবে একটি সদ্য পরিচিত মানুষের সঙ্গে একা একবাড়িতে রাত কাটাতে হবে তাকে—।

না ভয় করছে না তার কিন্তু প্রশ্নটা বুকের মধ্যে এখনো তীক্ষ্ণ নখ বিঁধিয়ে রেখেছে। বাইশ বছরের একটা যুবতী শরীরকে অনেক সাহস আর অনেক কৌশল দিয়ে চারপাশের সহস্র লোভের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে হয়। তাছাড়া এখান থেকে ফিরে যাবার পর হোস্টেলের রীতিনীতির মধ্যেই থাকতে হবে তাকে। সেখানে বন্ধুরা আছে, কংসাবতী ম্যাম আছেন।

খাটিয়া ছেড়ে উঠে এলো সে—একটা ফোন করবো?

করুন না, একটা দুটো যটা ইচ্ছে—

বুকের মধ্যে সামান্য ঢেউ ওঠার মতো হলো, তাও ঠিক ঠিক নম্বরটা ঘুরোলো গায়ত্রী।

এক সেকেণ্ড, দু' সেকেণ্ড...কোনো সাড়া নেই। এক একটা সেকেণ্ড যেন এক একটা ঘণ্টা। বুকের মধ্যে ঢেউটা সমানে আছড়ে পড়েছে—

হ্যালো— হ্যালো— কংসাবতী ম্যামের গলা।

হ্যালো—

খুব আস্তে করে প্রায় নিঃশ্বাস নেবার নিশ্চিন্ততায় গায়ত্রী উত্তর দিল, ম্যাম—

কে—কে—কে বলছো...? গায়ত্রী...হ্যালো গায়ত্রী...কোথায় আছ তোমরা...? Please কোথায় আছ বলো—

কংসাবতী ফোঁপাচ্ছেন please গায়ত্রী... আরও কয়েক সেকেণ্ড রিসিভারটা নিজের কানের পাশে ধরে রাখার পর নিঃশব্দে নামিয়ে রাখলো গায়ত্রী।

ফোনটা করার পর এখন মনে হচ্ছে না করলেই হতো।

আপনার এখানে কাগজ দেয় কখন?

ভোরবেলা।

তিন চারদিন হয়ে গেল আমরা তিনজন পালিয়েছি কই খবরটা কাগজে ছাপা হলো নাতো?

বীরু বলল, ছাপা না হওয়াই ভালো। আপনি মানে আপনারা তাহলে বিপদ পড়ে যাবেন।

ওরে বাবা, গায়ত্রী ভয় পাবার মতো করে বলল, তাহলে না ছাপাই ভালো।

কাচের আলমারি ভর্তি বাসন। গ্লাস, বাটি, থালা ডিস, টি-সেট।

খেতে বসার সময় আলমারির চাবিটা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

গায়ত্রী বলল, চলে আসুন, এতেই ম্যানেজ হয়ে যাবে। কাল সকালে চাবি খুঁজবেন।

টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিতে করে খাওয়া। একটুও খারাপ লাগছিল না গায়ত্রীর। বরং মজা লাগছিল তার। সামনে খাবার দেখার পর বীরুর মনে হলো অনেকক্ষণ আগে থেকেই তার খুব খিদে পেয়েছিল শুধু বুঝতে পারেনি এতক্ষণ।

গায়ত্রীর খুব ঝাল লেগে গেল। হুসহাস করতে করতে উঠে দাঁড়াল, ইস্, বোধহয় লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি। প্লাসটিকের জগ মুখের ওপর উপুড় করে ধরে অনেকটা জল খেল। জামা গা জলে ভিজে গেছে তাও হাসছিল সে।

সবটাই তার কাছে পিকনিকে আসার মতো মনে হচ্ছিল। এ ফ্ল্যাটের কোথায় কি আছে এ বাড়ির ভূগোলটাও কেমন, এখনো জানা হয়নি তার।

পিকনিকে গিয়ে কে আর সেখানকার ইতিহাস ভূগোল নিয়ে মাথা ঘামায়। গায়ত্রী নিজেই এখনো জানে না কতক্ষণ সে থাকবে এখানে।

বীরু হাত ধুতে ধুতে জিজ্ঞেস করলো, আপনার খুব সকালে চা খাওয়ার অভ্যেস নেই তো?

না। হোস্টেলে অতো সকালে চা কোথায় পাবো?

আমি ঘুম থেকে উঠে চা খাই—নিন শুয়ে পড়ুন এবার।

কথাটা বলার পরে একমুহূর্ত থম্‌কে থাকলো বীরু। গায়ত্রীর মনে হলো তার একটু আগের ভাবনাটাই এখন বীরুকে ভাবাচ্ছে।

কয়েকটা মুহূর্ত দুজনা মুখোমুখি।

ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে হাসলো বীরু, একটা কথা বলছিলাম, একটু চুপ করলো সে। তারপর আবার বলল, আমাকে আপনার ভয় লাগছে নাতো—?

ভয়, হঠাৎ ভয়ের কথা বলছেন কেন? ধ্যাৎ, যান শুয়ে পড়ুন গে।

সত্যিই ভয় লাগছিল না তার।

মেয়ে-পুরুষের সম্পর্কটা সব সময়েই খাদ্য খাদকের হতে হবে কেন? তার বাইরেও তো একটা বিশাল পৃথিবী আছে, যেখানে মাংস নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ির খেলাটাই বাঁচার একমাত্র শর্ত নয়।

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো গায়ত্রী। চোখ বোজার আগে তার শুধু মনে হলো আন্নুর গালের টোল পড়াটা কতোদিন দেখা হয়নি।

মা— মা—

সিঁড়িতে সন্দীপের গলা। প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে সে। ওপরে এসে ঝড়ের মতো ঘরে পা রেখেই প্রশ্ন করলো, সে কই, সে?

কার কথা বলছিস?

হেমলতা এগিয়ে এলেন।

সন্দীপ বলল, তোমার নতুন কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে, অনুরাধা দেবী।

হেমলতা আহত গলায় বললেন, এরকম করে কথা বলছিস কেন!

আহ, বলো না সে কোথায়?

তোর বাবার সঙ্গে আইসক্রিম খেতে গেছে। একটু দাঁড়া, এক্ষুনি ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে, এক্ষুনি আসবে—ছটফট করতে করতে সন্দীপ বারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

নাহ, নিজের নামটা ঠিকই বলেছে কিন্তু, ভাইকে খুঁজতে আসা, কৃষ্ণনগরে বাড়ি সব সব মিথ্যে। আশ্চর্য, মেয়েটাকে দেখলে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না এতো চালাক! বাবার মার কাছে আর কি কি গল্প করেছে সে সব জানতে হবে।

কিরে, তুই এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি, কোনো গন্ডগোল হয়নি তো?

হেমলতা তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, নাকি তোর শরীর খারাপ?

না কিছু হয়নি আমার, আর শুধু শুধু গন্ডগোল হতে যাবে কেন? সন্দীপের কণ্ঠস্বরে অস্থিরতা, কই তোমাদের আন্নুতো এখনো ফিরছে না।

ওর সঙ্গে তোর কিসের দরকার?

ওর সঙ্গে...বারে ওর সঙ্গে আবার আমার কি দরকার থাকবে? সন্দীপ বলল, আমি ভাবছি বাবা কিন্তু আমাকে কোনোদিন আইক্রিম খাওয়াতে নিয়ে যাননি।

তার কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন হেমলতা, ওমা, তুই তো কখনো এতো হিংসুটি ছিলিনা।

সত্যি কথা বলেছি বলে আমনি হিংসুটে হয়ে গেলাম আমি। অভ্যাসবশতঃ কথা বলতে বলতে সন্দীপ পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল রিভলবারটা যথাস্থানে আছে কিনা। ওটা অবশ্য এখানে লাগবে না। দু একটা ধমকেই সবকথা গলগল করে পেট থেকে বেরিয়ে আসবে।

ঘরে এসে বোস্, চা করে দিচ্ছি—

চা লাগবে না আমার—, তুমি যাও।

হেমলতা চলে গেলেন। দূরের রাস্তায় দুটি মানুষকে দেখা গেল। এদিকেই আসছে তারা। কাছে আসার পর বোঝা গেল অন্য মানুষ, যাদের জন্যে সন্দীপ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে তারা নয়।

বারান্দা থেকে ঘরে এলো সন্দীপ। টি.ভি. খুললো। তক্ষুনি আবার বন্ধ করে দিল। চেঁচিয়ে বলল, ওমা ঠিক আছে, চা দাও তাহলে।

মেয়েটা যতক্ষণ সে বাইরে ছিল ততক্ষণ তার ঘরটাতেই শুয়েছে বসেছে। মেয়েরা কোথাও একঘণ্টা থাকলেই ঘরটা তাদের গন্ধে ভরে থাকে। সন্দীপ বুঝতে পারে সে গন্ধ। এইতো তার বালিসে বিছানায় অন্য রকম একটা গন্ধ। আন্নু আন্নু গন্ধ।

কথাটা মনে মনে বলেই হেসে ফেলল সন্দীপ, কে জানে আন্নু নামের কোনো সেন্ট বাজারে পাওয়া যায় কিনা।

ইস্, কি বিচ্ছু মেয়েরে বাবা—আবার কায়দা করে মার শাড়ি চেয়ে পরা হয়েছে।

যাই দোষ থাকুক মেয়েটার, হাসির সঙ্গে গালের টোলটা কিন্তু দারুণ ম্যাচিং। ভগবান ওই ম্যাচটা ঘটিয়েছেন বলেই অতো সুন্দর। আন্নু জানে কি, হাসলে তাকে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। নির্ঘাত জানে না।

স্বরাজ একা ফিরে এলেন, একি তুমি কখন এলে?

একটু আগে। সন্দীপ প্রশ্ন করলো, আন্নু কই? শিগগির বলো—

তার ব্যস্ততায় সামান্য অবাক হলেন স্বরাজ। বললেন, পার্কের দিকে গেল। এখানে ওর সঙ্গে একটি মেয়ের আলাপ হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবে।

ও আর ফিরবে না। সন্দীপের কথা ঠিক ঠিক না শুনেই স্বরাজ বলে উঠলেন, কি বললে? কি বললে তুমি?

না, বলছিলাম, তোমার ঘাড় ভেঙে আইসক্রিম খাবার পর বন্ধুর ঘাড় ভেঙে নিশ্চয়ই রাতের খাবারটা খেয়েই তবে আসবে।

স্বরাজ তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, এইজন্যেই বলেছিলাম পুলিশের চাকরিতে তোমার ঢোকার দরকার নেই। সভ্যভাবে কথা বলতেও ভুলে যাচ্ছো।

সরি—

স্বরাজ হাতের ছড়িটা ঘরের কোনায় রেখে আবার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—এ বাড়িটা একটা কয়েদখানা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। একটা মানুষ নেই দুটো কথা বলি, ওই মেয়েটা এসেছিল বলে আমি আর তোমার মা দুজনাই—

সন্দীপ মুখোমুখি সরে এসে বলল, বললাম তো সরি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেও জানলা দিয়ে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। সেদিকে মুখ ফিরিয়েই আন্নুকে আসতে দেখলেন স্বরাজ।

বললেন, ওই তো আন্নু আসছে।

ততক্ষণে সন্দীপও দেখেছে তাকে। তার চোয়াল দুটো এখন শক্ত। চোখের দৃষ্টিতে উত্তেজনা কিন্তু তার এই হঠাৎ পরিবর্তনটা স্বরাজ ধরতে পারলেন না।

ঘরের ভেতরে এসে আন্নু মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়াল — বন্ধুটার সঙ্গে দেখা হলো না।

কেন রে—

হেমলতার প্রশ্নের জবাবে আন্নু হাত তুলে বাতাসে ভাসালো, কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছে।

কোথায় গিয়েছে?

সন্দীপ এগিয়ে এলো, জিজ্ঞেস করেছিলেন কোথায় গিয়েছে?

হ্যাঁ, কিন্তু লোকটা কিছু বলল না।

বলল না, না আপনি জিজ্ঞেসই করেননি।

হঠাৎ সন্দীপের এই ধরনের জেরায় কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল আন্নু।

ঢোক গিলে বলল, কি করে বলবে, লোকটা তো কথাই বলতে পারে না!

সন্দীপ বলল, ওই বাড়িতে আপনার বন্ধু থাকে বুঝি? ওরা সাংঘাতিক বড়লোক। ভীষণ নাক উঁচু। পাড়ার কারুর সঙ্গে মেশে না।

আপনি বুঝি চেনেন ওদের?

বারে, না চেনার কি আছে? এই তো কাছেই থাকে। ভদ্রমহিলা রোজ সকালে উঠে কুকুর নিয়ে রাস্তায় বেড়াতেন। কিছুদিন থেকে দেখছি না। আপনার বন্ধুর সঙ্গে এবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করবেন তো কুকুরটা বেঁচে আছে কিনা।

হেমলতা দুজনার মাঝে এসে দাঁড়ালেন, না খবরদার তুই কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবি না আন্নু। যার দরকার সে নিজেই জিজ্ঞেস করে নিক্।

সন্দীপ হেমলতার রাগ দেখে হাসছিল। বলল, অনুরাধা দেবী, হয়ে গেল আপনার। আর সাতদিন এ বাড়িতে থাকুন তারপর দেখবেন, এই দুই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আদর দিয়ে আপনার ইহকাল পরকাল দুই ঝরঝরে করে দিয়েছেন।

তার কথার ভঙ্গিতে আন্নু হেসে ফেলল।

স্বরাজ এবং হেমলতা এখন দুজনাই ধারে কাছে নেই। এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে সন্দীপ বলল, বোধহয় আপনার বন্ধুকে আমি চিনি—।

আন্নু তাকিয়ে আবার চোখ নামাল—চেনেন?

হ্যাঁ, বোধহয় ওর নাম কাজল কিংবা গায়ত্রী।

এক নিমেষে আন্নুর মুখের সমস্ত রক্ত উধাও। কোনো রকমে কাঁপা গলায় সে বলতে পারলো—মোটেই না, ওর নাম দীপিকা।

দীপিকা—কথাটা নিজের জিভে তুলে নিয়ে একপাক ঘুরলো সন্দীপ—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে, আমারই ভুল হয়েছিল। সরি অনুরাধা দেবী।

কিছুক্ষণ পর খাবার টেবিলে বসে স্বরাজ রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, তাহলে তুমি পারলে না?

কোন কথা বলছেন? সন্দীপ পাল্টা প্রশ্ন করলো।

আন্নুর ভাইকে খোঁজার কথা বলছি।

পেয়ে যাবো, আর দু একদিন সময় লাগবে। এ পর্যন্ত এগারোজন কৌশিকের খবর পাওয়া গিয়েছে। তারমধ্যে তিনজন ফুটবল খেলে। কিন্তু তাদের কারুর বাড়িই কৃষ্ণনগরে নয়।

আমি জানতাম তুমি পারবে না, স্বরাজ তার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। ঠিক আছে, দেখি আমিই কৌশিককে খুঁজে বার করবো।

আন্নু খেতে খেতে ভাবলো, সারা পৃথিবী খুঁজেও কৌশিককে কোথাও পাওয়া যাবে না। আর পাওয়া গেলেও আন্নু বলে দেবে সে তার ভাই নয়।

কিন্তু তখন সন্দীপ কাজল আর গায়ত্রীর নাম করেছিল। ও কি চিনে ফেলেছে তাকে? না কি আন্দাজে বলেছে?

নাহ আন্দাজে বললে নাম দুটো ঠিক বললো কি করে?

বুকের মধ্যে একটা ভয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে তার। কিছুই খেতে ভালো লাগছে না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে উঠে দাঁড়াল আন্নু। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সন্দীপ, ও কি, এরই মধ্যে উঠে পড়লেন যে?

খাওয়া হয়ে গিয়েছে—?

বারে, এখনো তো মাংসই দেয়নি মা!

মাংস খেতে আমার ভালো লাগে না।

স্বরাজ নিজেও খাওয়া থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

না না— এই মানুষটার জন্যেই খারাপ লাগছিল আন্নুর। তার না খেয়ে উঠে পড়ার পর সবকিছুরই যেম তাল কেটে গেল। হেমলতা কিছু বলছেন না। কিন্তু

বুঝতে পারছেন এই সব কিছুর জন্যে সন্দীপই দায়ী।

রাতে বিছানায় শোবার পরে সেই আন্নু গন্ধটা সন্দীপকে রাত-ভোর তাড়া করে ফিরলো। যা কখনো হয় না, মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হলো খুব জলতেষ্টা পেয়েছে।

তেষ্টাটা বুকে নিয়ে সে এপাশ ওপাশ করতে করতে এক সময় উঠে পড়ে বুঝতে পারলো—আরও দুজন মানুষ এর মধ্যেই উঠে পড়েছে। ভালো করে আকাশ ফর্সা না হতেই দুজন মানুষের পায়ের শব্দ প্রায় নিঃশব্দে এবং সন্তর্পণে অন্যের কান বাঁছিয়ে নিচে নেমে গেল।

স্বরাজ মর্নিংওয়ার্কে গেলেন। সঙ্গে আন্নু।

পাশ ফিরে শুয়ে তেষ্টার কথাটা ভাবতে ভাবতেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো সন্দীপ। তার সকাল শুরু সকাল আটটায়।

(২৬)

সার্টের বোতাম লাগানো শেষ করে বীরু জিজ্ঞেস করলো—কাকে ফোন করছিলেন, আপনাদের হেমামালিনীকে?

না—

তাহলে?

আপনার মাকে।

মাকে মানে—?

আপনার মাকে মশাই, গায়ত্রীর দুচোখ হাসছিল, এবার জিজ্ঞেস করুন ঠিকানা কোথায় পেলাম, ভয় করেছে কিনা।

বীরুর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে গায়ত্রীর কথা বিশ্বাস করেনি।

গায়ত্রী বলল, কি বিশ্বাস হচ্ছে না? ফোনের পাশে একখানা খাতা পড়ে আছে। প্রথম পাতাতে প্রথম নম্বরটার পাশেই লেখা আছে মাদার। মা কি বললেন জানেন?

বীরু মাথা নাড়লো।

মা বললেন, কে কথা বলছো, জয়তি?

আমি বললাম না, আমি গায়ত্রী।

কে গায়ত্রী?

আমি বললাম, আমি বীরুর সিস্টার গায়ত্রী।

মা বললেন, বীরুর তো কোনো সিস্টার নেই।

তার উত্তরে আমি বললাম—সে কি মা, নিজের মেয়েকে চিনতে পারছেন না!

তারপর?

গায়ত্রী অদ্ভুতভাবে হাসলো, তারপর হেমন্তকুমারের গানের সেই লাইনটা—তার আর পর নেই—।

কথার পর গায়ত্রী একটু চুপ করে বীরুকে দেখে নিয়ে বলল, আজ আপনার অফিস যাওয়া হবে না। মা আসছেন।

একটানে গলার টাইটা খুলে ফেলল বীরু। বলল, মা আর কি বললেন?

আর কিচ্ছু বলেননি। বোধহয় কান্না চাপার চেষ্টা করছিলেন।

আপনি না অদ্ভুত! বীরু তার টাইটা বিছানায় ছুঁড়ে দিল, চেনেন না জানেন না তাও মাকে ফট্ করে ফোন করে দিলেন!

কি বললেন আপনি, গায়ত্রী টাইটা তুলে নিয়ে ওয়াড্রবের পাল্লা খুলল, মাকে বুঝি আলাদা করে চিনতে হয়? সব মাই এক রকম—। কাছাকাছি মিষ্টির দোকান আছে নাকি?

আছে একটু দূরে—

গায়ত্রী হাত পাতলো, চট্ করে টাকা দিন, মার জন্যে মিষ্টি এনে রাখি।

আপনি যাবেন কেন?

কেন? আমি গেলে আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে নাকি? কাগজে একবার বেরিয়েছিল আপনাদের সল্টলেকে শেয়াল আছে। বাঘও আছে তাহলে?

বাইরে যাবার জন্যে যেটুকু নিজেকে গুছিয়ে নিতে হয় চটপট করে তা সেরে নিল গায়ত্রী। মুখ মুছলো, চুলে চিরুনি চালালো হাল্কা হাতে। তারপর বুকের ওপর দিয়ে ওড়নাটা দিতে দিতে বলল, কই টাকা দিন—।

বীরু পকেটে হাত পুরে পার্স বার করলো—মাতো মাঝে মাঝেই আসেন। আমি কখনো মিষ্টি আনিনি।

অন্যায় করেছেন—গায়ত্রী ঘাড় তুলে বলল, নির্ঘাত মার আনা মিষ্টি খেয়েছেন নির্লজ্জের মতো।

আচ্ছা, আমার মাকে তো আপনি দেখেননি, তাও আপনি এমন করে—

আপনাকেও তো আমি কোনদিন দেখিনি, তাও আপনার সঙ্গে থাকতে চলে এলাম। আপনার ওপর বিশ্বাস না থাকলে আসতে পারতাম, বলুন?

পঞ্চাশ টাকার নোটখানা বীরুর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে গায়ত্রী তার গলা শুনতে পেল—আমার মা কিন্তু মিষ্টি খান্না—

পেছন থেকে অতর্কিতে একটা হাতের ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে যেতে মুখ তুলে কিছু দেখার আগেই কাজল হেসে ফেলল, ওমা তুই—

পরক্ষণে রাস্তার মানুষ ও গাড়ি চলাচলের ভ্রুক্ষেপ না করে তিনটে মেয়ে হাত দিয়ে বেঁধে রাখা একটা শরীর হয়ে গেল। এবং সেই লতানো বৃক্ষের মতো শরীর থেকে অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়তে থাকলো হাসির স্রোত।

আন্নু বলল, ছাড়, ছাড় শিগগির, আমার দম আটকে যাচ্ছে—। ইস্, কি অসভ্যরে তুই। পাত্তাই নেই তোর। এই তিনদিন কোথায় ছিলি?

গায়ত্রী বলল, অনেক কথা, শুনলে তোদের গল্প বলে মনে হবে। চল্, ওই পার্কের মধ্যে বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসি।

কাজল বলল, না চল্ ফুচকা খেতে খেতে তোর কথা শুনবো।

ফুচকা পাওয়া যায় নাকি সল্টলেকে—

গায়ত্রীর অবাক হওয়া দেখে আন্নু বলল, কেন, সল্টলেক কি পৃথিবীর বাইরে নাকি, সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে। কাজল তো একসঙ্গে একটা ছেলেশুদ্ধ বর জোগাড় করে নিয়েছে।

কথাটা আন্নু শেষ করার আগেই পেছন থেকে দুম্ করে একটা কিল এসে পড়লো তার পিঠে।

কাজল বলল, এই মিথ্যুক, তোর সন্দীপের কথা বল্ গায়ত্রীকে। সে তো তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ফুচকাওলা এই দুদিনের মধ্যেই আন্নু আর কাজলকে চিনে গেছে। আজ তাদের সঙ্গে গায়ত্রীকে দেখে বলল, এই দিদিও আপনাদের বন্ধু আছেন?

হ্যাঁ, কাজল বলল, ওরটাতে বেশি ঝাল দিয়ো না।

ঠিক আছে, দিব না—

এই, এবার তোর কথা বল্ গায়ত্রী। কোথায় আছিস, ফোন নম্বরটা বল, লিখে রাখি।

ফোনের কথা উঠতেই গায়ত্রীর মনে পড়ে গেল সে কংসাবতীকে ফোন করেছিল।

বলল, জানিস কাল আমি হেমামালিনীকে ফোন করেছিলাম। আমার গলা শুনেই হেমামালিনী কেঁদে ফেলল।

ও বোধহয় ভেবেছিল আমরা বেঁচে নেই—

এই আন্নু, খবরদার এইসব অলক্ষুণে কথা বলবি না। ঘরে আমার ছেলে আকাশ আছে না, আমি মরে গেলে তার কি হবে বলতো?

হা হা হা — হি হি হি—

হাসি এমন উদ্দাম যে হঠাৎ গায়ত্রীর গলায় বিষম লেগে গেল। কাশতে কাশতে তার দম বন্ধ হবার জোগাড়। ওড়নাটা গা থেকে খুলে রাস্তার ওপর। বাইশ বছরের একটা যুবতীর সর্বনাশা যৌবনের প্রতিটি ঢেউ-এ এই মুহূর্তে তাকে বাঁধ ভাঙা দুকুল ভাসানো একটা নদীর মতো একই সঙ্গে ভয়ংকর এবং অপরূপ করে তুলেছে। এই মুহূর্তে সে যেন ইচ্ছে করলেই নিজের অহংকারকে বাজি রেখে অক্লেশে গোটা পৃথিবীটার অধিশ্বরী হতে পারে।

মুগ্ধ চোখে তাকে দেখতে দেখতে কাজল রাস্তা থেকে ওড়নাটা তুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, চল, এখান থেকে চলে যাই আমরা।

কেন আর ফুচকা খাবি না?

না—। চল্ বলছি এখান থেকে।

আন্নু বলল, ফুচকাওয়ালা ভাই আজ আর ফুচকা খাবো না আমরা। কাল এই সময় আসবো।

পার্কের গেটে পৌঁছনোর আগেই হাওয়ার মতো নিঃশব্দে একটা বিশাল গাড়ি তারা কিছু বোঝার আগেই কাজলের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়লো। ড্রাইভারের সিট থেকে মুখ বার করে অর্জুন বলল, এখানে কি করছেন?

কাজল একটু থতমত খেয়ে বলল, না এই এমনি—

এঁরা বন্ধু আপনার—

গায়ত্রী বলল, আমরা কাজলের বন্ধু।

কাজল, কাজল কে? ওনার নাম তো অনুরাধা—

কাজল বলে উঠলো, আমার ডাক নাম কাজল।

অর্জুন হাসলো, আপনার এই নামটাই বেশি সুইট। হ্যাঁ অনুরাধা, যার জন্যে এখানে দাঁড়ালাম। আমি আজ রাতে সিঙ্গাপুর যাচ্ছি। দুদিন পরে ফিরবো। আপনার যা দরকার সনৎকে বলবেন please.

কাজল বলল, আচ্ছা—

আকাশ তো আজ স্কুলে গিয়েছিল।

আমি সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়েছি স্কুলে।

অর্জুন বলল, শুনলাম বাসে করে গিয়েছিলেন, আর একটা গাড়ি তো বাড়িতেই ছিল। ভীমকে বলেননি কেন, ও ভালো গাড়ি চালাতে পারে।

কাজল বলল, না, আমি চাই গাড়ি নয়, আকাশ এখন থেকে বাসে করেই স্কুলে যাবে আসবে।

Good, অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, I appreciate your idea. চলি, গুড নাইট।

ইস্, গাড়িটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুকে হাত দিয়ে রাস্তার ওপর বসে পড়লো গায়ত্রী, তোর ওপর হিংসে হচ্ছে রে কাজল...।

এই ওঠ, সবাই দেখছে তোকে—

দেখুক গে, গায়ত্রী উঠে দাঁড়াল, হ্যাঁরে কাজল, তোর অর্জুন সিনেমায় নামে না কেন রে?

কখন নামবে, ওই তো শুনলি, সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। আবার ফিরে এসেই হয়তো পরদিন কানেকটিকাট দৌড়বে।

আন্নু বলল, কি করে রে অর্জুনদা?

তার মুখে দাদা ডাক শুনে কাজল অবাক হবার বদলে তাকে চোখ দিয়ে নিজের ভালোলাগাটা জানিয়ে দিল। গায়ত্রী বলল, কিরে কাজল, বললি না কি করে?

কি সব তৈরি করে যেন বিদেশে পাঠায়।

lucky—

গায়ত্রীর মুখের লাকি শব্দটা কাজলকে হঠাৎ বিষণ্ণ করে দিল। লাকি কিনা জানি না, বৌটা পালিয়ে গিয়ে ডিভোর্সের মামলা করেছে—। ছেলেটা একদম একা একা সারাদিন বাগানে ঘুরে বেড়ায়।

আচ্ছা, এরকম কেন হয় বলতো?

জানতে চাইল, কি রকম হয়?

গায়ত্রী বলল, মেয়েরা আসলে সুখ সহ্য করতে পারে না। সব সময় দুঃখ খুঁজে বেড়ায়।

গায়ত্রীর কথাটাতে এমন কিছু ছিল যাতে সমস্ত আবহাওয়াটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সেটা কাটাতে পুরো এক মিনিট সময় নিল আন্নু। তারপর বলল, ভাগ, তুই দুঃখ খুঁজে বেড়াস বলে সবাই তোর মতো নয়। আমার বাবা সুখ চাই। সব সময় সুখ চাই—

কাজল বলল, এই সুখ মানে কিরে?

জানি না— জানি না— চোখ বুজে ওড়নাটা দুহাতে বাতাসে মেলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো আন্নু। তাকে একটা সাদা ডানাওয়ালা উড়ন্ত পাখির মতন দেখাচ্ছিল এখন।

কাজল বলল, আমি জানি,আমি জানি। তোর সুখের নাম সন্দীপ—।

পার্কের সবুজ ঘাস, ছাড়া ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে ইউক্যালিপ্টাসের মেঘ ছোঁয়ার চেষ্টা, চড়া গলায় দুটো শালিকের ঝগড়া এবং সামনের রাস্তা দিয়ে একটা লাল প্যারামে শুয়ে একটা শিশুর নিঃশব্দে চলে যাওয়া— এই সব ছবির নেশা কাটিয়ে তীব্র গলায় আন্নু বলে উঠলো—না— না— না।

সবাই অনেকক্ষণ চুপ।

তারপর মাথা নিচু করে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াল গায়ত্রী। একসময় মনের বোঝা ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক গলায় কাজল বলে উঠলো—

এই তোরা আমার ওখানে চল্। চা খাবো একসঙ্গে।

চল্—গায়ত্রী নিঃশ্বাস ফেলল, আমরা গেলে তোর কোনো অসুবিধে হবে না তো?

নে চল তাড়াতাড়ি, আন্নু বলল, আমার খুব চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।

শহরের এ দিকটা একটু বেশি নির্জন। রাস্তার দুদিকে ছাতার মতো ডালপালায় বিস্তার নিয়ে প্রকান্ড প্রকান্ড কৃষ্ণচূড়া ছায়া আর অন্ধকার হয়ে দাঁড়িযে আছে।

তোর ভয় করে না কাজল! গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল।

কিসের ভয় বলছিস্?

এই অন্ধকারে—

না, মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো কাজল, আমার শুধু ভয় করে আমাকে। জানিস, আমাকে। এখন মনে হচ্ছে বেশ ছিলাম হোস্টেলে। কংসাবতীকে খুব ভয় করতো, তাও বেশ ছিলাম।

এসব কথা কেন বলছিস?

জানি না—। তোর সেই লোকটার কথা বল গায়ত্রী।

একটু পরে অর্জুনের বাড়ির সামনে পৌছে গায়ত্রী থমকে দাঁড়াল। বলল, দারুণ, এটা বাড়ি না কাগজে আঁকা ছবি রে? এখানে মানুষ থাকে নাকি! ইস্, কি লাকি তারা।

আন্নু বলল, তুই আর ফিরে যাস না কাজল। আমরা তোর কথা সবাইকে বলে দেব যে তুই—

কাজল ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে তার মুখ চেপে ধরলো।

তুই যা বলবি তা আমি জানি, কিন্তু আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। হাফাচ্ছিল কাজল।

চা আর এক ডিস ভর্তি নানা রকম খাবার।

ইস্, যা খিদে পেয়েছিল না। আন্নু খাবলা করে বিস্কুট তুলল। এবং একসঙ্গে সব মুখে পুরলো।

ওর খিদে পাওয়া, কান্না পাওয়া, ঘুম পাওয়া সব বাচ্চাদের মতন। কোথাও কোনো লুকোছাপা নেই।

এক কাপ চা শেষ করে আন্নু বলল, নাইস, আর এক কাপ দিতে বল কাজল।

বেতের চেয়ারে পিঠ ছড়িয়ে দিয়ে বসেছে সে। গলার কাছে চিকচিক করছে ইমিটেশন লকেটটা। দুটো পুষ্ট স্তন এখন দুটি পর্বতশৃঙ্গ হয়ে মাথা তুলে আছে। কিছু একটা ভাবছে বলে থুতনিটা একটু নিচু এবং কপালটা একই সঙ্গে আনত হবার ফলে দুই ভ্রুর সমতটে আঁকা লাল টিপটা দেখা যাচ্ছে না।

গায়ত্রী যথারীতি অস্থির। বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে চা খাচ্ছে। একটা বেগুনী ফুলের ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের ইশারায় জানতে চাইল সে, এই ফুলটার নাম কি রে?

কাজল একই রকম ভাবে ইশারায় জানিয়ে দিল, কি জানি, জানি না।

আন্নুর কি হলো হঠাৎ কে জানে, দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এই কাজল, শোন্, তোর অর্জুনের সঙ্গে আমার সন্দীপদার বদলাবদলি করবি?

কাজল তার কথা শুনে প্রথমে একটু গম্ভীর তারপর চঞ্চল তারপর সহসা উন্মত্ত ঝড়ের মতন হয়ে বলল— না — না। কিছুতেই না—

তার সেই না শব্দটা দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটলো, পর্দার গায়ে লেপটে আকুলি বিকুলি করলো, সবশেষে একটা ডানা ভাঙা প্রজাপতি হয়ে তেজপাতা গাছের দিকে চলে গেল।

এই ভয় পেয়ে গেলি? ভয় পেয়ে গেলি তুই,—এটা তো ঠাট্টা—হাততালি দিয়ে গালে টোল ফেলে হাসলো আন্নু। চেঁচিয়ে গায়ত্রীর নাম ধরে ডেকে বলল, চল্ গায়ত্রী, তোর বীরুর সঙ্গে আলাপ করে আসি—তুইও কাজলের মতন ভয় পাবি না তো—

বীরুর নাম কানে যেতেই গায়ত্রীর মনে পড়ে গেল সে বীরুর মার জন্যে মিষ্টি কিনতে এসেছে। এতক্ষণ নিশ্চয় বীরুর মা তার জন্যে অপেক্ষা করে করে ফিরে গিয়েছেন। পঞ্চাশ টাকার নোটখানা বুকের মধ্যে ঘামে ভিজে একশো। ইস্ তার একদম মনেই ছিল না। বীরু নিশ্চয় এতক্ষণে ভাবতে শুরু করেছে সে সত্যিই আর ফিরবে কিনা। পরযায়ী পাখির মতন দু রাত্তির, মাত্র দু' রাত্তির তার ডালে বিশ্রাম নিয়ে আবার উড়ে গিয়েছে গায়ত্রী। তারই মধ্যে কতো আশা, কতো স্বপ্ন, খড়কুটো কুড়িয়ে বাসা বাঁধার কি আকুল চেষ্টা।

এই কাজল শিগগির বলতো মিষ্টির দোকানগুলো কোনদিকে?

বাজারে।

তুই ঠিক জানিস?

হ্যাঁ।

চল্, আমার সঙ্গে চল্।

আন্নুকে নিয়ে যা। আমি আকাশকে স্কুল থেকে আনতে যাবো।

আন্নুর একহাত ধরে টানতে টানতে রাস্তায় পা দিয়ে গায়ত্রী বলল, কাল আসবো, ঠিক এই সময়। একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়।

কাজল এগিয়ে এলো, কিসের বুদ্ধি বলে যা—

আমি যা বলবো তাই করলে অর্জুনের বাড়ি থেকে পালানো বৌ আবার ফিরে আসবে।—

কথা বলতে বলতে প্রায় ছুটছে সে। আন্নু তার দৌড়ের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়লো।

ফুচকাওলা তাকে ডেকে বলল, দিদি আসেন, আপনি আজ একলাই ফুচকা খেয়ে যান। পয়সা পরে দিবেন। আন্নু তার ডাক শুনেও উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলো।

এখানে আসার পর থেকে এতক্ষণ কোনদিন সে বাইরে থাকেনি। হাঁটার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে চলতে চলতে কাজলের না বলাটা মনে পড়ে গেল তার।

কাজল তার কথায় ভয় পেল কেন? তাহলে কি সে সত্যিই—ধ্যাৎ— নিজের ভাবনাটাকে নিজেই আমল দিল না আন্নু। বাড়ির দরজায় পা দেবার পর বুকের মধ্যে একটা আনকোরা অনুভূতি হলো তার। আঃ— এইখানে কারা যেন তার ফেরার পথের দিকেই তাকিয়ে আছে। এ জন্ম নয়, জন্ম-জন্মান্তর থেকে তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেবে বলে দুহাত মেলে আছে তারা। তারা আর আন্নুর কেউ হয়তো নয়, তবু এখন তাদের ছাড়া সে বাঁচবে না। আন্নুর বুকের মধ্যেটা ছপছপে হয়ে ভিজে গেল।

(২৮)

সকালে বিছানা থেকে ওঠার পরেই হেমলতার মনে হলো সারা বাড়িটা কেমন গোমড়া মুখ করে আছে। আন্নু তা'র কাছেই শুয়েছিল। এখনো গভীর ঘুমে অচেতন। সন্দীপ টেবিল আলো জ্বালিয়ে নিজের ঘরে বসে কি যেন লিখছে, শুধু স্বরাজ বাড়িতে নেই। যথারীতি অন্ধকার ভালো করে ফর্সা হবার আগেই

মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে গিয়েছেন।

কাল রাতে নিজের ঘরে যাবার আগে সন্দীপ এ ঘরে এসেছিল—মা এবার বোধহয় কৌশিকের খোঁজ পাওয়া যাবে।

কথাটা যার উদ্দেশ্যে বলা সে তখন ঘরের একপাশে বসে মন দিয়ে রেডিওতে কণিকার রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছিল।

হেমলতা তার হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, রোজই তো শুনছি শিগগিরই কৌশিকের খোঁজ পাওয়া যাবে। যাই হোক, ওকে পেলে এখানে ধরে নিয়ে এসো।

সে এখানে আসতে যাবে কেন?

আন্নু রেডিওটা সুইচ টিপে বন্ধ করে বলল, নিশ্চয় আসবে। আমি এখানে আছি শুনলে দেখবেন, আসলে আমাকে ও ভীষণ ভালবাসে।

দেখবেন, নিজের ভাইকে পেয়ে আমাদের আবার ভুলে যাবেন না যেন।

কথাটা সন্দীপ এমন ভাবে বলল যে হেমলতা আর আন্নু দুজনাই তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সন্দীপ হাত তুলে বলল, অনুরাধা দেবী, কাল ready থাকবেন, আমার সঙ্গে আপনাকে হয়তো যেতে হতে পারে—

খুবই স্বাভাবিক কথা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা প্রতিবাদ করে বললেন, না তুই কোথাও যাবি না অনুরাধা।

মা—

আমি যা বলেছি তাই হবে। ছেলের সমস্ত ইচ্ছেকে অগ্রাহ্য করে হেমলতা আবার বললেন, ও এখান থেকে কোথাও যাবে না, এই আমার শেষ কথা।

যদি কৌশিককে আইডেনটিফাই করতে হয় তাহলেও তোমার আন্নুদেবী যাবেন না!'

না যাবে না।

শুতে যাবার আগে কিছু একটা না পড়লে স্বরাজের ঘুম আসতে চায় না। নিজের ঘরে বসে দুর্গেশনন্দিনী পড়ছিলেন তিনি। পাশের ঘরের উত্তেজিত কথাবার্তা কানে যেতে উঠে এলেন, কি হলো তোমাদের?

তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করো।

হেমলতা রাগ হলে এই রকমভাবে কথা বলেন।

তিনি সন্দীপের দিকে চোখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে সে ইশারায় স্বরাজকে জানিয়ে দিল যে কিছুই হয়নি।

স্বরাজ ঘরের মধ্যেটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আধঘন্টার তো ব্যাপার, ওর জিপে করে চলে যাবে আবার তাতেই ফিরে আসবে।

হেমলতার বদ্ধমূল ধারণা এ সংসারে তাঁকে জব্দ করার জন্যে স্বামী ও পুত্রের একটা মিলিত চেষ্টা সব সময় কাজ করে চলেছে। এখনো সেই ধারণাতেই তিনি নিজের জেদ আঁকড়ে থাকলেন, যাও নিজের ঘরে যাও তোমরা। আয় আন্নু, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

(২৯)

রান্নাঘরের দরজায় একটা ছায়া পড়ার পর হেমলতা চোখ তুলে তাকালেন। সন্দীপ নিজের ঘর ছেড়ে উঠে এসেছে।

কি রে—?

আমি আজ তাড়াতাড়ি বেরবো, আমার ব্রেকফাস্ট কোরো না, সন্দীপ বলল।

সে কি, কোথায় খাবি?

সে ঠিক খেয়ে নেব কোথাও—তাড়াতাড়ি চা দাও।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সেদিকে কান পেতে শব্দটা শুনলো সন্দীপ। বলল, বাবা আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন, কি ব্যাপার?

জানি না—

পরক্ষণে ভেতরে এলেন স্বরাজ। উৎফুল্ল এবং উত্তেজিত। হাতে একটা বড় প্যাকেট। সেটা নামিয়ে রেখে বললেন, বাজারের পাশ দিয়ে আসছিলাম, গলদা চিংড়ি পেয়ে গেলাম। বহুদিন এতবড় সাইজের চিংড়ি বাজারে আসেনি—

সন্দীপ বলল, কতো করে নিল, চারশো?

স্বরাজ তার কথাটা শুনেও উত্তর না দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বেসিনের দিকে গেলেন। এবং সেখান থেকেই বললেন, সে ওঠেনি এখনো?

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আন্নু ঘুম চোখে সেখানে এসে দাঁড়াল—, উঠেছি। আজ তুমি আমাকে ডাকোনি কেন, আমিও তোমার সঙ্গে মর্নিংওয়াকে যেতাম।

সন্দীপ হেমলতার হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

বিনাবাক্যে তার চলে যাওয়াটা দেখে কেন যেন হঠাৎ মনে মনে ভয় পেল আন্নু।

(৩০)

দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজলের বাড়ির দিকে যাবার সময় মাঝরাস্তায় সন্দীপ এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল, কোথায় যাচ্ছ, ফুচকা খেতে না আইসক্রিম খেতে?

একমুহূর্তে আন্নু বুঝে উঠল, সন্দীপ এখানে তারজন্যেই অপেক্ষা করছিল। তার জিপটা রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

চলো, তোমার ভাই কৌশিককে খুঁজে বার করেছি।

কোথায় পেলেন?

পাশের ব্লকে একটা মেসে থাকে।

আমি কোথায় যাবো?

আমার সঙ্গে, কেন ভয় করছে নাকি?

নাহ্, ভয় করবে কেন শুধু শুধু। চলুন কোথায় যেতে হবে।

আন্নু আরো কিছু বলার আগেই জিপে উঠে বসলো। সন্দীপের শরীরে পুলিশের ইউনিফর্ম। সদর রাস্তা থেকে একটা মেয়েকে জিপে তুলে নিয়ে যাচ্ছে—এরকম নাটক সব সময় বিনা পয়সায় দেখা যায় না। গোটা কয়েক পথচলিত মানুষ তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আন্নু বিব্রত হয়ে বলল, কোথায় নিয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি চলুন, দেখছেন না পাবলিক কি ভাবে দেখছে আমাকে!

গাড়িতে স্টার্ট নিয়ে সন্দীপ বলল, ওরা তোমাকে ফুলনদেবী নম্বর টু বলে ভাবছে।

কথাটা হাল্কা ভাবে বললেও সন্দীপ এই মুহূর্তে খুব সিরিয়াস।

বেশিদূরে নয়, মিনিট দশেক পরেই একটা নির্জক পার্কের সামনে জিপ থামিয়ে সে কঠিন গলায় বলল,—নামো—

এখানে—?

এখানেই তোমার ভাই আছে।

আন্নু আর একটিও কথা না বলে নেমে এলো গাড়ি থেকে। আশ্চর্য, এখন তার একটুও ভয় করছে না। বরং সন্দীপের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে হাসিই পাচ্ছে তার।

পার্কের ভেতর ঢুকে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে সন্দীপ বলল, বসো।

বুঝেছি, আন্নু দাঁড়িয়ে বলল, পুলিশ কেন আজকাল আর আগের মতো এফিসিয়েন্ট নেই।

কেন?

কারণ তারা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তাদের নিয়ে থানায় না গিয়ে পার্কে আসে। এবং সুযোগ বুঝেই তাদের ওপর—

তার কথা শেষ হবার আগেই সন্দীপ দাঁতে শব্দ কেটে হিস হিস করে উঠলো—Stop, I say stop.

যাই ঘটুক, তাকে যাই বলুক সন্দীপ কিছুতেই ভয় পাবে না, আন্নু তা জিপে ওঠার সময়েই ঠিক করে নিয়েছিল। কিন্তু এখন সে সত্যিই ভয় পেল—, সন্দীপের হাতে কেউটের মতন কুচকুচে কালো পিস্তলটা তার কপালের দিকে অভ্রান্ত লক্ষ্যে স্থির হয়ে আছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা সন্দীপকে এখন আর সে চিনতে পারছে না। হাসতে হাসতে এই মানুষটার পাশে বসেই জিপে এখানে এসেছে সে!

আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?

তুমি কে—Who are you? তার কথার উত্তর না দিয়ে সন্দীপ তার প্রশ্নটা আন্নুর ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল।

আমি—আমি—আন্নু ঢোক গিলল, আমার নাম তো আমি বলেছি—।

But I want to know your real name. তুমি কোন দলের হয়ে কাজ করছো? সুন্দর তেওয়ারী না ঝন্টু সিং...? আমাকে খুন করার জন্যে ওরা তোমাকে কতো টাকা দেবে?

আন্নু তার কথার তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারলো না। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। হৃদপিন্ডটা এত দ্রুত চলছে যে তার মনে হলো ওটা এবার বন্ধ হয়ে যাবে। তাও সে কোনো রকমে বলল, তেওয়ারী সিং এরা সব কারা?

খুব বেশি চালাক হওয়ার চেষ্টা করো না—।

বারে, আমি ওদের না চিনলে জোর করে চেনাবেন নাকি—

সন্দীপ আন্নুর হাত ধরে টেনে বেঞ্চির ওপর তাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, আমি দশ গুনবো, ঠিক দশ, তার মধ্যে আমার কথার জবাব না পেলে তোমার ডেডবডি এই পার্কের ঘাসের ওপর পরে থাকবে। সুন্দর তেওয়ারীর পাঠানো দুজনকে আমি এইভাবেই শেষ করে দিয়েছি, and I got reward for that...।

আপনি সত্যিই আমাকে মেরে ফেলবেন?

Yes, না মারলে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। চট্ করে বলে ফেল আমাকে মারার ছকটা কি ভাবে করেছ?

আন্নুর চোখে জল আসার মতো হচ্ছিল। অনেক কষ্টে সেটা সামলে বলল, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে—

সন্দীপ এপাশ ওপাশ তাকিয়ে পার্কের কলটার দিকে যাবার জন্যে তাকে ইশারা করলো—।

আন্নু তার পরেও গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো—।

কি হলো—

ওই জল মানুষে খায় নাকি? আচ্ছা, ওই তেওয়ারী আর সিং বুঝি খুব খারাপ লোক?

Yes, murderer—

আপনি তাদের কখনো দেখেছেন?

দেখেছি—

আমিও দেখেছি, আন্নুর বুকের মধ্যে হৃদপিন্ডটা এখন আর লাফাচ্ছে না। কান্নার দমকাটা গলা থেকে নেমে গিয়েছে।

আশ্চর্য, সন্দীপ বলল, দেখে তো বাইরে থেকে ভদ্র পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে বলেই মনে হয়। আমি প্রথম দেখেই সন্দেহ করেছিলাম যে—

আপনি কি সন্দেহ করেছিলেন—?

মা ফোন করে বলল, কি মিষ্টি একটা মেয়ে এসেছে আমাদের বাড়িতে। আমি তখনি বলেছিলাম, খবরদার ওকে বাড়িতে shelter দিওনা।

ইস্, আপনার heart বলে কিছু নেই নাকি, একটা অসহায় যুবতী মেয়ে দিন যখন প্রায় শেষ হয় হয় তখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে সে যাবে কোথায়? ভাগ্যিস, আপনি তখন বাড়িতে ছিলন না।

এসব ফালতু কথা এখন থাক্। সন্দীপ আবার মুখের ওপর গাম্ভীর্যের এবং নিষ্ঠুরতার মুখোশ পরে নিল, তোমরা হোস্টেল থেকে কেন পালিয়েছো?

ওমা, আপনি জেনে ফেলেছেন আমরা কে! আন্নু হাসি হাসি মুখ করলো, সেকথা তো বাড়িতে বললেই পারতেন। শুধু শুধু এতদূরে ধরে এনে—

বাড়িতে বললে বাবা আর মার কাছে তুমি মুখ দেখাতে পারতে?

ঠিক বলেছেন তো, মেনি থ্যাংস...। আমার কিন্তু সত্যি খুব তেষ্টা পেয়েছে।

সন্দীপ তার তেষ্টা পাওয়া শুনেও কোনো আমল দিল না। বলল, আর দুজন কোথায়?

কাদের কথা বলছেন?

গায়ত্রী আর কাজল।

কথা বলতে বলতে পকেট থেকে তিনখানা ফটো বার করলো সন্দীপ, এদের মধ্যে গায়ত্রীর ফটো কোনটা, আর কাজল—

ঝুঁকে পড়ে তার হাতের ফটোগুলো দেখে নিয়ে আন্নু বলল, একি মেয়েদের ফটো পকেটে নিয়ে ঘুরছেন কেন?

যা জানতে চাইছি তাই বলো, এদের মধ্যে গায়ত্রী কোন্‌জন?

আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, আন্নু গলায় হাত রাখলো। এখানে কাছাকাছি

কোন ড্রিংসের কোনো দোকান নেই?

এনে দিচ্ছি। তার আগে যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।

আন্নু বলল, ওই তিনটে ফটোর মধ্যে যাকে সব চেয়ে সুন্দর দেখতে সেই গায়ত্রী।

কথাটা বলতে বলতে চোখ নামিয়ে নিল আন্নু। সন্দীপ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টির ভাষায় পুলিশের কঠোরতা নেই, যা আছে তার ভাষা দিয়ে বুঝতে পারলো সে। এবং বুঝতে পারার পর তার বুকের মধ্য ক্ষীণ প্রায় অশ্রুত একটা কম্পনকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলল, ও আমাদের লিডার।

জানি—

নিশ্চয় হেমামালিনী বলেছে।

হেমামালিনী কে?

আমাদের হোস্টেল সুপার মিস মেনন্। তার সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?

লালবাজারে।

লালবাজারে—, একই কথা উচ্চারণ করতে গলা কেঁপে গেলে আন্নুর—

বাড়িতে খুনটুন হলে তবে লোকে তো লালবাজারে যায়।

বাড়ি থেকে মেয়েরা পালালেও যায়।

সন্দীপ কথা বলার সময় অন্যমনস্কভাবে হাতের পিস্তলটা পকেটে পুরে ফেলল। আড়চোখে সেটা দেখে নিয়ে আন্নু বলল, বড্ড মশা কামড়াচ্ছে এখানে। চলুন, অন্য কোথাও যাই—

মশা, কই আমাকে তো কামড়াচ্ছে না—

সন্দীপের কথায় হেসে ফেলল আন্নু। হাসতে হাসতে বলল, সর্বনাশ মশার বুঝি প্রাণের ভয় নেই—। মশাও জানে মশাই পুলিশের পকেটে সব সময় গুলি ভর্তি হয় রিভলবার নয়তো পিস্তল থাকে।

আন্নু এখন আবার আগেকার আন্নু। পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসা ঝর্ণার মতন। গালের টোলটা ফিরে এসেছে। নাকের ডগায় সিঁদুরের আভা।

ইস্, সত্যিই তার কথা শুনে মা যদি বাড়ি থেকে আন্নুকে সেদিন তাড়িয়ে দিত? হঠাৎ কেন যেন তার বসের ওপর খুব রাগ হলো। হর্ষবর্দ্ধন লোকটা মানুষ হিসেবে এমনিতে খুব খারাপ নয়। শুধু সব কাজেই এত তাড়া লাগায় যে বিরক্ত লাগে। এরমধ্যেই দুদিন নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়ে সন্দীপকে বলেছেন, তুমি একটি অপদার্থ যে, তিনটে মেয়েকে খুঁজে বার করতে তিনমাস লাগিয়ে দিলে।

তিনমাস নয় দুদিন হয়েছে স্যার—

Don't argue, দুদিন অনেক সময়—

I swear, মনে মনে বলল সন্দীপ, দুদিন কেন সাতদিনেও আমি মেয়েগুলোর খবর দেবো না, তাতে আমার রেকর্ড খারাপ হয হোক।

কি ভাবছেন?

সন্দীপ আন্নুর কথায় রেগে গেল, কি ভাবছি তা তোমাকে বলতে হবে নাকি?

আচ্ছা, আপনি হঠাৎ হঠাৎ এতো রেগে যান কেন বলুন তো! সেই কখন বলেছেন আইক্রিম খাওয়াবেন তার নাম সেই অথচ রাগের বেলায়—

আমি তোমাকে আইসক্রিম খাওয়াবো একবারও বলিনি।

আন্নু জেদি গলায় বলল. বলেছেন, এখন মনে করতে পারছেন না। ঠিক আছে, আমি আপনাকে আইসক্রিম খাওয়াবো, চলুন।

সন্দীপ তার নিজের মধ্যে ভাঙচুরের খেলাটা শুরু হয়েছে তা টের পাচ্ছিল। মা বাবা কি চায় তাও সে আন্দাজ করতে পেরেছে। কিন্তু ভালবাসা ব্যাপারটা কারেন্সি নোট নয় যে একদিক দেখেই মানুষ চোখ বুজে লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে নেবে। আর একদিক সে এই মুহূর্তে কিছুটা ম্লান আর কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তাতে কি লেখা আছে তা এখনো পড়া হয়নি তার।

সন্দীপ বলল, ঠিক আছে চলো, আমিই আইসক্রিম খাওয়াচ্ছি। তার আগে বলো কাজল আর গায়ত্রী এখন কোথায়?

জানি না।

জানো, বলছো না।

আন্নু নিজের মনে একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, কাজল তেজপাতাওলা বাড়িটাতে, আর গায়ত্রী কোথায উঠেছে বলেনি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।

কাজল গায়ত্রীর ঠিকানা জানে?

না, কাজলও জানে না।

থ্যাংস্।

সন্দীপের পেছন পেছন জিপের দিকে যেতে যেতে আন্নু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা আপনার পকেটে যেটা আছে, সেটাতে গুলি আছে?

আছে।

সত্যি বলছেন?

সন্দীপ মাথা ঝাঁকালো।

আপনি কখনো গুলি করে মানুষ মেরেছেন?

নাহ, পাখিও মারিনি—কিন্তু এসব কথা তুমি জানতে চাইছো কেন?

এমনি।

চলো, আইসক্রিম খাবার পর আমরা কাজলের বাড়ি যাবো। আমার তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

আপনি একা যাবেন, আন্নু বলল। নাহলে কাজল ভাববে আমি ওকে ধরিয়ে দিয়েছি।

সন্দীপ জিপে উঠে বসে বলল, আমি তোমাদের কাউকে ধরবো না—

Promise–!

সন্দীপ জিপে স্টার্ট দিয়ে বলল, Promise, কারণ আমি জানি সাবালক মেয়েরা তার যেখানে খুশি যেতে পারে। আমাদের হর্ষবর্দ্ধন সাহেব কেন, আই.জি. সাহেবেরও তাদের আটকানোর ক্ষমতা নেই।

থ্যাংস—। হর্ষবর্দ্ধন সাহেব বুঝি আপনার boss.

হ্যাঁ।

দু মিনিট আর কোনো কথা নেই। সন্দীপের মনে হচ্ছিল আইসক্রিমের দোকানটা এতো কাছে না হলে পৃথিবীটা রসাতলে যেত না।

কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে যাবার সময় আন্নু বলল, সেদিন মেসোমশাইয়ের সঙ্গে এসে অন্য একটা দোকানে আইসক্রিম খেয়েছিলাম।

এখানে অনেকগুলো আইসক্রিমের দোকান আর পার্লার আছে। এটাই সবচেয়ে বড়।

দু'জনে দুটো আইসক্রিম নিয়ে একটা খালি টেবিলে বসলো তারা। সব টেবিলই প্রায় ভর্তি। দেখলে মনে হবে এখানে যারা থাকে তারা ভাত খায় না, তার বদলে আইসক্রিম খেয়ে থাকে।

হেমিংওয়ে পড়েছো—। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো সন্দীপ।

পড়েছি। ওল্ডম্যান অ্যান্ড দি সি।

সন্দীপ বলল হেমিংওয়ে সাহেব এক জায়গায় লিখেছিলেন—"in stead of blood put some cosmetics inside the body, what you will get, an american woman."

কথাটা যদি একটু বদলে নাও, এইভাবে "instead of blood put some ice cream inside the body, what you will get, a Saltlake woman."

যাঃ, তাই বলে এখানকার সবাই এতো আইসক্রিম খায় নাকি?

না খেলে, চারপাশে এতো আইস্ক্রিমের দোকান আর পার্লার কেন।

বাঃ—প্রথম চামচ মুখে দিয়েই আন্নু বলল, দারুণ। জানেন, এখন গায়ত্রী

এখানে থাকলে চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে যেতো। ও বলে মেয়েরা বেশি আইসক্রিম খেলে মোটা হয়ে যায়।

ওকে বুঝি তোমরা সবাই খুব ভয় করো?

ভালবাসি।

টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে বসেছে সন্দীপ।

গায়ে পুলিশের পোশাক না থাকলে তাকে এখন ঠিক উঠতি কবিদের মতন দেখাতো।

সেই ভাবেই বসে থেকে সন্দীপ বলল, তোমার ভাই কৌশিককে খুঁজে না পাবার গল্পটা কিন্তু দারুণ। কার মাথা থেকে বেরিয়েছে, গায়ত্রী?

ওটা তো মিথ্যে নয়, আন্নুর হাত দুখানা টেবিলের ওপর পাশাপাশি অনড় হয়ে পড়ে আছে, কৌশিক আমার দাদার নাম, ভাই নয়। খুব ভালো ফুটবল খেলতো।

এখন খেলে না?

আন্নু কথা না বলে মাথা নাড়লো, ও তো নেই—

নেই মানে?

পুলিশ গুলি করে মেরেছিল, প্রেসিডেন্সিতে পড়তো তখন। ওই আমায় হেমিংওয়ে পড়তে শিখিয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর সন্দীপ উঠে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। তারপর দু'জনে পাশাপাশি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলের ওপর আইসক্রিম ভর্তি বাটি দুটো তেমনি পড়ে থাকলো।

(৩১)

এখন কোথায় যাবো আমরা, কাজলের বাড়ি?

আন্নু জিপে ওঠার আগে দাঁড়াল, জিগ্যেস করলো।

না, আজ থাক্।

অন্যমনস্ক ভাবে তার কথার উত্তর দিল সন্দীপ। তারপর বলল—একদিন গেলেই হবে।

(৩২)

টেবিলের ওপর মিষ্টির বাক্সটা রেখে গায়ত্রী হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, মা কই, আসেননি এখনো?

ফোন করেছিল, সন্ধ্যেবেলা আসবেন।

ইস্, ততক্ষণে তো মিষ্টিগুলো সব বাসি হয়ে যাবে। ফ্রিজে তুলে দিচ্ছি।

গায়ত্রী পাল্টে বলল, আমার জন্যে আজ আপনার অফিসে যাওয়া হলো না। সরি—।

চলো, তাহলে নতুন পর্দা কেনার কথা ছিল, কিনে আনি।

গায়ত্রী গলা পাল্টে বলল, ধ্যাৎ, শুধু শুধু পর্দা পাল্টাতে হবে না।

তুমিই কিন্তু বলেছিলে এ বাড়ির পর্দাগুলো বাজে।

তখন বাজে মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম, এখন তো বেশ সুন্দর লাগছে। ডিজাইনটাও নতুন ধরনের।

এরপর কি বলবে ভেবে পেল না বীরু।

এক মিনিট পর গায়ত্রী বলল, এক জায়গায় যদি নিয়ে যান তাহলে যেতে পারি।

কোথায়?

আপনি বলুন তো কোথায়?

বীরু মাথা চুলকে বলল, আমি কি করে বলবো।

গায়ত্রী হাসলো, আমি জানতাম আপনি বলতে পারবেন না, জয়তিদের বাড়ি।

না—।

আমার ওপর রাগ করলেন?

তার কথার উত্তর না দিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে রেলিং-এ বুক দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো বীরু। গায়ত্রী মিষ্টির বাক্সটা ফ্রিজে তুলে বারান্দায় এলো, কই বললেন নাতো, আমার ওপর রাগ করেছেন কিনা।

বীরু নিরুত্তর।

জয়তির ব্যাপারটার জট খুলতে হলে আরও ধৈর্য ধরতে হবে বোধহয়—বুঝতে পারছিল গায়ত্রী। জয়তিকে নিয়ে ঘৃণাটা বীরুর মনকে এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে এই ঘৃণাটাকে তার মন থেকে অপসৃত করতে হবে। কিন্তু সে সময় তার হাতে নেই। সাতদিন পরেই তাদের হোস্টেলে ফিরে যাবার কথা।

কি করি কি করি ভাবতে ভাবতে গায়ত্রী চানঘরে ঢুকে পড়লো। আর তখনি তার কানে এলো—বাইরের দরজার ডোরবেলটা বাজছে। এই তিনদিন যতক্ষণ সে এবাড়িতে আছে একবারও ডোরবেলটা বেজে উঠতে শোনেনি সে। পাশের বাড়ির বৌটি আসে যখন দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে চলে আসে। বৌটাকে বেশ লাগে গায়ত্রীর। তার আসাটা হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দমকা বাতাস ঢুকে পড়ার মতন।

প্রথমদিনই গায়ত্রী তাকে বলেছিল, আমি তোমায় ভাবী বলে ডাকবো।

You can call me in my name – পরিষ্কার নিখুঁত ইংরিজি। তারপর গায়ত্রী জানতে পেরেছিল কার্শিয়াং কনভেন্টে পড়াশোনা করা মেয়ে। তার বর ব্যবসা করে। টাকা গাড়ি সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট, বছরে বছরে বিদেশে বেড়াতে যাওয়া—কিছুরই অভাব নেই। বরটা ক্লাস সিক্সে উঠেই বাপের ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিল। একবর্ণ ইংরিজি বলতে পারে না।

তাহলে বাড়িতে তুমি কি করো ভাবী—?

আমাদের ভাষায় কথা বলি, শুনবে একটু—।

তোমার কোনো কষ্ট হয় না?

না, কিসের কষ্ট! যা শিখেছিলাম, সব ভুলে গিয়েছি। যাই শ্বশুরজীকে গরম পানি দিতে হবে।

মাথা মুছতে মুছতে বাইরে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো গায়ত্রী। ডাইনিং টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে তারই কিনে আনা মিষ্টি বাক্সটা হাতে নিয়ে মিষ্টি খাচ্ছে—

হাই—

মেয়েটি বলল, আমি হাসি। আমার ভালো নাম অলকানন্দা। আমি বীরুদার মামার মেয়ে।

গায়ত্রী বলল, এক মিনিট, এক্ষুনি মাথাটা আঁচড়ে আসছি।

তার পেছন পেছন এলো অলকানন্দা, আশ্চর্য, বীরুদা তোমার কথা আমাকে একবারও বলেনি।

চান করে সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় সামনে দাঁড়ালে মানুষকে অন্য রকম দেখায়। নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালেও গায়ত্রী নিজেকে দেখছিল না।

অলকানন্দাকে দেখতে কার মতন? আগে কোথাও কি তাকে দেখেছে? মুখটা চেনা চেনা লাগছে কেন? এই সব ভাবছিল সে।

তার মধ্যেই মনে পড়ে গেল তাদের হোস্টেলে কার সঙ্গে যেন একবার দেখা করতে এসেছিল অলকানন্দা।

পাজামা আর লম্বা ঝুল একটা কাজ করা পাঞ্জাবী পরলো গায়ত্রী। বলল, বীরুদা আপনার কথাও আমাকে বলেনি কিন্তু।

যা বাব্‌বা। আমি আবার আপনি হয়ে গেলাম কেন, কেউ আমাকে আপনি বলে না।

দু'জনে বারান্দায় এসে দেখলো বীরু সেখানে নেই। দেখছি কোথায় গেল, — চলে গিয়ে আবার তক্ষুনি ফিরে এলো, গায়ত্রী, ঠিক যা ভেবেছি তাই,

কিচেনে আমাদের জন্যে কফি তৈরি করছেন।

এই বীরুদা, বীরুদা—চেঁচিয়ে বারান্দা থেকে ডাকলো অলকানন্দা। তুমি চলে এসো শিগগির, আমরা কেউ এখন কফি খাবো না।

আমার কথা তোমাকে উনি কি করে বলবেন, গায়ত্রী ভেজা চুল রোদ্দুরের দিকে মেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আমার এখানে আসাটা আমি নিজেই জানতাম না।

But you are here... তিনদিন আছো এখানে। Its a long time ... সে শাড়ির আঁচলটা গলার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলো, আমরা দু'জনে পিঠোপিঠি। ভাইবোন বলে আমাদের দুজনার মধ্যে খুব ভাব।

ওর জয়তির সঙ্গে ভালবাসার কথা সব আমি জানি।

সব জানো— এখন চুলের মধ্যে ডানহাতের পাঁচটা আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখছে গায়ত্রী।

অলকানন্দা বলল— সব, সব জানি।

ভালবাসাটা এখন আর নেই তাও জানো?

What!—এক মুহূর্ত থমকে থাকার পর অলকানন্দা চেঁচিয়ে বলল, ওরাতো বিয়ে করবে ঠিক করেছিল!

তার বিস্ময় কাটার আগেই ট্রেতে তিনকাপ কফি নিয়ে সেখানে এসে বীরু বলল, এই হাসি, তখন থেকে এতো চেঁচাচ্ছিস কেন রে? কি হয়েছে?

যাও, যাও তোমার হাতের কফি আমি ছোঁবো না, you are betrayer, oh I can't believe.....

কফি সুদ্ধু ট্রেটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল বীরু— ছেলেরা কক্ষনো betray করে না, never। তুমি কফি খাও না খাও that is upto you any way. মামা কেমন আছেন—

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল অলকানন্দা। ধীরে ধীরে নিজেকে সহজ করে নিয়ে বলল, কি বললে, বাবা, he is fine এবং যথারীতি আমার কি করে ভালো হয় তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই রবিবারেও আনন্দবাজার আর স্টেটম্যানে মেট্রিমনিয়াল কলামে আমার বিয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

তুমি বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ে করবে নাকি?

অলকানন্দা হাসলো, আমি বিয়েই করবো না। জানো, আমার বাবার ধারণা বিয়ে করা ছাড়া মেয়েরা বাঁচতে পারে না—, funny.... অথচ he is most modern.

হেঁট হয়ে কফি তুলে তার হাতে দিল গায়ত্রী। তারপর আবার কফি তুলে দেখলো বীরু সেখানে নেই।

অলকানন্দা আর আপত্তি না করে কফিতে মুখ ডুবিয়েছে। গায়ত্রীর মনে পড়ে গেল—হোস্টেলে নয়, কাগজে অলকানন্দার ছবি দেখেছে সে। একবার নয়, কয়েকবারই দেখেছে কিন্তু কেন ছবিটা ছাপা হয়েছিল তা মনে করতে পারলো না।

কফি খেতে খেতে অলকানন্দা বলল, আমার বাবা কি করেন জানো, মস্ত বড় পুলিশ অফিসার। অথচ রাত্তিরে-দিনে যখনই সময় পান রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন, কবিতা পড়েন। বাড়ি ছাড়াও লালবাজারে নিজের চেম্বারে রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙিয়েছেন। আমরা দুইবোন কেউই বাবার মতো হতে পারিনি...।

অলকানন্দার গলায় অনুশোচনা নেই তাও তাকে সেই মুহূর্তের জন্যে দুঃখী মনে হলো।

অলকানন্দা ফর্সা নয় কিন্তু তার মুখশ্রীর জন্যে অনেকজনার মধ্যে তাকে আলাদা রকম মনে হয়। তার চোখ দুটো বড্ড বেশি উজ্জ্বল। বেশি সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। ওই চোখ দু'টোর গভীরতাই এক অদ্ভুত অহংকারে সব সময় তাকে ঘিরে থাকে।

বাইরে থেকে তাদের আলোচনা বোধহয় শুনেছিল বীরু। কাছে এসে বলল, খিচুড়ি চড়িয়ে দিয়ে এলাম, কি হাসি, তুই কি এখান থেকেই তোর স্কুলে যাবি?

হ্যাঁ। তোমার তুলনা নেই বীরুদা, কি করে বুঝলে আমার খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছিল?

বীরু তার কথায় উত্তর না দিয়ে বলল, এই গায়ত্রীকে মামার কথা কি বলছিলি রে?

তোমার মামা যে রবিঠাকুরের এক নম্বর চামচে সেই কথা বলছিলাম।

গায়ত্রী তার কথা বলেছে তোকে?

কই না।

ও একটা অদ্ভুত মেয়ে—

গায়ত্রী বলল, আমি বলছি। কলেজের হোস্টেলে থাকতে আমরা হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। তাই তিনবন্ধু মিলে যুক্তি করে একদিন হোস্টেল থেকে পালিয়ে এখানে এসেছি। আমার আর দুজন বন্ধু কাজল আর আন্নু দুটো বাড়িতে shelter নিয়েছে। অবশ্য কেউই নিজেদের নাম বলেনি। সাতদিন থাকার পর আমরা আবার হোস্টেলে ফিরে যাবো। It's game.

অলকানন্দা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ওয়াণ্ডার ফুল। ইস্ আমার আফশোস

হচ্ছে। আমার বয়সটা যদি তোমাদের মতন হতো—

ও সেদিন হঠাৎ না এসে পড়লে—কথাটা বীরু শেষ করতে পারলো না। গায়ত্রীর চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল।

তারপর একটু থেমে বলল, গাযত্রী তুমি যদি হাসির কীর্তি শোনো তাহলে অবাক হয়ে যাবে। ও নিজেই একটা মূর্তিমতী unpredictable. অবশ্য মামা দেখছি এখনো হাল ছাড়েনি। কথার মধ্যে হঠাৎ দৌড়ালো হাসি, ইস্ খিচুড়িটা বোধহয় পুড়ে গেল।

ফিরেও এলো তক্ষুনি। গায়ত্রীকে বলল, আবার যদি কোনদিন পালাও তা'হলে সোজা বর্ধমানে আমার দিদির বাড়িতে চলে যেও। তোমার ভীষণ ভালো লাগবে।

তোমার দিদি—

হ্যাঁ। আমার থেকে তিন বছরের বড়। ওর বর মানে ভরতদার মতন মানুষ তুমি দ্বিতীয় খুঁজে পাবে না। অবশ্য আমার বাবার মতে he is a worthless fellow.

তোমাদের বাড়িতে বুঝি এই নিয়ে—

নাহ্, আমাদের বাড়িতে কক্ষনো ঝগড়া হয় না।

অলকানন্দা বলল, দিদিদের নিজেদের ঠিক করা বিয়ে। ভরতদা এম. এ. তে সেকেন্ড হয়েছিলেন। সাবজেক্ট ইকনমিকস। বিয়ের পরেই ওরা বর্ধমানের একটা গ্রামের স্কুলে চাকরি জোগাড় করে চলে গেল। ভরতদা যখন স্কুলে থাকে দিদি সংসারের সব কাজটাজ শেষ করে চরকায় সুতো কেটে সেই সুতোয় নিজেদের পরার শাড়ি-ধুতি তৈরি করে নেয়। আমার এবারের জন্মদিনে দিদি এই শাড়িটা আমায় দিয়েছে। কথা বলতে বলতে অলকানন্দার চোখে মুখে মুগ্ধতার আলো ঝিক্‌মিক্ করছিল। বোঝা যাচ্ছিল, তার ভালোলাগাটা দিদি-জামাইবাবুকে নয় তাদর জীবনযাপনের সহজ সরল পদ্ধতিকে। এমন মানুষ হয়তো দেশে অনেক আছে কিন্তু হাসির চেনাজানার মধ্যে এরাই।

গায়ত্রীর মনে হচ্ছিল চলমান স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটা এই মানুষ দু'জনের প্রাণশক্তি কোন্ জাদুতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা একবার গিয়ে দেখে এলে হয়। তারজন্যে তাদের আর পালাতে হবে না। কলেজের কোনো ছুটিতে আনু আর কাজলকে নিয়ে চলে গেলেই হবে। খাবার পর চলে যাবার সময় অলকানন্দাকে একা পেয়ে হঠাৎ গায়ত্রী বলল, কই, তুমি তো আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করলে না, এখানে একা বীরুদার সঙ্গে থাকতে আমার ভয় করছে কিনা?

আজ সকাল থেকেই খুব গরম পড়েছে। হাওয়া নেই একটুও। মোটা খদ্দরের শাড়ি পবে ঘামছিল হাসি। গালের ওপর ঘামে ভেজা চুল লেপটে আছে।

তা সত্ত্বেও তার চোখের ধার এতটুকু অনুজ্জ্বল হয়নি। গায়ত্রীর কথার পর একটুও না ভেবে বলল, তুমি যদি একদিন আমার স্কুলে যাও তাহলে তোমার কথার উত্তর পেয়ে যাবে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে সেখান থেকে মুখ তুলে চেঁচিযে বলল, তুমি যদি আর তিনদিন এখানে থাক তাহলে তারমধ্যে আর একবার আসবো। যাচ্ছি—

গায়ত্রী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরেই সিঁড়িতে হাসির পায়েব শব্দটা আবার ফিরে এলো।

কি হলো, ফিরে এলে?

তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। রাস্তায় বেরিয়ে মনে পড়লো।

জরুরি কথা?

ভীষণ জরুরি, তুমি বীরুদাকে সঙ্গে করে আমার মাকে একবার দেখে এসো। মার তোমাকে খুব ভালো লাগবে।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে েমে রাস্তায় মিলিয়ে গেল হাসি। গায়ত্রীর বুকের মধ্যে একটা রামধনু সাত রং ছড়িয়ে খেলা শুরু করেছে।

হাসির জীবনের প্রায় কিছুই জানে না সে, তবু তার মনে হচ্ছে এ জীবনে হাসির মতন আর একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাসিরা থাকে বলেই সংসারে বাঁচতে ইচ্ছে করে।

সে ঘরে ঢোকার আগেই বীরু বলল, চলো।

কোথায়?

তুমি যে জয়তিদের বাড়ি যেতে চেয়েছিলে তখন।

না থাক্। তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো গায়ত্রী।

(৩৩)

সকলের আগে কাজলই অর্জুনের গাড়িখানা ঢুকতে দেখেছে। আকাশের হাত ধরে ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে এসে গেটটা খুলে দিল সে, আপনি?

সিঙ্গাপুর ট্রিপটা ক্যানসেল হলো।

ভালোই হয়েছে—

বলছেন! গাড়ির দরজা খুলে নেমে এলো অর্জুন। কালকে আপনাদের কোনো

প্রোগ্রাম নেই তো?

আমাদের মানে?

আকাশ আর আপনার।

না।

Good, চলুন তাহলে কাল সকালে উঠেই সবাই মিলে কোথাও চলে যাই।

আপনার কারখানা, অফিস—?

ছুটি— ছুটি.....। আহ, কতোদিন ছুটি পাইনি জানেন? সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরিয়ে যাবো। রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করবো কোথায় যাওয়া হবে। রাজি?

অনেক রাত্তিরে কেন যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কাজলের। উঠে এ.সি.টা বন্ধ করলো। তারপর জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কাল সকালে উঠেই বাইরে বেড়াতে যাওয়া। মনের মধ্যে সে না চাইলেও একটা উত্তেজনা মাঝে মাঝে তির তির করে উঠছে।

অর্জুনকে ঘিরে কোনো রহস্য নেই, তাও কেন যেন তাকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। এই বুঝতে না পারার অভিমানেই কি তার স্ত্রী এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে?

জানলার বাইরে লনের ওপর অন্ধকারে একটি সচল ছায়ামূর্তির ওপর কাজলের দৃষ্টি আটকে গেল। অর্জুন! রাতে না ঘুমিয়ে পায়চারি করছে সে। রোজ রাতেই কি অর্জুন এইভাবে বিনিদ্র কাটায়? তার যন্ত্রণা? স্ত্রীকে ভুলতে না পারা না অন্য কিছু?

কিছুক্ষণ পরে বিছানায় ফিরে গেল কাজল। আশ্চর্য, মানুষকে বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। আজ সন্ধ্যে অবধি কাজলের ধারণা ছিল আকাশের মা এ সংসারে একটা অতীত, একটা বিস্মৃত অধ্যায়। হঠাৎ কাজলের মনে হলো তার খুব গরম লাগছে। তাও উঠে এ.সি.টা চালালো না সে। অন্ধকার শূন্যের দিকে কিছু না ভেবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাজলের বুঝতে পারার মধ্যে দিয়েই এক সময় ভোর হয়ে গেল।

বাইরের দরজায় টুক টুক করে টোকার শব্দ।

বেডটি নিয়ে ভীমদা হাজির। অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু বেশি তাড়াতাড়ি। বাইরে যাবার তাড়া আছে।

এই কদিনেই কাজল বুঝেছে এ বাড়িতে সবকিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

পরশু তার জন্যে দু সেট রাতে পরে শোবার পোশাক দিয়ে গিয়েছে সনৎ। তার আপত্তি শোনেনি। কাজল শুধু তার পছন্দের রং-এর কথা বলে দিয়েছিল। কিন্তু এখনো প্যাকেট খোলাই হয়নি।

শাড়ির আঁচল গুছিয়ে দরজা খুলে দিল কাজল। গুড মর্নিং ভীমদা—

গুড মর্নিং। আপনার চা। ভীম নয়, অর্জুন।

কাজল নিজের অজান্তেই বুকের ওপর আঁচল টানলো—, একি আপনি!—

আমি বাড়ি থাকলে মাঝে মাঝে বেডটি বানাই।

কাজল তোতলাতে থাকলো নাহ, তা ঠিক নয়, মানে আমিও তো.... আপনি শুধু শুধু....

অর্জুন ঘরের মধ্যে ছোট টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রেখে বলল, ইন্দিরাজীও তাঁর গেস্টদের জন্যে অনেক সময় নিজে হাতেই চা বানাতেন। Any way get ready. ভীমের ব্রেকফাস্ট বোধহয় ready.

অর্জুন চলে গেল।

সে তাগাদা দিয়ে গেলেও চায়ের কাপটা দু মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো কাজল। বসে থেকেও কিছুই ভাবলো না সে। কিচ্ছু না।

(৩৪)

বাঃ, এটাকে কি শাড়ি বলে?

তাঁতের শাড়ি, এমনি। কাজল বলল, কোনো নাম নেই।

নিন, আপনি আর আকাশ পেছনে বসুন। ভীম সামনে আয়। এক মিনিট, খাবার টাবার সব ঠিক উঠেছে?

ভীম ঘাড় নাড়লো।

আকাশের মতো অর্জুনও পাজামা পাঞ্জাবী পরেছে, শুধু ভীমের পরনে সার্ট প্যান্ট। এতো দামি আর এতো সুন্দর গাড়িতে আগে কখনো চড়েনি কাজল। দুপাশ দিয়ে চলমান পৃথিবীর ছবি চোখ ফেলতে না ফেলতে সরে যাচ্ছিল। একটা দৃশ্য শেষ হতে না হতে আর একটা দৃশ্য সামনে থেকে পেছনে সরে যাচ্ছিল।

এ দিকটাতে আগে কোনদিন আসেনি কাজল। আসার প্রশ্নও নেই। হোস্টেল থেকে কলেজ, আবার কলেজের পর হোস্টেল।

এর বাইরের জগৎ মানে ছুটিতে বাড়ি যাওয়া—বাবা মা ভাই বোন কাকা কাকী।

এখানে এখনো চারপাশে অবাধ প্রকৃতির রাজ্য। অনেকদূর দূর এক একটা বাড়ির খাপছাড়া অস্বিস্ত। হঠাৎ দেখলে কেমন যেন মনে হয় চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর সেই জায়গাটার মোহ ছাড়িয়ে কোথাও আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

স্টিয়ারিং-এ বসে মাথা না ঘুরিয়ে অর্জুন বলল, এ রাস্তারটার নাম ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস। অনেকদিন আগে এখানে দশবিঘে জমি কিনে রেখেছিলাম একজনার কথায়। তার ইচ্ছে ছিল এখানে একটা স্কুল করবে।

কার কথা বলতে চাচ্ছে অর্জুন? কার স্বপ্ন পূরণের জন্যে এখানে এতখানি জায়গা কিনেছে সে?

পাশে তাকিয়ে কাজল দেখলো আকাশ চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। তার পায়ের ওপর ক্রিকেটের ব্যাটখানা। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে আকাশ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে বল করতে পারে কিনা।

গাড়ি একটা জায়গায় ধীরে ধীরে থেমে দাঁড়ালো। সব গাড়িই থেমে পড়েছে। সামনেই লালচোখ।

গুডমর্নিং সোম সাহেব—

গুডমর্নিং, ভেরি গুডমর্নিং—

এত সকালে দলবল নিয়ে কোথায় চললেন সোম সাহেব?

আরে, আমাদের হচ্ছে পুলিশের চাকরি, আমাদের সকাল বিকেল কিছু থাকতে নেই।

ঠিক পাশে দাঁড়ানো জিপের দিকে দামী বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল অর্জুন, নিন সোম সাহেব।

আপনার রবীন্দ্রচর্চা কেমন চলছে—

বাহ্। একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম—

একদিন চলে আসুন না, সাহানাদেবীর গাওয়া ক'খানা রেকর্ড হঠাৎ একটা দোকানে পেয়ে গেছি। অপূর্ব।

যাবো একদিন, অর্জুন বলল, যাবার আগে ফোন করে যাবো। আপনি যা ব্যস্ত লোক।

তা যা বলেছেন, সোম সাহেব ধোঁয়া ছাড়লেন। এই দেখুন না, একটা মেয়েদের হোস্টেল থেকে তিনটে মেয়ে বেপাত্তা হয়েছে। No trace ...... হোম মিনিস্টার নিজে কাল ডেকেছিলেন।

অর্জুন বলল, আচ্ছা সোম সাহেব, একটা কথা বলুন তো, আজকাল সবাই এতো পালাচ্ছে কেন?

ভালো কথা বলেছেন, সোম সাহেব দৃষ্টিতে লাল আলোকে সবুজ হতে দেখলেন। মেয়েগুলোকে ধরতে পারলে জিজ্ঞেস করে দেখবো। চলি, সাহানা দেবী—

জিপটা দ্রুত এগিয়ে গেল। শেষ কথাটা শোনা গেল না।

অর্জুন গাড়ি স্টার্ট করে বলল, চলুন আমরাও কিন্তু আজ পালিয়ে এসেছি—তাই না অনুরাধা?

সোম সাহেবের জিপ অনেকক্ষণ আগে দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পরেও কাজল গাড়ির মধ্যে নিজেকে আড়াল করে বসেছিল। অর্জুনের গলার অনুরাধা ডাকটা তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না সে। হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে আকাশের একখানা হাত আঁকড়ে ধরলো।

একটা গেটওলা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নির্জন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে অর্জুন বলল, আসুন অনুরাধা, আকাশ নেমে এসো—

বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না এই পাঁচিলঘেরা জায়গাটার মধ্যে এতো কিছু আছে। একখানা লাল টালি দেওয়া বড়ঘর। তার গায়ে আরো দুখানা ঘর। বাঁধানো ঘাটওলা পুকুর। একপাশে নারকোল গাছের সারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে মাচায় অসংখ্য শশা ঝুলে আছে।

একটা সাদা কালো দেশি কুকুর দৌড়ে এসে অর্জুনের পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো। অর্জুন দুহাতে ধরে তাকে কোলের মধ্যে তুলে নিল আদর করার জন্যে।

আমরা লাঞ্চটা এখানে সেরে আবার বেরিয়ে যাবো। আপনার খারাপ লাগছে না তো?

না না—

I am sorry, তখন আপনার নাম ধরে ডেকে ফেলেছি।

কাজল বলল, আমি কিছু মনে করিনি।

থ্যাংস—। কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে অর্জুন বলল, ভীম, লাকিকে মাংস দে। তারপর আকাশের হাত থেকে ব্যাটখানা নিজের হাতে নিয়ে বলল, পিনু, যাও বল করো আমাকে।

এখানে যা কিছু এতক্ষণ ধরে ঘটে চলেছে তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা হিসেব মেলানোর চেষ্টা করছিল কাজল। —এখানে আজ যার থাকার কথা সে নেই সত্যি তবু কাজলের যেন মনে হচ্ছিল অর্জুনের সব কথা, সব হাসি এবং মৌনতা, সব আনন্দ এবং অহংকার একজন অদৃশ্য কারুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কাজল সেখানে ভীষণ রকমের বেমানান। তার অনধিকার প্রবেশ

করার বোধ তাকে নিঃশব্দে দগ্ধ করছিল।

আকাশ আর অর্জুন একপাশে ক্রিকেট খেলা শুরু করে দিয়েছে। অর্জুনের হাতে ব্যাট।

ভীম গাড়ি থেকে নেমে খাবার ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ারগুলো নামাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই একটা ঘটনা ঘটলো—, একটা ছোটঘরের মধ্যে থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

মুহূর্তের মধ্যে আচমকা ভূমিকম্প হবার মতো করে টলে উঠলো অর্জুন। হাতের ব্যাটখানা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলো, তুমি, তুমি এখানে—?

আকাশ তার ছোট্ট হাতখানা শূন্যে তুলে পরক্ষণে পাখির মতো ভাসতে ভাসতে সেইদিকে এগিয়ে গেল—মা।

কাজলের বিভ্রান্তি কাটার আগেই সে বুঝতে পারলো দুটি চোখের ঘৃণা তাকে লেহন করার ছলে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করছে।

বাঃ, চমৎকার—মহিলা এই দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

অর্জুন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

একটু থেমে থেমে সে বলল, তুমি এখানে কেন এসেছ?

আকাশ দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

চলে যাচ্ছি, মহিলা বলল। এক্ষুণি চলে যাচ্ছি, চলো আকাশ—

আকাশ তোমার সঙ্গে যাবে না।

যাবে। আমি ওর মা—। চলো আকাশ।

আকাশ মাকে ছেড়ে দুজনার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ মাটির দিকে—।

অর্জুন বলল, তোমাকে আমি যেতে বলিনি লক্ষ্মী।

সব কিছু মুখ ফুটে বলার দরকার হয় না। একটা মেয়েকে নিয়ে বাগান বাড়িতে ফূর্তি করতে এসেছ। চমৎকার—।

অর্জুন বলল, উনি আকাশের গভর্ণেস। আশা করি, তুমি নিজেকে আর ছোট করবে না।

ক্রিকেট ব্যাটখানা হেঁট হয়ে মাটি থেকে তুলে নিল অর্জুন। বলল, তুমি থাকো, আমরাই চলে যাচ্ছি। অনুরাধা আসুন, আকাশ চলে এসো—

লক্ষ্মীর মুখে একই সঙ্গে লজ্জা আর অপমান খেলা করছিল। এগিয়ে এসে কাজলের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। বলল, sorry. আমি কথাটা ওইভাবে বলতে চাইনি, মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সামনে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার

ফিরে এলো লক্ষ্মী, আশা করি অর্জুন আপনার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। Please আমার ছেলেকে lonely feel করতে দেবেন না।

এতক্ষণে কেউ খেয়াল করেনি যে ঘরগুলোর পেছনে একখানা ছোট পদ্মিনী দাঁড় করানো আছে। লক্ষ্মী হনহনিয়ে সেই গাড়িখানার সামনে গিয়ে দরজা খুলে তাতে উঠে বসলো। পরক্ষণে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দুরন্ত বেগে গেট দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রতিটি মানুষ অনেকক্ষণ বোবা হয়ে থাকলো। এমনকি অর্জুনও বহুক্ষণ একটিও কথা বলল না। কাজল কি কথা বলবে তাই মনের মধ্যে হাতড়াতে থাকলো।

ভীম দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর আদেশের অপেক্ষায়।

কি করবেন তাহলে?

আমি বলবো?

কাজল ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে।

অর্জুন বলল, I am sorry. এ রকম ঘটবে জানলে আমরা কিছুতেই এখানে আসতাম না।

কাজল বলল, লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। এখানেই খেয়ে নিই আমরা। তারপর রাত অবধি এখানে থাকা হবে। ডিনার এখানেই খেয়ে তারপর আমরা রওনা হবো।

এখানে ডিনার কোথায় পাবেন? ভালো হোটেল সব দশ পনেরো কিলোমিটার দূরে। তাতেও অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই, ভীম গিয়ে নিয়ে আসবে। কি কি আনবে আপনি বলে দেবেন।

তার কথা শুনে মাথা নাড়লো কাজল, না, আমি একটু অন্য রকম ভেবেছি—

কি ভেবেছেন বলুন—

রাতের ডিনার আমি বানাবো,—খিচুড়ি আর মাছ ভাজা—

Oh God, কতোদিন খিচুড়ি খাইনি, at least দশ বছর।

খুব ধীরে ধীরে গুমোট আবহাওয়াটা কেটে যাচ্ছে। বাতাসে কলাপাতার মাথা দোলানোর শব্দ। একঝাঁক টিয়া উড়ে গেল ঠিক মাথার ওপর দিয়ে।

আচ্ছা, এখানে কি নেই বলুন তো?

তার মানে?

অর্জুন বলল, যেমন ধরুন এখানে আসার পর থেকেই আপনার মনে হচ্ছে একটা কি যেন নেই। মানে সেটা নেই বলেই এই বাগানটার প্রাণ নেই।

বলবো?

Please–

একটা ঝর্ণা। .... ছোট্ট কিন্তু খুব রাগী,

আর—?

তার সামনে গিয়ে কান পেতে দাঁড়ানোর আগেই তার নূপুরের শব্দ শোনা যাবে।

আর—

কাছে গিয়ে তাকে ছুঁতে ভয় লাগবে না—

ভীম... ভীম... উত্তেজিত গলায় ডেকে উঠলো অর্জুন, খানা লাগাও জলদি।

টেনে পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে নিল কনুই অবধি। বলল, next month-এ এখানে এলে আপনার ঝর্ণা পেয়ে যাবেন, ম্যাডাম Thank you for your suggestion. পুকুরের ধারে খোলা আকাশের নিচে চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। স্যুপের বাটিতে চামচ নাড়তে নাড়তে অর্জুন বলল, I am happy. লক্ষ্মী আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। জানেন, এইখানে, ঠিক এইখানে খাওয়ার টেবিলে এইভাবে বসে লক্ষ্মী আমায় বলেছিল, সে ঠিক করেছে আমার সঙ্গে আর থাকবে না। আমি মনে করেছিলাম ও ঠাট্টা করছে।

পুকুরের জলে একটা বড় মাছ ভুস করে ভেসে উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল। লাকি হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে দৌড়ে গেল একদিকে।

স্যুপ, নান, আলু পনির, রোষ্ট চিকেন, আইসক্রিম আর ফল।

খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিল অর্জুন। মুখ না তুলেই বলল, এখানে সত্যিই যদি একটা স্কুল করি, আপনি তার দায়িত্ব নিতে পারবেন?

আমি—?

হ্যাঁ আপনি, জীবনে চ্যালেঞ্জ না এ্যাকসেপ্ট করলে হার-জিতের তফাৎটা বোঝা যায় না। রাস্তায় আসতে আসতে সোম সাহেবকে দেখলেনে তো, ওর ছোট মেয়ে অলকানন্দার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, দেখে অবাক হয়ে যাবেন। তারও একটা স্কুল আছে, অন্য রকমের স্কুল। মেয়েটাকে হিংসে করতে ইচ্ছে করে।

তার কথা শোনার পর কাজল মনে মনে নিজেকে শুনিয়ে বলল, অলকানন্দা কে আমি চিনি না। তার স্কুলটা দেখিনি কিন্তু তোমার মধ্যে অনেক কিছু আছে অর্জুন অনেক কিছু, যার জন্যে তোমাকেও হিংসে করা উচিত।

কি হলো আকাশ, খাচ্ছো না কেন?

একই সঙ্গে অর্জুন আর কাজল কথাটা বলল। আকাশ তার নরম চোখ তুলে বলল খেতে ইচ্ছে করছে না।

Why, কেন খেতে ইচ্ছে করছে না তোমার?

অর্জুন চেষ্টা করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখলো। তুমি তো রোষ্ট চিকেন খেতে পছন্দ করো।

এখন ভালো লাগছে না।

কাজল জিজ্ঞেস করলো, তাহলে তোমার কি ইচ্ছে করছে?

কয়েক মুহূর্ত পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সে বলল, পুকুরে চান করতে।

No, No—এতক্ষণের চেপে রাখা রাগটা অর্জুন প্রকাশ করে ফেলল। তুমি পুকুরে চান করবে না। No, never.

তাহলে আমি মার কাছে যাবো।

তার মুখে কথাটা শুনে কয়েক সেকেণ্ড হতবাক হয়ে গেল অর্জুন। তারপর হাতের কাঁটা চামচ নামিয়ে রাখলো—তখন গেলে না কেন মার সঙ্গে?

তখন ইচ্ছে করেনি।

দুপুরের শেষে গোটা দলটা আবার ফেরার পথে সকালের সবকটা জায়গা অতিক্রম করে এলো।

রাত পর্যন্ত থাকার ব্যাপারে কাজলই বলেছিল, চলুন, আমরা বাড়ি ফিরে যাই— .

Good proposal, তাই চলুন।

এতক্ষণ গাড়িতে কেউ একটিও কথা বলেনি। বাড়িতে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন বলল, আমার মনে হচ্ছে এখন থেকে আমার হার শুরু হয়ে গেল।

কি বললেন আপনি?

কাজলের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো অর্জুন, না, কিছু না।

সেদিনের আসা চিঠির স্তূপ থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে পড়তে রাত্তিরে একখানা চিঠির ওপর চোখ রেখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো অর্জুন, লক্ষ্মীর উকিলের চিঠি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ডির্ভোস চেয়েছে তার ক্লায়েন্ট শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী। দেরী হলে অথবা রাজী না হলে তার ক্লায়েন্ট মহামান্য আদালতে যেতে বাধ্য হবেন।

(৩৫)

পরদিন দুপুরে নির্দিষ্ট পার্কে তিনবন্ধুর দেখা হতেই আন্নু কাজলকে বলল. এই কাল তোরা কোথায় হনিমুন করতে গিয়েছিলি রে?

কাজল তার দিকে তেড়ে গেল, তোর এখনো গাল টিপলে দুধ বেরোয়, তুই

হনিমুনের কি বুঝিস রে ছুঁড়ি।

আন্নু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, objection গায়ত্রী, you should make her understand that আমার বয়স এখন একুশ plus. Secondly ছুঁড়ি শব্দটা sily, আই ডোন্ট লাইক it.

গায়ত্রী তাদের দুজনার কান্ড দেখে হাসছিল। বলল, ঠিক আছে কাজলকে এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে। আজ ফুচকার দাম কাজল দেবে।

কিন্তু আমি আর ওখানে ফুচকা খেতে যাবো না। আন্নু বলল।

কেন রে। লোকটা তো ধারেও দেয়।

না তা নয়। আমার মনে হচ্ছে লোকটা আসলে ফুচকাওলা নয়, পুলিশের লোক। ফুচকাওলা সেজে ফুচকা বিক্রি করে।

কি করে বুঝলি তুই?

আন্নু বলল, প্রথমেই লোকটার গোঁফ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, টিপিক্যাল পুলিশের গোঁফ। তারপর— তার কথা শেষ হবার আগেই কাজল বলল, তুই সন্দীপকে জিজ্ঞেস করলেই পারতিস।

ধ্যাৎ, ও জানলেও বলবে না।

ঠিক বলেছিস তুই—

গায়ত্রী বলল, তাহলে আজ ফুচকা খাওয়া ক্যানসেল।

কাজল বলল. চল পার্কে যাই।

পার্কে পরে যাবো, আন্নু বলল, চল তার আগে হেমমালিনীকে ফোন করি। খুব মজা হবে।

ওরে বাবা, আমি কিন্তু কথা বলতে পারবো না।

কাজলের ভয় দেখে গায়ত্রী বলল, তোকে কিছু বলতে হবে না। আমিই বলবো।

তিনজনে সামান্য পথ এগিয়ে দাঁড়াল, এই এখানে ওইগুলো কোন্‌দিকে রে?

আন্নু বলল, বাজারের আশেপাশে নিশ্চয় পেয়ে যাবো। আজকাল যেখানেই যাবি সেইখানেই আর কিছু থাক না থাক ব্যাঙের ছাতার মতন এস. টি. ডি. আর ফ্যাক্স আর আই.এস.ডি. বুথ। এই কাজল, আন্নু জিজ্ঞেস করলো, আই.এস.ডি. মানে কি করে?

আমিই তোকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলো।

বাজারের আগেই একটা দোতলা বাড়ির গ্যারেজে যা খুঁজছিল তাই পেয়ে গেল তারা।

কাঁচের দরজা ঠেলে তিনজনে ভেতরে ঢোকার পর গায়ত্রী বলল, আমরা একটা ফোন করবো।

এস.টি.ডি.?

না লোকাল।

দোকানি ছেলেটি আবার তার হাতে ধরা সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতায় ডুবে গেল।

পর পর তিনটে খোপ। কাচের পাল্লার ওপর লাল কালিতে লেখা কাগজ সাঁটা। তাই দেখে লোকাল কলের খোপে ঢুকলো গায়ত্রী।

ফোনের রিসিভার তুলে বোতাম টিপতেই মুহূর্তের মধ্যে কংসাবতীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, — হ্যালো— আমি বলছি ম্যাম—

আমি, আমি কে?

গায়ত্রী। কাজল আন্নুও আমার সঙ্গে আছে—মুহূর্তের জন্যে সব নিশ্চুপ। পরক্ষণে ঝড়ের বেগে ওপাশ থেকে কংসাবতীর প্রশ্ন ভেসে আসতে লাগলো... গায়ত্রী আহ্, তোমরা কোথা থেকে বলছো, বলো শিগগির বলো কোথা থেকে বলছো... Oh my sweet gril...। আমি আর কক্ষনো তোমাদের ওপর রাগ করবো না, I promise....আহা তোমরা কি জানো এ কদিন আমি একফোঁটা ঘুমোইনি... কি হলো কথা বলছো না কেন গায়ত্রী... ভালো আছ তোমরা......Please কথা বলো।

এই তো বলছি, গায়ত্রী বলল, না আমরা ভালো নেই।

কেন, কেন ভালো নেই তোমরা...? তোমাদের কি কেউ অপহরণ করেছে? তোমরা কি—

গায়ত্রী গলাটা করুণ করে বলল, আমাদের বোধহয় আর কোনদিন ফিরে যাওয়া হবে না।

For God Sake ও কথা বলো না, কংসাবতীর গলায় কান্নার স্পষ্ট আভাস।

আপনি পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন? কেন গিয়েছিলেন, বলুন কেন গিয়েছিলেন?

Don't missunderstand me, my child :.. তোমাদের ভালোর জন্যেই আমি...

আপনি কি কাজল আর আন্নুর সঙ্গে কথা বলতে চান?

চাই, চাই—শিগগির দাও।

ফোনে হাত চাপা দিয়ে গায়ত্রী বলল, হেমামালিনী কাঁদছে রে, নে তোরা কথা বল্।

তার হাত থেকে আন্নু রিসিভারটা নিয়ে বলল, ম্যাম, আমরা একটা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে আছি,—

একটা মোটা গোঁফওলা কালো ডাকাতের মতো লোক খালি আমাদের ফুচকা খেতে বলে। আর একটা লোক, সেও খুব বিচ্ছিরি দেখতে সে কাজলকে শাসিয়েছে। বলেছে তার সঙ্গে হনিমুনে না গেলে কাজলকে খতম্ করে ফেলবে। কাল, হ্যাঁ ম্যাম, কাল প্রাণের ভয়ে তার সঙ্গে হনিমুনে গিয়েছিল.... না না বিয়েটিয়ে কিছুই হয়নি, শুধু হনিমুন.... কাজল আর গায়ত্রী হাসতে হাসতে মাটির ওপর বসে পড়লো। দোকানের ছেলেটা মুখের সামনে থেকে ফিল্মের পত্রিকাখানা সরিয়ে এখন অবাক হয়ে তাদের কান্ড দেখছে।

একি...আপনি এতো কাঁদছেন কেন ম্যাম, বললাম তো বিয়ে ছাড়াই হনিমুন...ওই লোকটা মেয়ে ধরে আনে, তারপর তাদের নিয়ে হনিমুনে যায়। বিয়ে টিয়ের কথা, না না বললাম তো, পুলিশকে জানাবো...? হ্যাঁ একজন ইনস্পেকটার না না বোধহয় পুলিশের বড় অফিসারই হবে লোকটা, তাকে বলেছিলাম। সে কি করলো জানেন? তার জিপে চাপিয়ে আমাকে একটা আইসক্রিমের দোকানে নিয়ে গিয়ে বলল, আগে আইসক্রিম খাও। তারপর তোমার কমপ্লেন শুনবো। আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না ম্যাম, আমরা কী ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি—ইস্ ম্যাম আপনি please আর কাঁদবেন না...please...বললাম তো আপনাকে, আইসক্রিম খাইয়ে সেই লোকটা আমার কপালে রিভলবার ঠেকিয়েছিল...হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যিকারের রিভলবার, গুলিভর্তি... আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনো দেখা হবে না...। এই তো বাঃ good girl শুধু শুধু কাঁদছিলেন এতক্ষণ, না ম্যাম, ... কাজল এই তো আমার সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে—অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল আন্নু। তার দুচোখে কৌতুক দপ্‌দপ্ করছে...। ইশারায় তাদের বলল, হেমামালিনী একদম কাত্। ইয়েস ম্যাম, আমাদের তো এক্ষুনি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে... কিন্তু কি করে যাবো... ওই যাঃ আসল কথাই তো আপনাকে বলা হয়নি... যে লোকদুটো আমাদের ধরে রেখেছে মানে ঐ ফুচকাওলা আর হনিমুন পাগল লোকটা, তারা বলেছে আপনি যদি সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করেন তবেই আমাদের মুক্তি দেবে তা নইলে আমাদের তিনজনার লাশ... কাজল মুখ চেপে ধরে দোকানের বাইরে বেরিয়ে গেল। গায়ত্রী ইশারায় আন্নুকে বলল, চালিয়ে যা আন্নু—

আন্নু ফোনে বলল, কী ম্যাম, আপনি রাজি...? সাতদিনের মধ্যে কি বলছেন ম্যাম, আপনি একবার রাজি হয়ে যান দেখবেন আমরা ফিরে গিয়ে একদিনের মধ্যেই সব—

পাত্র...? হ্যাঁ পাত্র...? আমরা জানি ম্যাম, আপনি একজনকে ভালোবাসেন...yes mam, আমাদের হোস্টেলে যতো মেয়ে আছে সকলেরই মত হলো... আপনার সঙ্গে তাকে ভীষণ... ভীষণ... মানাবে.... থ্যাংকু......ম্যাম... আপনি আমাদের জীবন বাঁচালেন থ্যাংকু.......কাল আবার যেকোন সময় আপনাকে ফোন করবো....এখন ছাড়ছি—ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার পর গায়ত্রী তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো।

আন্নু মুখের গলার ঘাম মুছতে মুছতে বলল, ইস্, ম্যাম কি কাঁদছিল রে.... আমার এতো খারাপ লাগছিল....। চল্, আমরা কালই ফিরে যাই গায়ত্রী।

কাজল ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দোকানের ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো, কতো হয়েছে ভাই—?

ছেলেটি বলল, টাকা লাগবে না।

সেকি! টাকা নেবে না কেন, এতক্ষণ ধরে ফোন করলাম আমরা—

ছেলেটি এবার কাজলের মুখোমুখি উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না কাজলদি, আমি বাবলু।

বাবলু—?

বারে, আপনারা যখন নবদ্বীপে গানতলা পাড়ায় থাকতেন তখন আপনার বাবা জগদীশ স্যারের কাছে আমরা অংক করতে যেতাম...মনে পড়েছে?

কাজল অতীত স্মৃতি হাতড়াচ্ছিল। মাথা নাড়লো বা-ব-লু—

বাবলু বলল, আপনাদের বাড়ির দুখানা বাড়ি আগে কুমোর বাড়ির ঠিক গায়ে লাগা সাদারং এর দোতলা।

কাজলের স্মৃতি থেকে বাবলু নামের একটা হাফপ্যান্ট পরা রোগা রোগা কিশোরের ছবি চেতনায় উঠে এলো, বাবলু, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে, তোদের বাড়ির রেলিং দেওয়া বারান্দায়—

বাবলু তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, মাধবীলতার একটা প্রকাণ্ড ঝাড়, তাতে সারাবছর—কাজল অনায়াসে বাবলুর দুকাঁধ নিজের দুহাতে আঁকড়ে তাকে টেনে নিল, ইস্ ছোটবেলায় তুই খুব মিষ্টি দেখতে ছিলি আর খুব রোগা—, এখানে কবে থেকে আছিস?

পাঁচ বছর হয়ে গেল। দুটো দোকান আছে আমার। বাবলু বলল, আপনাকে

একদিন আমি পাখির বাসা বাড়িটা থেকে বেরোতে দেখেছি। আপনি কি ঐ বাড়িটাতেই থাকেন কাজলদি।

হ্যাঁ রে।

ওই বাড়িতে বুঝি আপনার বিয়ে হয়েছে?

না বাবলু, ওখানে আমি বেড়াতে এসেছি। আবার শিগগিরই চলে যাবো।

বাবলু বলল, আপনারা কেউ আর এখন নবদ্বীপে যান না তাও আমরা প্রায়ই আপনাদের কথাই বলি। যদি কখনো যান দেখবেন সব ঠিক তেমনি আছে, এখনো রাস হয়, গাজন হয়। এখনো পোড়ামাতলায় সন্ধ্যেবেলা জমাট ভিড়ে লাইন দিয়ে ঘন্টি বাজিয়ে রিক্সাগুলো সওয়ারী নিয়ে যায় আসে। আচ্ছা কাজলদি, আপনারা আর আসেন না কেন?

এবার একদিন নিশ্চয় যাবো, বাবলু।

মিথ্যে কথা, যাবেন বলছেন কিন্তু কেউ যায় না। কার্টুনিস্ট চণ্ডীর নাম শুনেছেন, কাজলদি নরহরি কবিরাজের নাম শুনেছেন? কলকাতায় এসে কতো নাম যশ হয়েছে এদের। আমাদের পাড়ার, ওই যাদের ইটভাঁটা আছে সেই বাড়ির একটা ছেলেও লেখক হয়েছে। তার লেখা গল্প নিয়েই মনসুর মিঞার ঘোড়া ছবি তৈরি হয়েছে। আচ্ছা কই, এরা তো একবারও জানতে চায় না আমরা এখনো তাদের ভালবাসি কিনা—

বাবলু কাঁদছিল না কিন্তু তার চেয়েও গভীর এক আকুলতায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে কাজলের মনের মধ্যে অন্য এক রকমের কষ্ট হচ্ছিল। তার ফেলে আসা ছোটবেলাটা আর কিশোরী অবস্থার দিনগুলো, এখনো কী গভীর ভাবে তার মধ্যে বেঁচে আছে। বাবলুর একটু নাড়া পেয়েই সেগুলো এখন সত্যি হয়ে উঠে প্রবল আকর্ষণে তাকে পেছনে টানতে শুরু করেছে।

বাবলু বলল, এখান থেকে চলে যাবার আগে আর একদিন এসো কাজলদি।

রাস্তায় নেমে আসার পর ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল কাজল। এতক্ষণ অনেক কষ্টে যে কান্নাটা সে চেপে রেখেছিল তাই দুচোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে নেমে এলো।

তিনজনা একসঙ্গে অনেকক্ষণ একটিও কথা না বলে হাঁটতে থাকলো।

তারপর প্রথম কথা বলল গায়ত্রী—জানিস, আজ সকালে বীরুর মা এসেছিলেন। ভীষণ মিষ্টি—sweet...

আন্নু বলল, সব মা-ই sweet।

মোটেই না, গায়ত্রী দাঁড়িয়ে পড়লো, আমার মাকে দেখলে মনে হবে battle field-এ ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করে ফিরলো। তোর মাকে ঠিক উল্টো।

উল্টো মানে?

উল্টো মানে মনে হবে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দেখিয়ে ফিরলেন। সব মা এক রকম হয় না, বুঝেছ। কাজল কথা বলছিল না।

এখনো তার দু'চোখ মেঘমেদুর হয়ে আছে।

আন্নু তাড়া দিল গায়ত্রীকে, বীরুর মার কথা আর কি বলছিলি, বল্।

গায়ত্রী আগের কথার রেশ টেনে বলল, কতো বয়স জানিস, হার্ডলি থার্টি টু—। ছোটখাটো, টুকটুকে ফর্সা। বীরুতো মা মা বলে পাগল। ভেবেই পাচ্ছিল না কি করবে।

আর তুই?

আমি—? আমাকে মানে আমাকে দেখেই দুহাতে জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে দশটা চুমু খেলেন। বললেন আমি সব শুনেছি। তুমি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছ।

চুমু খেলেন তোকে?

হ্যাঁ। মারা তো চুমুই খায়।

আর বীরুর বাবা?

তিনি আসেননি। মাসীমা মানে বীরুর মা দু টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার এনেছিলেন। বললেন, সব নাকি আমার জন্যেই নিজে বানিয়েছেন। দারুণ। তারপর যাবার সময় আমাকে একটা শাড়ি দিয়ে গেলেন—

শাড়ি দিলেন তোকে—কাজল এই প্রথম মুখ খুললো। হ্যাঁ, আর বললেন, আজ থেকে আমার একছেলে আর এক মেয়ে।

আন্নু বলল, শাড়িটা কি করলি?

তার কথার পর গায়ত্রী দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, পরেছি, পরে আছি look.

ওয়াও—

আন্নু আর কাজল একসঙ্গে তাকে খামচে ধরলো, এই চলো আজ তোমাকে আমাদের আইসক্রিম খাওয়াতে হবে।

চলো খাওয়াচ্ছি—

আন্নু মুখে কপট দুঃখের আঁচড় টেনে বলল, হা আমার পোড়া কপাল, গায়ত্রী, তুই একখানা মা পেয়ে গেলি, আর কাজল ছেলে সুদ্ধু বর। আর আমি—ঠিক আছে, আমি ওই গোঁফওলা ফুচকাওলার কাছেই যাচ্ছি—

তিনজনা একসঙ্গে এতো জোরে হেসে উঠলো যে পথচলিত মানুষজন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। একদঙ্গল শালিক ভয় পেয়ে পিরিক্ পিরিক্

করে ডাকতে ডাকতে উড়ে পালাল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের একখানা মার্কামারা জিপ এসে তাদের তিনজনার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামনের সিট থেকে একটি যুবক মুখ ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলো, এই রাস্তা দিয়ে কাউকে ছুটে পালাতে দেখেছেন?

কাজল বলল, দেখেছি। কেন বলুন তো—

এক্ষুনি একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির এটেম্পট হয়েছিল, গোটা দলটা এপাশ ওপাশ ছিটকে গেছে।

গায়ত্রী বলল, তাহলে হলো না, আমরা যাকে দেখেছি সে একজন ফুচকাওলা। বড় বড় গোঁফ আর—

জিপটা একরাশ ধোঁয়া উদগীরণ করে চলে গেল।

ব্যাপারটা কি হলো জানিস? গায়ত্রী বলল।

কাজল তাকালো চোখ তুলে, কি হলো?

ওই লোকটার আসলে আমাদের সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে হয়েছিল।

ইস্, আগে বললি না কেন, আন্নু গালে টোল ফেলে হাসলো, তাহলে ঠিক ওর ঘাড় ভেঙে আইসক্রিম খেতাম আমরা।

কি করবি গাযত্রী, কাল ফিরে যাবো আমরা?

না—

গায়ত্রী এমন ভাবে না বলল যে বাকি দুজনের বুঝতে অসুবিধে হলো না তার মনের মধ্যে একটা কিছু আছে।

তাহলে কি করবো আমরা? কাজল বলল।

যা করছি তাই করবো, গায়ত্রী বলল, তুই পাখির বাসায় গভর্ণেস হয়ে থাকবি, আন্নু যেমন করে সন্দীপকে নাচাচ্ছে তেমনি চালিয়ে যাবে আর আমি বীরুর মার আদর খাবো।

হেমামালিনীর কথা একটু ভাববি না?

ভেবেছি, but we can't leave this place now. তার আগে একটু থেমে গায়ত্রী ওড়নাটা নাড়াচাড়া করলো। তারপর বলল, আমরা এখান থেকে ফিরে যাবার আগে বীরু যাকে ভালবাসতো মানে জয়তিকে ফিরিয়ে আনবো। আর লক্ষ্মীও আবার তার ছেলে আর অর্জুনের কাছে ফিরে আসবে।

তুই পাগল হয়ে গেছিস গায়ত্রী।

আন্নুর কথার উত্তর দেবার আগে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো গায়ত্রী। আমি যা বলছি তাইই হবে কিন্তু আমাদের সন্দীপের helf চাই। চলিরে, কাল দুপুরে

পার্কে চলে আসিস তোরা।

একটা চলন্ত থ্রি হুইলার থামিয়ে তাতে উঠে পড়লো গায়ত্রী। যেতে যেতে সে কি যেন চেঁচিয়ে বলে গেল, আন্নু-কাজল কেউই শুনতে পেল না। আমরা একটু বাড়াবাড়ি করছি, আন্নু বলল, আমাদের বোধহয় এখনই হোস্টেলে ফিরে যাওয়া উচিত।

কাজল বলল, গায়ত্রী কি বলল শুনলি না?

শুনেছি, কিন্তু আমার আর ভালো লাগছে না।

ভালো লাগছে না কথাটা সে এমন ভাবে বলল যে কাজলের মনে হোল কোনো একটা না বলতে পারা ব্যথায় আন্নুর বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে।

আজকের দিনটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেল। তাদের হোস্টেল থেকে পালিয়ে আসার পেছনে একটা হঠাৎ খেয়াল ছিল সত্যি কথা, কিন্তু অনেক কিছু না জানাও নিঃসন্দেহে হাতছানি দিয়ে ছিল তাদের অভিজ্ঞতাহীন জীবনকে।

বাড়ি যাই—কাজল বলল, তার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা, জানিস আন্নু, কংসাবতী ম্যামের কথা ভেবে আমার এখন খুব খারাপ লাগছে।

আমারও—, আন্নু বলল।

গায়ত্রী যা বলে গেল শুনলি তুই?

ধ্যুৎ, আমরা চাইলেই সবকিছু হয়ে যাবে নাকি?

এখন মনে হচ্ছে, আমাদের জীবনের এই সাতটা দিনের কোনো মানেই নেই।

কাজল হাত বাড়িয়ে আন্নুর বুকে হাত রাখলো, তোর মনে কি হচ্ছে জানি না, আমার কিন্তু অন্যরকম একটা—

কাজল, এই কাজল কি বলতে চাচ্ছিস্ তুই?

হ্যাঁরে, আগে বুঝতে পারিনি, he is very lonely, দুদিন মাঝরাতে উঠে দেখেছি অন্ধকারে একা একা বাগানে পায়চারি করছে। তখন, তখন তুই কার জন্যে—

কথাটা শেষ করতে পারলো না কাজল। দুচোখ ভিজে উঠেছে তার।

আন্নু নিজের হাতের মধ্যে তার একখানা হাত তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো।

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, তুই একটা পাগল কাজল, অর্জুনের একটা ছেলে আছে তাও তুই তাকে—

কাজল হঠাৎ বদলে নিল নিজেকে।

বলল, ধ্যাৎ, কি পাগলামি করছি বলতো আমরা। চল্ আমার ওখানে চল্। কফি খাবো।

(৩৬)

সকালে উঠেই কাজল বুঝতে পারলো বাড়িতে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। অর্জুনের কিসের যেন জরুরী দরকার আছে। বেডটি খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছে সে।

চায়ের কাপ হাতে বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল সে, বারান্দা আর লবির দেয়াল ছাড়াও সবকটা ঘরের দেয়াল থেকে লক্ষ্মীর ছবিগুলো উধাও। ছবিগুলো কালও ছিল।

সনৎ কোথায় যেন যাচ্ছিল। কাজল ডাকলো তাকে, সনৎবাবু শুনুন।

সনৎ এগিয়ে এলো, আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন আমি জানি দিদি। কাল রাতেই আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন, ম্যাডামের যেখানে যতো ছবি আছে সব খুলে ফেলতে।

হঠাৎ কি হল বলুন তো?

আপনি জানেন না?

জানি না, কি ব্যাপার বলুন তো?

উকিল ডিভোর্স চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। তারপর থেকেই নানা রকম সব ঘটছে।

কাজল বলল, ছবিগুলো কি সব নষ্ট করে ফেলেছেন?

উনি বলেছিলেন, আমি store room-এ রেখে দিয়েছি।

সনৎ চলে যাচ্ছিল আবার ফিরে এলো, একটা কথা বলছি দিদি, কাউকে বলবেন না।

কাল রাতে বাবু কাকে যেন ফোন করছিলেন। আমি পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনেছি—, এই বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। তারপর আকাশকে নিয়ে বিদেশে চলে যাবেন। এদেশে আর কখনো ফিরবেন না। কেন সব কিছু এমন হয়ে গেল বলুন তো?

সনতের এ প্রশ্নের উত্তর কাজলের জানা নেই।

কাজল কেন, বোধহয় লক্ষ্মী-অর্জুন কারুরই জানা নেই। একবুক অচেনা ব্যথার মধ্যে হঠাৎ কাজলের গায়ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল।

গায়ত্রী জাদু জানে না, তাও সে দুজনকে মিলিয়ে দেবার কথা ভেবেছে। কি দুঃসাহস মেয়েটার! আহ, তোর ইচ্ছেটা যেন সত্যি হয়ে যায় গায়ত্রী—। মনে মনে মন্ত্রের মতন করে উচ্চারণ করল সে। আমি, আমি এ সব কি ভাবছি—?

হাঁটতে হাঁটতে তেজপাতা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল কাজল। নিজের মনের দিকে তাকাতে সত্যিই তার ভয় করছিল এখন।

এই চারটে দিনের পরবাস কখন নিঃশব্দে কাজলকে একটা অসম্ভব স্বপ্নের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু হারানোর দুঃখ নয়, যা কখনো তার ছিল না তেমনিই এক চাওয়ার পেছনে দৌড়ানোর এক সর্বগ্রাসী নেশা কাজলের সবকিছু তার অজান্তেই গ্রাস করে বসে আছে।

একটা শব্দে চমকে মুখ তুলে কাজল দেখতে পেল অর্জুনের গাড়িখানা ঢুকছে।

সামান্য পরে গাড়ি থেকে নামতে নামতে সে চেঁচিয়ে ডাকলো, সনৎ—সনৎ—

সনৎ দৌড়ে এলো।

যা বলেছিলাম হয়েছে?

হ্যাঁ—

তবু যাও। দেখে এসো কোথাও আর মেমসাহেবের ছবি আছে কিনা, থাকলে খুলে ফেলবে।

সনৎ চলে গেল।

অর্জুন আবার গলা তুলে ডেকে উঠলো, আকাশ come here my son.

আকাশ সামনে এসে দাঁড়াল।

ব্রেকফাস্ট খেয়েছ?

না।

কেন খাওনি?

আন্টিও খায়নি।

Oh, you'll make me mad, go and take your break fast.

খেতে ইচ্ছে করছে না আমার।

সব কিছুতেই দেখছি তোমার ইচ্ছেগুলো আমার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না। ঠিক আছে, যাও।

আকাশ দাঁড়িয়েই থাকলো।

রাতে ডিনার টেবিলে বসে কাজলের মনে হলো সকালের গুমোট আবহাওয়াটা কেটে গেছে। অন্য সময়ের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে অর্জুনকে।

খেতে খেতে অর্জুন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, অনুরাধা, প্রথম যেদিন আপনি এখানে এলেন সেদিন কি যেন বলবেন বলেছিলেন আমাকে? কি বলবেন বলুন শুনি। please বলবেন না যেন, আপনার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

এক মুহূর্তের মধ্যে কাজল মনে মনে ভেবে নিল, সেদিন সে যা বলতে চেয়েছিল আজ আর তার প্রয়োজন আছে কি না।

মুখ তুলতে গিয়ে দেখলো আকাশ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কাজল মুখ

নামিয়ে খুব আস্তে করে বলল, আমার নাম অনুরাধা নয়, কাজল।

এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে কাজল আবার বলল, আমি আপনার আত্মীয়ের পাঠানো গভর্ণেসও নই।

অর্জুন একমনে তার কথা শুনছে।

কাজল হাতের চামচ দিয়ে ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, এসব কথাই আমি আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম।

আর কিছু?

হ্যাঁ। আমরা তিনবন্ধু কলেজের হোস্টেল থেকে পালিয়ে এসেছিলাম জীবনকে কাছ থেকে দেখবো বলে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমাদের পালানোটা একটা নতুন খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

আর দুজন বন্ধু কোথায়?

তারা দুটো বাড়িতে আছে। এখানেই।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা নেই। একমনে খাচ্ছে অর্জুন।

আকাশ এখনো তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

খাওয়া থামিয়ে অর্জুন বলল, কাজল—

বলুন।

আবার আর এক জায়গায় পালাবেন?

কোথায়?

অনেকদূরে—। অনেক দূরে, ধরুন, দেশের বাইরে।

কাজল কোনো উত্তর দিল না।

ভয় করছে? অর্জুন জানতে চাইল।

না, না, কাজল মাথা নাড়লো। কিন্তু আমার কলেজ—

অর্জুন বলল, আজকে কথাবার্তা সব final হয়ে গেল। এ বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছি—

সে কি, বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন?

শুধু শুধু রেখে লাভ কি বলুন, যখন থাকবোই না এখানে। কাল লক্ষ্মীর উকিলের চিঠি পেয়েছি। ওকে ডিভোর্স দিয়ে দেব। আপনার পাসপোর্ট আছে?

পাসপোর্ট?

নেই। ঠিক আছে আমার ট্রাভেল এজেন্টকে বলে দেব, তাড়াতাড়ি করে দেবে। কথার পর হাসলো অর্জুন, আপনার চাকরিটা কিন্তু এখনো আছে। আর কলেজের কথা কি যেন বলছিলেন, ওদেশের কলেজগুলো এখানকার চেয়ে খারাপ নয়।

কাজল কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অর্জুন বলল, শুধু ব্যবসাগুলো দেখার জন্যে বছরে এক দুবার আসতে হবে আমাকে। দেশের জন্যে মন কেমন করলে আপনিও চলে আসবেন আমার সঙ্গে।

খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো অর্জুন।

হাত ধুতে ধুতে বলল, ভীমও আমাদের সঙ্গে যাবে।

কোথায় যাবো আমরা?

কাজল প্রশ্নটা করবে না ভেবেও করে ফেলল।

অর্জুন বলল, লন্ডন, নিউজার্সি, জার্কাতা—তিন জায়গাতেই আমার অফিস আছে। তিন জায়গাতেই ই-মেল পাঠিয়ে দিয়েছি। অফিসের কাছাকাছি এ্যাপার্টমেন্টও আছে। গিয়ে ওঠার কোনো অসুবিধে হবে না।

রাতে নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় শোবার পর অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো কাজল। কেন কাঁদলো তা সে নিজেও জানে না।

(৩৭)

পরদিন সকাল বারোটার কাছাকাছি।

হর্ষবর্দ্ধন লালবাজারে নিজের চেম্বারে বসে আছেন। তাঁর সারা মুখ জুড়ে উত্তেজনা আর রাগ থমথম করছে। টেবিলের উল্টোদিকের দুটো চেয়ারে যে দুজন বসে আছে তারা শহরের দুখানা বিখ্যাত ইংরিজি ও বাংলা কাগজের রিপোর্টার। একজনের নাম তড়িৎ সান্যাল অপরজনের নাম রায় প্রশান্ত রায়। টেবিলের ওপর একখানা খাম এবং কয়েকখানা রঙিন ছবি পড়ে আছে।

রিপোর্টার সান্যাল বলল, তাহলে সোম সাহেব খবরটা আপনি অস্বীকার করছেন?

হর্ষবর্দ্ধন বললেন, আমি স্বীকার অস্বীকার কিছুই করিনি।

কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি মেয়েদের হোস্টেলের সুপার মিস মেনন আপনার কাছেই প্রথম তিনজন মেয়ে উধাও হবার অভিযোগ করেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধন বললেন, এসব খবর আপনারা কি করে জানলেন?

প্রশান্ত রায় বললেন, যেমন করে জেনেছি মেয়ে তিনটে সল্টলেকে সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ আপনার ডিপার্টমেন্ট তাদের খুঁজেই পাচ্ছে না।

হর্ষবর্দ্ধন নড়ে চড়ে বসলেন। তারপর ছবিগুলো টেবিল থেকে কুড়িয়ে নিলেন। প্রথম ছবিখানা ছাড়াও পর পর তিনখানা ছবি আন্নু কাজল আর গায়ত্রীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়ার বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি।

অন্য ছবিগুলো পার্কের ভেতরে তাদের দাঁড়ানো, বসা, গল্প করার ছবি।

টেবিলের ওপর ছবিগুলো আবার ফেলে দিয়ে সোম বললেন, আমার মনে হচ্ছে না, এই মেয়েগুলোই হোস্টেল থেকে পালানো মেয়ে।

তড়িৎ সান্যাল কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গে বলল, সোম সাহেব, আপনি কি জানেন মেয়ে তিনজন ভীষণ বদমাস দুটো লোকের পাল্লায় পড়েছে?

কি রকম?

তাদের একজন ফুচকাওলা। অবশ্য ফুচকাওলার ভেক ধরেও থাকতে পারে। Another person is a prevert. সে উঠতি বয়সের মেয়ে পেলেই তাদের সঙ্গে নিয়ে হনিমুন করতে যায়।

সোম সাহেব কি বলবেন ভেবে পেলেন না। শুধু একবার মুখ ঘুরিয়ে পেছনের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিখানা দেখে নিলেন।

রায় বলল, আজ বিকেলে আমাদের কাগজের তরফে আমি এ্যাসেমব্লিতে চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে মিট করছি—। আপনি স্যার বুঝতেই পারছেন কাল সকাল সবকটা কাগজে এটাই হবে আট কালাম ব্যানারের হেডলাইন।

তাদের কথার মধ্যে সন্দীপ ঘরে ঢুকে বলল, আট কালাম বারো কলম যা ইচ্ছে হেডলাইন আপনারা দিতে পারেন। কিন্তু পরদিনই আপনাদের ভুল খবর ছাপার জন্যে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ মেয়েগুলো কেউই পালায়নি।

সান্যাল উত্তেজিত গলায় বলল, পালায়নি মানে, আমরা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের ইন্টারভিউ নিয়েছি। হোস্টেলের অন্য মেয়েদের সঙ্গেও কথা বলেছি। It is a confirmed news. মেয়ে তিনজন পালিয়েছে।

সন্দীপ হেঁট হয়ে টেবিল থেকে আন্নুর একখানা ছবি তুলে নিল। বলল, এই মেয়েটির নাম অনুরাধা। এ এখন সল্টলেকে তার মাসির বাড়িতে আছে। তার ঠিকানা হচ্ছে—

প্রশান্ত ও তড়িৎ সান্যাল একসঙ্গে বলে উঠলো, আপনি সিওর এই মেয়েটা তার মাসির বাড়িতে আছে?

সন্দীপ বলল, হ্যাঁ সিওর, কারণ আমিই তার মাসতুতো দাদা।

হর্ষবর্দ্ধন টেবিলের ওপর একটা চাপড় মেরে বললেন, থ্যাংকু মাই বয়।

তার কথা শেষ হতে না হতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ঢুকলেন কংসাবতী মেনন। তাঁর হাতে গোটা কতক বড় বড় প্যাকেট—।

কি ব্যাপার মিস মেনন? হর্ষবর্দ্ধন চোখের ইশারায় কিছু বলার চেষ্টা করতে গিয়ে রায়ের চোখে ধরা পড়ে গেলেন।

কংসাবতী বললেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে মিঃ সোম।

প্রাইভেট কথা, কি ব্যাপার বলুন তো?

না না, সে কথা পাবলিকের সামনে বলা যাবে না।

সোম বললেন, ওরা কাগজের রিপোর্টার।

রিপোর্টার, কংসাবতী বসে পড়লেন, তাহলে তো কথাটা আগে আপনাদেরই বলা দরকার।

প্রশান্ত রায় নোটবুক বার করল—কি কথা বলুন তো? তার আগে বলুন আপনি কে?

আমাকে চেনেন না আপনারা?

কংসাবতী আহত হলেন, তাহলে শুধু শুধু আপনাদের সামনে বক্‌বক্ করছি কেন। Please get lost. সোম সাহেব এদের যেতে বলুন না এখন। রিপোর্টার দুজনাই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। হর্ষবর্দ্ধন বললেন, তাহলে কালকের কাগজের হেডলাইন?

তড়িৎ সান্যাল বলল, ভয়াবহ বন্যার প্রকোপে পঞ্চাশ হাজার মানুষ গৃহহারা—

আর আপনাদের চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে ইন্টারভিউ?

আছে, দারুণ একটা সাবজেক্ট আছে, প্রশান্ত রায় হেসে বলল, ফুলন দেবীর হত্যাকান্ড।

ওটা তো সেন্ট্রালের ব্যাপার?

সেই জন্যেই তো ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সি.এম. কি ভাবছেন তা জনগণকে জানানো দরকার।

হাতের প্যাকেটগুলো টেবিলের ওপর রেখে কংসাবতী দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এরই মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের টেবিলে রাখা তিনটে ফোনের মধ্যে একটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো। তিনি ফোন তুললেন—হ্যালো—সোম স্পিকিং—মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের ব্যাপার। রিসিভার নামিয়ে রেখে রিপোর্টার দুজনের দিকে মুখ তুললেন সোম, ঝটপট লিখে নিন। শহরের একজন নামকরা জুতো ব্যবসায়ীকে একটু আগে অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণের সময় গুলি টুলিও চলেছে। ডিটেল খবর এক ঘন্টা পরে ফোন করে জেনে নেবেন। গুড বাই।

রিপোর্টার দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর কংসাবতী কাতর গলায় নিবেদন করলেন, মিঃ সোম, ভয়ংকর একটা কান্ড ঘটেছে, আপনি জানেন কি?

জানি — হর্ষবর্দ্দন মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আপনি আজ বিয়ে করছেন।

ইনক্রেডিবল্—মিস মেনন্ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কি করে বললেন, আমি একমাত্র সৌম্য ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে বলিনি এখনো।

সোম বললেন, সব কিছুই জানি আমি। যা যা ঘটেছে কাল থেকে এবং আপনি যা যা করতে যাচ্ছেন। ওই মেয়েরা ফোন করে আপনাকে জানিয়েছে ওদের ঘরে ফেরার শর্ত হচ্ছে আপনাকে এক্ষুনি বিয়ে করতে হবে।

ঠিক, ঠিক বলেছেন—

কংসাবতী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।

সোম বললেন, ওদের শর্তে আপনি রাজি না হলে মেয়ে তিনজনার লাশ রিসিভ করতে হবে আপনাকে—

Oh God!

মিস মেনন্, সোম চেয়ারে পিঠ ঠেকালেন, আপনার ভালোর জন্যেই, আপনার ফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বুঝেছেন। One more thing, আমার মত হচ্ছে আপনার এখনই ওদের কাছে surrender করা ঠিক হবে না। মানে আমি আপনার বিয়ের ব্যাপারটা বলছি—

মিস মেনন হতাশ গলায় বললেন, কি বলছেন স্যার আপনি, আমি যে মার্কেটিং সব কমপ্লিট করে ফেলেছি। তাজবেঙ্গলে রিসেপশানের জন্যে জায়গা বুক করা, এ্যাডভানস দেওয়া সব কমপ্লিট!

শুনুন, শুনুন কংসাবতী দেবী, সোম এবার রীতিমত সিরিয়াস, আপনি ব্যাপারটা যতো সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। Who is that ফুচকাওলা and honeymoon maniach তা আগে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। বুঝেছেন?

কংসাবতী হতাশ এবং নির্বাক। চুপ করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

হর্ষবর্দ্ধন এবার সন্দীপের দিকে ফিরলেন, yes সন্দীপ, তোমার যে মাসি নেই তা আমি জানি। তাই তোমার মাসতুতো ভাই হবার প্রশ্নই ওঠে না। ওই রিপোর্টার দুজনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তুমি যে মাসতুতো ভাইয়ে গল্পটা বানিয়েছ তাও আমি জানি। কিন্তু আমি শুধু একটা কথা বুঝতে পারছি না how these fellows got these pictures. ছবিগুলো নিশ্চয় অন্য কোনো মেয়ের নয়?

কংসাবতী মুখ তুললেন, ছবিগুলো আমি একবার দেখতে পারি?

No, সোম ভুরু কুঁচকে তাকালেন, আপনি এসব ইন্টারন্যাল ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামালে result কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারে। Please আপনি দু'ঘন্টা পরে ফোন করবেন আমাকে। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ঘর ছাড়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন কংসাবতী। বাইরে যাবার আগে টেবিল থেকে প্যাকেটগুলো তুলে নিলেন।

তারপর আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলন।

সামান্য সময় ঘরে স্তব্ধ নীরবতা।

এ.সি. মেশিন চলার শব্দকে মৌমাছির আহার অন্বেষণের শব্দ বলে মনে হয়।

একটা কাগজের পাতা সন্দীপের দিকে ঠেলে দিলেন সোম।

গম্ভীর গলায় বললেন, look.

নীরবে কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়ার পর আবার নামিয়ে রাখলো সন্দীপ।

হর্ষবর্দ্ধন সোম ওপরওলার কাছে সন্দীপের ডিমোশনের জন্যে নোট দিয়েছেন।

কিছু বলবে?

সন্দীপ মাথা নাড়লো no sir.

সোম বলল, আমি খবর পেয়েছি তুমি এই দলের অন্ততঃ একটা মেয়ের সঙ্গে আইসক্রিম পার্লারে আইসক্রিম খেতে গিয়েছিলে। তাছাড়া একদিন পার্কে এবং আর একদিন স্কুটারে তাকে নিয়ে জয় রাইডে গিয়েছিল। I am sorry, তোমার মতন একজন সিনসিয়ার অফিসারের কাছে এটা আমি আশা করিনি। And I have done my duty. You may go now.

সন্দীপ একটা কথাও বলল না।

স্যালুট করে বাইরে বেরিয়ে এলো।

(৩৮)

হেমলতা বারান্দায় বসে দেখলেন সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ঝড় এগিয়ে আসছে পাগলের বেগে। কাছাকাছি আসার পর ঝড়টা একটা জিপগাড়ি হয়ে গেল। আবও একটু পরে গাড়িটা নিচের রাস্তায় দাঁড়ানোর পর তা থেকে নেমে এলো সন্দীপ। একা।

হেমলতার কেন যেন মনে হলো—তাঁর ভাবনার ঝড়টাকে দু'টো অস্থির চঞ্চল চোখের মণিতে তুলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে তারই পুলিশ অফিসার পুত্র।

মা—

সিঁড়িতে একবার মাত্র ডাকলো সন্দীপ। তাও খুব জোরে নয়। তবু হেমলতা চমকে উঠলেন। তাঁর কেন যেন মনে হলো ভয়ংকর রাগে দিশেহারা হয়ে আছে সে। কেন তার রাগ, কার ওপর রাগ কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি।

সে কোথায়?

কার কথা সে বলছে তা বুঝতে মুহূর্ত সময়ও লাগলো না। আটপৌরে গলায় বললেন, আমার ঘরে। এইতো এতক্ষণ বক্ বক্ করছিল। এখন বোধহয় ঘুমোচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো সন্দীপ, ঘরে কেউ নেই—

ঘরে নেই মানে বারান্দা, অন্য ঘর, খাবার ঘর, বাথরুম, ছাদের সিঁড়ি, ছাদ কোথাও নেই—

ও কি তাহলে উড়ে গেল?

আহ, তুই এত রাগ করছিস কেন....? রোজ এই সময় ওর একবার আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করে,—বোধহয় নিজেকে সামলাতে না পেরে—

টেবিলে একটা কিল বসিয়ে দিল সন্দীপ।

আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করে, ফুচকা খেতে ইচ্ছে করে—তুমি কি জানো এই সব খেতে খেতে ও আমাদেরও খেয়ে ফেলবে?

ছিঃ, কি বলছিস তুই—

যা সত্যি তাই বলছি— টকটকে লাল চোখদুটো থেকে আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আবার জিপে উঠে পড়লো সন্দীপ।

হেমলতা আবার বারান্দায় ফিরে আসতে আসতে জিপখানা অদৃশ্য।

স্বরাজ নিঃশব্দে নিজের ঘর থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন।

বাইরে এসে বললেন, কি হয়েছে বলতো?

জানি না।

এই নাও, এটা পড়ে দেখো।

কি এটা?

আন্নুর বাবাকে একটা চিঠি লিখছি।

চিঠি পনেরো দিনেও পৌঁছবে না। তার চেয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। ঠিকানা পেয়েছ?

স্বরাজ হাসলেন, হ্যাঁ কায়দা করে চেয়ে নিয়েছি। তুমি ঠিকই বলেছ, কবে আবার চলে যাবে হয়তো। তার আগেই—

তার চলে যাবার সম্ভাবনার কথাটা শুনেই হেমলতার মন খারাপ হয়ে গেল।

বললেন, তোমাকে বলেছে নাকি কিছু—?

না তো বলেনি, তবে ও তো যাবেই একদিন। হারানো ভাইকে খুঁজে দেবার দোহাই দিয়ে ওকে কতোদিন আর আটকে রাখা যাবে।

হঠাৎ হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে যায় বলতো মেয়েটা? আমার ভীষণ ভয় করে। মনে হয় আর বুঝি ফিরবে না।

স্বরাজ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বোধহয় নিজেই ভাইকে খুঁজতে যায়।

কাল রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে ছটফট করছিল। দুবার সন্দীপের নাম করে কি

যেন বলল। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার পর ঘুমলো।

স্বরাজ ম্লান হয়ে বললেন, তুমি কেন এমন বলতো?

হেমলতা বললেন, আমি কিরকম? তুমি, তুমি ওকে ভালবাসো না? দু মিনিট না দেখলে তুমি ব্যস্ত হও কেন? ওকে ছেলের বৌ করার কথা কে আগে ভেবেছিল, আমি?

স্বরাজ হেরে যাবার মতো করে বললেন, হ্যাঁ সব দোষ আমার। কি করবো বলো, মুখখানা দেখলে বড্ড মায়া হয়। আমাদের নিজের একটা মেয়ে থাকলে বোধহয় এরকম করে—

তাদের কথার মধ্যে ঘরে ঢুকলো আন্নু। বলল, আমি চলে যাচ্ছি। আমার ভাইকে আমি নিজেই খুঁজে নেব।

হেমলতা আর স্বরাজ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। একটি কথাও বলতে পারলেন না।

ঘরে ঢুকে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে এলো সে।

হাতে প্রথমদিন সঙ্গে নিয়ে আসা ছোট ব্যাগটা। দু' চোখে দু' বিন্দু জল টলমল করছে।

এক্ষুনি চলে যাবি? একটু কিছু না খেয়েই যাবি?

হেমলতা তার হাত ধরলেন।

স্বরাজ বললেন, কোথায় যাচ্ছিস এখন?

তোমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করো, সে সব জানে।

হেঁট হয়ে প্রণাম করলো আন্নু।

আবার কবে আসবি? থুতনি ধরে চুমু খেলেন হেমলতা।

কেন আসবো তোমাদের বাড়ি, আন্নু ওড়নাটা গলায় পাকাতে পাকাতে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল, আর কক্ষনো আসবো না—।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একবারও পেছনে তাকালো না আন্নু। তাকালে দেখতে পেত দুটি পাথরের মানুষের মতো হেমলতা আর স্বরাজ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন।

জিপখানা সোজা কাজলের বাড়ির সামনে গিয়ে তবে থামলো।

সন্দীপ বললো, go and call your friend.

ও যদি না আসতে চায়?

সন্দীপ কঠিন স্বরে বলল, না আসতে চাইলে আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে, I'll arrest her.

এই মুহূর্তে সন্দীপকে অবিকল পুলিশ পুলিশ লাগলেও আন্নুর কেন যেন

মনে হচ্ছিল সব কিছু সে যা করছে তা কেবল তাদের ভয় দেখানোর জন্যে।

"পাখির বাসা" এখন ফাঁকা। কাউকে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। তবুও ভেতরের দিকে পা বাড়ালো আন্নু। এ বাড়িতে মাত্র দুবার এসেছে সে কাজলের সঙ্গে।

কাজল তাকে তেজপাতা গাছ চিনিয়েছে। কাচের মেঝেওলা বাথরুম দেখিয়েছে। রুপোর কাপে চা খাইয়েছে।

আসলে তাদের তিনজনার মধ্যে কাজলই ভাগ্যের জোরে সবচেয়ে ভালো জায়গা পেয়ে গিয়েছে। শুধু থাকার আশ্রয়ই নয়, সঙ্গে মাসে পাঁচহাজার টাকা মাইনের গভর্ণেসের চাকরিও।

একি, তুই এখানে, কখন এলি?

গায়ত্রী বলল, আয় আয়, আমরা তোর কাছেই যাবার প্ল্যান করছিলাম।

আন্নু বলল, সন্দীপ ডাকছে তোদের।

কোথায় সন্দীপদা, কাজল বলল, এখানে ডেকে আন শিগগির।

গায়ত্রী বলল, he is God sent.....আমরা সন্দীপদাকেও আমাদের সঙ্গে চাই। তুই থাক আন্নু, আমি ডেকে আনছি সন্দীপদাকে—।

গায়ত্রী যাবার পর কাজলের দিকে দৃষ্টি ফেরালো আন্নু, কি ব্যাপার রে?

পরে শুনিস।

আমি কিন্তু আজই হোস্টেলে ফিরে যাবো।

কাজল বলল, আমরা সবাই যাবো কিন্তু আজ নয় দুদিন পর।

বারে। আমি তো ও বাড়ি থেকে একবার চলে এসেছি, সেখানে আর যাবো কি করে?

এখানে থাকবি।

ভাগ, কাজলের প্রস্তাবটা এক কথায় উড়িয়ে দিল আন্নু। তোর এখানে যা সব কান্ড, না বাবা আমি রুপোর থালায় করে ভাত খেতে পারবো না। হজমই হবে না।

রূপোর থালায় এখানে কেউ ভাত খায় না আন্নু। বোন চায়নার প্লেটে করে খায়। অবশ্য ওগুলোর দাম বোধহয় রুপোর থালার চেয়েও বেশি।

একটু পরে সন্দীপ ঘরে ঢুকে বলল, আমার নাম সন্দীপ। আপনাদের বন্ধু আমারও বন্ধু।

কাজল বলল—আপনি কি আমাদের এ্যারেস্ট করতে এসেছেন?

অনেকটা তাই। কারণ আপনাদের আজকের মধ্যে লালবাজারে আমার বসের কাছে হাজির না করতে পারলে আমার চাকরিতে ডিমোশন হবার চান্স আছে।

গায়ত্রী বলল, চলুন আমরা আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

তিনজনই যাবেন?

হ্যাঁ—।

ওরে বাবা।· একজনকে অন্ততঃ রেখে না গেলে আমার বাড়িতে ঢোকা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। সন্দীপ বলল, আচ্ছা আপনাদের এখনাকার ছবিগুলো কে তুলেছে বলুন তো?

কোন্ ছবি?

আপনাদের পার্কে বেড়ানোর ছবি, ফুচকা খাওয়ার ছবি, একসঙ্গে এখানকার রাস্তায় হাঁটার ছবি। ছবিগুলো এখন আমার বসের টেবিলে পড়ে আছে।

গায়ত্রী বলল, দুদিন আগে পার্কের সামনে একটা সিরিয়ালের সুটিং হচ্ছিল। ঐ পার্টির একজন লোক এসে বলল, দিদি আমাদের ভিড়ের সিনের জন্যে আপনাদের দু' একটা ছবি নেব।

আপনারা অমনি রাজি হয়ে গেলেন?

বারে, আমাদের লোকটা বলল যে, ছবির নায়ক নায়িকাদের সঙ্গেই আমাদের দেখা যাবে। এখন আলাদা আলাদা ছবি নিলেও পরে এডিটিং-এর সময় পাশাপাশি জুড়ে দেওয়া হবে।

কাজলের কথা শেষ হবার পর সন্দীপ বলল, strange, আপনারা একবারও ভাবলেন না যে আপনারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আর পুলিশ আপনাদের খুঁজছে!

আন্নু বলল, আমি কিন্তু ছবি তুলতে রাজি হইনি।

শেষ অবধি ওরা বলল বলে—

পাখির বাসা এখন ফাঁকা। ওদিকে কোথাও সনৎ আর ভীম আছে। তাদের দেখা যাচ্ছে না।

অর্জুন দুদিন থেকে ভীষণ ব্যস্ত। তাকে দেখলেই বোঝা যায় একটা কিছু ভেতরে ভেতরে তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে ফোন মুখে করে বসে থাকে। আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় শুধু তাকে বলেছিল— আপনার পাসপোর্ট রেডি। শুধু এখান থেকে চলে যাবার আগে একদিন আপনার বাড়ি থেকে সবাই মিলে ঘুরে আসবো আমরা। আপনি এতদূর চলে যাবেন, আপনার বাবা মার পারমিশান নেওয়া উচিত।

তারপর থেকে ভেতরে ভেতরে একটা দুর্বোধ্য উত্তেজনা কাজলকে মাতাল করে রেখেছে। ঠিক ভালোলাগা না হলেও খারাপও লাগছে না তার।

যখনই এই নিয়ে ভেবেছে তখনই তার মন বলেছে, দেখাই যাক্ না একবার জীবনের সঙ্গে বাজি ফেলে। জীবনে বাঁচার অন্য রকম দিকটা এতকাল তার

অজানাই ছিল। পাখির বাসায় হঠাৎ এসে না পড়লে তার জানাই হতো না ভাগ্য কতো শক্তিশালী।

সন্দীপ বলল, তাহলে চলুন।

গায়ত্রী বলল, কোথায় যাবো এখন আমরা, হোস্টেলে না লালবাজারে?

না, আমি আপনাদের হোস্টেলেই পৌঁছে দেব।

গায়ত্রী বলল, আর আমরা যদি না যাই?

একটু চুপ করে থেকে সন্দীপ বলল, তাহলে আপনাদের হোস্টেল সুপার মিস মেননকেই এখানে নিয়ে আসছি।

তার কথা শুনে ইলেকট্রিক তারে শক্ খাওয়ার মতো করে লাফিয়ে উঠলো তিনজন।

গায়ত্রী বলল, আর তিনদিন, ঠিক তিনদিন পরে আপনি যেখানে বলবেন আমরা চলে যাবো।

সন্দীপ বলল, তিনদিন পরে কেন?

বলছি বলছি, গায়ত্রী কাজলের দিকে তাকাল, কাজল তুই বল্।

কাজল বলল, আমরা আসলে চাইছি এ বাড়িতে লক্ষ্মী তার ছেলে আর বরের কাছে ফিরে আসুক, আর বীরুর সঙ্গে জয়তিরও মিটমাট হয় যাক—।

তার কথা শুনে অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকালো সন্দীপ, লক্ষ্মীকে, আর জয়তিই বা কে?

Please একটু বসুন। গায়ত্রী বলল, সব সব বলছি আপনাকে।

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনে পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালো কাজল, কি হলো সনৎবাবু?

সনতের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। বলল, আমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে দিদি—

জানি।

জানেন?

হ্যাঁ, তিনি আমার কাছেই এসেছেন। আমার সম্পর্কে দাদা হন।

ওহো তাই বলুন।

ভীম কোথায় সনৎবাবু?

পাঠিয়ে দিচ্ছি আর বলে দিচ্ছি চা দিতে। সনৎ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পর পাখির বাসা থেকে বেরিয়ে তার জিপে ওঠার সময় সন্দীপের কাছে ভুলটা ধরা পড়লো।

আবার ফিরে এলো সে—। আন্নুকে লক্ষ্য করে বলল, এই যে ম্যাডাম, এখনো বসে আছেন কেন, চলে আসুন।

আমি— মানে কোথায়—

মুখখানা কাঁচুমাচু করে সন্দীপ বলল, মার কাছে কানমলা খাওয়াবেন এই বুড়ো বয়সে—

মুখ ভার করে আন্নু বলল, তখন আপনি আমার সঙ্গে খুব বিচ্ছিরি ভাবে কথা বলেছেন।

কী রকম বিচ্ছিরি ভাবে?

ঠিক পুলিশ যেমন করে কথা বলে,—

সরি—

তার হাত ধরে টেনে তুলল সন্দীপ। বলল, সরি, সরি, সরি। চলো এবার থেকে উত্তমকুমারের মতন করে কথা বলবো।

দু'জন ঘর থেকে যেতে যেতে দাঁড়াল। সন্দীপ গায়ত্রীকে বলল, আমি আজই লক্ষ্মীর উকিলের বাড়ি যাচ্ছি। কি হয় জানিয়ে দেব।

জিপখানা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কেন যেন কাজলের হঠাৎ মনে হলো— খুব একটা বোকামি করে ফেলল সে। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা তার করা উচিৎ হয়নি।

(৩৯)

রাত্তিরে বাড়ি ফিরে অর্জুন অবাক।

বাড়ির সব ঘরের দেয়ালে, বারান্দায়, খাবার ঘরে লক্ষ্মীর ফটোগুলো আবার আগের মতো করেই ফ্রেমের মধ্যে থেকে তাকিয়ে আছে।

সনৎ......সনৎ....

অর্জুনের গলা থেকে ছিটকে আসা বিরক্তি আর রাগ মুহূর্তের মধ্যে বাতাসে ধাক্কা খেয়ে ভেজানো দরজায় ওপাশে কাজলকে চমকে দিয়ে গেল।

এই যে সনৎ, who did this? এসব কে করেছে আমি জানতে চাই—

সনৎ কি জবাব দেবে তা কাজল জানে। তবুও মাথার তলা থেকে বালিশ টেনে নিয়ে কানে চাপা দিল সে।

সামান্য পরে তার দরজায় টোকার শব্দ শুনে উঠে এল কাজল।

দরজা খুলে দেখলো সে যা ভেবেছিল তাই, অর্জুন দাঁড়িয়ে। তাকে কেমন যেন বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল।

অর্জুন বলল, সরি, এত রাতে আপনার ঘুম ভাঙাতে হলো।

কাজল তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারিনি ফটোগুলো লাগালে আপনি এত রাগ করবেন।

আমি সারাজীবন ধরে ডিসিপ্লিনকেই স্ট্রিক্টলি মেনে এসেছি। দরজার দুপাশে দুহাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে অর্জুন। তার নিঃশ্বাস এসে কাজলের মুখে পড়ছে।

বিছানা থেকে উঠে আসার আগে শাড়িটা ঠিক মতো গুছিয়ে নেবার সময় পায়নি তার শরীরটা যৌবনের ধারালো রেখায় স্পষ্ট এবং দৃষ্টিনন্দন হয়ে আছে এখন।

অর্জুন বলল, ডিসিপ্লিন ভাঙার জন্যে আমি নিজেকেও অনেকবার শাস্তি দিয়েছে—yes, লক্ষ্মী এ বাড়ি থেকে চলে যাবার কারণও তাই—একটা হঠাৎ ওঠা হাওয়া বাগানে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার এলোমেলো চলার ছন্দে তেজপাতা গাছের শরীরে ভয়ের কাঁপন লেগেছে। কাজল বুঝতে পারলো সেই কাঁপনটা এখন তার পা বেয়ে উঠে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে—একই সঙ্গে ভয়ংকর একটা খেলার নেশা তার মনের কাছে দুর্বহ একটা চ্যালেঞ্জকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

মনে মনে কাজল কাকে বলল তা সে নিজেও জানে না—তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে অর্জুন, যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে ফেরা ক্লান্ত সৈনিকের মতন দেখালেও কোথাও হেরে যাবার চিহ্ন নেই। আমাকে ভালবাসো অর্জুন। ভালোবেসে আমাকে গ্রহণ করে তৃপ্ত হও অর্জুন।

হঠাৎ ওঠা বাতাসটা আবার হঠাৎই থেমে গেল।

কাজল বলল, ফটোগুলো আমি কাল সকালেই আবার নামিয়ে দেব—

থাক, তার আর দরকার হবে না, দরজা ছেড়ে অর্জুন টান টান হয়ে দাঁড়াল। বলল, ওগুলো থাকা আর না থাকার একই মানে। Yes, those all are dead man's pictures, ওগুলো আর কোনদিন আগের মতো করে আমায় টানবে না।

অর্জুন চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

তার পিঠের দিকে তাকিয়ে কাজল তার ঝুলি থেকে বার করে শেষ তীরটা ছুঁড়লো— আমি কাল চলে যাবো—

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল অর্জুন—। মাথা ঝাঁকিয়ে আদেশের সুরে বলল, না আপনি কোথাও যাবেন না—

অর্জুনের একটা হাত কাজলের কাঁধের ওপর এসে আস্তে করে আশ্রয় নিল। হাতখানা তার চিবুক ছুঁয়ে গালে উঠে এলো। এবং চোখের কোল অবধি নেমে আসা অশ্রুবিন্দুকে মুছে নেবার পর এক মুহূর্ত থমকে থাকলো।

অর্জুনের চোখের দৃষ্টিতে কি হেরে যাওয়া উঠে আসছে না কাজলের দেখার ভুল?

Please তুমি হেরে যেওনা, কক্ষনো হেরে যেওনা অর্জুন। তুমি হেরে গেলে এই একুশ বছরের মেয়েটাও নিজের বিশ্বাসের কাছে হেরে যাবে। মনে মনে ভাবলো কাজল।

মুখে বলল, ঠিক আছে আমি যাবো না—

অনেক রাত্তির হয়েছে। আপনি যান শুয়ে পড়ুন।

অর্জুন চলে যাচ্ছে।

মাথা উঁচু করে হাঁটছে।.

কাজল জানে এখন আর সে পেছনে তাকাবে না। অর্জুনরা পেছনে তাকায় না বলেই তাদের এতো ভালো লাগে কাজলদের।

(৪০)

বিকেলের অনেক আগেই সন্দীপের ফোন এলো।

ফোনের রিসিভার তুলে গায়ত্রী প্রশ্ন করলো, রাজি হয়েছে?

হ্যাঁ। লোকটা এক নম্বরের লোভী।

টাকা চেয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ। আমি দেব বলেছি।

কতো টাকা?

সে তোমাকে বলবো না। পুলিশ সব কথা বলে দেয় না। হাসলো সন্দীপ, তোমার planটা মনে হচ্ছে successful হয়ে যাবে।

আপনি না থাকলে কিছুই হতো না।

আমার একটা কথা মনে হচ্ছে—সন্দীপ বলল।

কি কথা?

এখন নয়, পরে বলবো। শুধু তোমাকেই একলা বলবো। তুমি কিন্তু আর কাউকে বলতে পারবে না।

ঠিক আছে।

সন্দীপ টেলিফোনের লাইন কেটে দেবার আগে বলল, আমার বস্ সোম সাহেব খুব চিন্তিত একটা ব্যাপারে। ফুচকাওলা আর হনিমুন পাগলকে নিয়ে। ওনার ধারণা তোমার কোনো বাজে গ্রুপের খপ্পরে পড়ে গিয়েছ। আমি অবশ্য জানি এরকম কেউ নেই।

গায়ত্রী বলল, আছে, দুর্জনাই আছে।

সর্বনাশ, তাহলে তো দেখছি সোম সাহেব ঠিকই বলেছেন।

গায়ত্রী সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, বিয়ের চিঠি ছাপাতে দিয়েছেন?

দিয়েছি, আজ সন্ধ্যেবেলা পার্কে এলে দেখতে পাবে। কার্ড কিনতে গিয়ে মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম।

বিপদ?

হ্যাঁ, সোম সাহেব কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। কার্ডের দোকানে আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে সোজা দোকানের মধ্যে হাজির।

তারপর—?

আমি কিন্তু ভাঙিনি। উনিও আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করেননি।

থ্যাংস্ সন্দীপদা, মেনি থ্যাংস—

এই, ওরকম করে বারবার থ্যাংস্ ট্যাংস বললে আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নেই।

ঠিক আছে, আর বলবো না।

ফোন কেটে গেল।

(৪১)

আজ অনেকদিন পর অফিসে গিয়েছে বীরু। এর মধ্যেই দুবার ফোন করে জেনে নিয়েছে গায়ত্রীর একা বোরিং লাগছে কিনা।

আজ ঠিক সাতদিন হলো তারা হোস্টেল ছেড়ে এসেছে। এই সাতদিনে কে কি পেয়েছে তা জানে না গায়ত্রী। কিন্তু তার পাওয়ার ভান্ডার উপচে পড়ছে।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে অলকানন্দার কথাই বারবার কেন যেন তার মনে পড়ছে।

বীরু, বীরুর মা, অর্জুন, পাশের ফ্ল্যাটের ভাবী, এস.টি.ডি.-র দোকানের বাবলু, সকলের চেয়ে আলাদা অলকানন্দা। গায়ত্রী ঘুমের মধ্যে কাল তাকেই স্বপ্নে দেখেছে।

(৪২)

অফিসের ব্যস্ততার মধ্যেই হর্ষবর্দ্ধন তার পি.এস.কে বললেন, ওহে বাড়িতে আমার স্ত্রীকে একবার ফোনে ধরতো।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সে ফোনের রিসিভারটা সোম সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, স্যার, মিসেস সোম।

তারপর দু'জনের মধ্যে এই ভাবে কথাবার্তা হলো—

সোম সাহেব—শোনো আমি বলছি—

মিসেস সোম—শুনছি বলো।

সোম সাহেব—অত কাটখোট্টার মতন ফোন কর কেন। ফোন তুলেই—

মিসেস সোম—কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো। আমার কাজ আছে।

সোম সাহেব—কাজ (হা হা হা)—তোমার তো দুটো মাত্র কাজ, ঠাকুর ঘর আর টিভি।

মিসেস সোম—তোমার অফিসে বুঝি কোনো কাজ নেই আজ? (অল্প হেসে) তাই বৌকে ফোন করার কথা মনে পড়লো।

সোম সাহেব—না না সাংঘাতিক সব কাজ, গিজ গিজ করছে কাজ, এক্ষুনি সি.এম. এর ঘরে ছুটতে হবে, অর্ডার নিয়ে মিটিং—

মিসেস সোম—গেট টুগেদার—?

সোম সাহেব—কি বললে, কি বললে?

মিসেস সোম—ঠিকই তো বলেছি।

সোম সাহেব—(একটু চুপ করে থেকে) কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি, হ্যাঁ শোনো কি জন্যে যেন তোমায় ফোন করবো ভাবছিলাম—

মিসেস সোম—(শাড়ি তুলে মাথায় ঘোমটা দিলেন অভ্যাস বশতঃ তার খস্ খস্ শব্দ চুড়ির টুনটুন ঠুনঠুন ওপাশে ভেসে গেল) ঠিক আছে, কি বলবে তা মনে পড়লে আবার ফোন করো।

সোম সাহেব— এ্যাই না না দাঁড়াও, ফোন ছেড়ে দিও না—এক্ষুনি মনে পড়বে—(পাশে দাঁড়ানো পি.এস.কে) এই যে বাড়িতে কেন ফোন করতে চাইলাম জানো তুমি?

পি.এস. — (কান চুলকে) না স্যার, আমায় তো কিছু বলেন নি—

সোম সাহেব— (রেগে) আমার মিসেসকে কি ফোন করবো তা তোমায় বলতে হবে নাকি? অপদার্থ, useless. চব্বিশ ঘন্টা তো যা কথাবার্তা বলি সব হাঁ করে শোনো আর সেগুলো আই.জি.র পি.এস.এর কানে গিয়ে ঢেলে আসো—

মিসেস সোম— কি হলো গো, কারুর সঙ্গে ঝগড়া করছো নাকি?

সোম সাহেব— না, নাহ, — ঝগড়া আর তুমি ছাড়া কার সঙ্গে করবো বলো। মেয়ে দুটোও তো কোনদিন ঝগড়া করলো না। (নিঃশ্বাস ফেললেন) এই, বড় খুকির কোন চিঠি পেয়েছ নাকি—?

মিসেস সোম— (গম্ভীর গলায়)—না।

সোম সাহেব—আমাদের নিজস্ব বলে কিছুই থাকলো না বলো—(টেবিলে

দুটো ফোন একসঙ্গে বেজে উঠলো) দাঁড়াও, কার ফোন দেখে নিই। ইয়েস স্যার.....ইয়েস স্যার........হ্যাঁ মনে আছে। ফাইল রেডি (পি.এস.কে) কার ফোন ওটা—চোখের ইশারায়... বলে দাও busy আছি, পরে ফোন করতে — কই গো ফোন ছেড়ে দিলে নাকি?—

মিসেস সোম— না, বলো কি বলবে।

সোম সাহেব—দাঁড়াও দাঁড়াও মনে পড়েছে—থ্যাংক গড্ আজ বিকেলে পাঁচটা নাগাদ বিনোদ দত্তদের দোকানে চলে এসো, আমি অফিস থেকে বেরিয়ে পৌঁছে যাবো।

মিসেস সোম—তুমি আর আমায় জ্বালিও না বাপু। জীবনে কোনোদিন রাত নটার আগে অফিস থেকে বেরিয়েছ?

সোম সাহেব—আজ বেরোবো, ঠিক বেরোবো। তুমি কিন্তু থেকো।

মিসেস সোম— তা হঠাৎ সোনার দোকানে তোমার কি কাজ পড়লো? মেয়েদের জন্যে গহনা করবে নাকি? হ্যাঁগো, টাকা কোথায় পাবে? তুমি আজকাল এই বয়সে ঘুঁস-টুঁস খাচ্ছ নাকি? আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।

সোম সাহেব— আরে না না, আমার ডিপার্টমেন্টের এক ছোঁড়ার বিয়ে। না না এখনো বলেনি, বলবে...বলবে। কাল হঠাৎ দেখি কলেজ স্ট্রিটে কার্ডের দোকানে বিয়ের কার্ড কিনছে। কখন বলবে বলে বসে থাকলে শুধু হাতে যেতে হবে ... তাই আগে থেকেই একটা কিছু কিনে রাখছি—

মিসেস সোম — কার কথা বলছো তুমি—?

সোম সাহেব — সন্দীপ, তুমি তো চেনো তাকে। আমাদের বাড়িতে তো আসে টাসে...কাল ধরা পড়ে গিয়ে বাবুর কী লজ্জা—আরে বুঝলে, ওরাই তো আমাদের ছেলে গো, আড়ালে আবডালে যতই গালাগালি করুক, মরলে ওরাই ভিড় করে আসবে, শ্মশান টশানে নিয়ে যাবে। কাঁদবে...

মিসেস সোম— এসব কথা তোমায় বলতে হবে না, তুমিও আবার ভুলে যেও না— ছাড়ছি—

ফোন কেটে গেল—

মিসেস সোম দুহাত কপালে ঠেকিয়ে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন।

(৪৩)

পার্কের ঘাসের ওপর গম্ভীর মুখে বসে আছে আন্নু, কাজল আর গায়ত্রী। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হবার আয়োজন চতুর্দিকে।

আন্নু গুণ গুণ করে গাইছিল—

“বিদায় বেলায় একি হাসি ধরলি আগমনীর বাঁশি। যাবার সুরে আসার সুরে করলি একাকার গো। সবাই আপন পানে আমায় আবার কেন টানে” তার মুখ দু’ হাঁটুর ওপর নামানো।

গায়ত্রী রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। কাজল শুধু উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে থাকলো।

এরই মধ্যে একটা তীব্র আলোর রেখা আসন্ন রাত্রির আয়োজনকে এফোঁড় ওফোঁড় করে যাওয়ার পর সবাই বুঝতে পারলো সন্দীপ আসছে।

সন্দীপ নয়—তার মশামারা জীপ গাড়িও নয়। তার বদলে সেখানে এসে দাঁড়াল একটা সাদা রং এর পদ্মিনী। তার থেকে নেমে এলো লক্ষ্মী। সঙ্গে তার উকিল।

গ্যান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আন্নুর।

গায়ত্রী উঠে দাঁড়াল।

শুধু কাজল যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতেই থাকলো।

লক্ষ্মী তার দিকেই এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল—

এসবের মানে কি?

কাজল তাকিয়ে থাকলো। কোনো উত্তর দিল না।

এই বিয়ের চিঠি, বিয়ে....

কাজলের বদলে গায়ত্রী উত্তর দিল, এসব কথা অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন।

অর্জুনকে জিজ্ঞেস তো করবোই, তার আগে কাজল আপনি বলুন, আমি এখনো ডিভোর্স দিইনি। তাও আপনি ওকে বিয়ে করবেন? কেন, টাকার লোভে, বাংলো বাড়িটার লোভে...?

লক্ষ্মী কথা বলতে বলতে হাঁফাচ্ছিল।

আন্নু বলল, টাকা বাড়ি ওসব আপনারই থাকবে, কাজলের কিচ্ছু চাই না। যাই হোক আপনি কি করে জানলেন যে কাজল এখানে আছে?

এক পুলিশ অফিসার বললেন, তাকে আমি চিনি না।

আন্নু বলল, শুনুন লক্ষ্মী দেবী, অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর কাজলের ফেরার রাস্তা নেই। কাল বিয়ে আর আজ আপনি এসে বলছেন আপনি ডিভোর্স দেননি এখনো—

গায়ত্রী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কিন্তু ডিভোর্স চেয়েছেন। অর্জুনের কাছে আপনার উকিলের চিঠি পৌঁছে গিয়েছে—। আপনি please চলে যান এখন,

কাজল already very disturb.

লক্ষ্মী ভেতরে ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

কাজল এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। তাকে আলোছায়া অস্পষ্ট একটা মানুষের অবয়ব বলে মনে হলেও তার দিকে তাকিয়েই কথা বলছিল লক্ষ্মী।

গায়ত্রী বলল, বিয়ের পরেই ওরা বিদেশে হনিমুনে যাচ্ছে, পাসপোর্ট ভিসা সব রেডি, এসব আপনি জানেন?

মাথা নাড়লো লক্ষ্মী। এখন তার চোখের কোল ভিজে। বলল, আমি এখনো অর্জুনকে ভালবাসি, বিশ্বাস করুন। Please আপনি কাজলকে বুঝিয়ে বলুন এ বিয়ের কিছুতেই সুখের হবে না। আমার ছেলে এখনো আমাকেই চায়।

মিথ্যে কথা, কাল রাত্তিরে সে কাজলের কাছেই শুয়েছিল। এর মধ্যে আকাশ একবারও আপনার নাম করেনি, আপনার কাছে যেতে চায়নি।

লক্ষ্মী বলল, অর্জুনের জন্যে এ সব হয়েছে। He poisioned his mind.

আন্নু উকিলের দিকে এগিয়ে গেল, এই যে মশাই, আপনি কি চান ঠিক করে বলুন তো। আপনি আমার বন্ধুর বিয়েটা ভেঙে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন কেন?

উকিল লোকটির বেশ বয়েস হয়েছে। পরনে দামি সার্ট প্যান্ট। হাতে চামড়ার ব্রিফকেস। নাম অশোক ধর।

অশোক এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিল। তার ভূমিকা অনুযায়ীই অভিনয় করে যাচ্ছিল সে। সন্দীপ যা শিখিয়ে দিয়েছে তার বাইরে যায়নি সে।

আন্নুর কথার উত্তরে বলল, আমি আমার মক্কেলের ভালোর জন্যে যা করার করবো। তাতে যদি আপনার বন্ধুর বিয়ে ভেঙে যায় আমার কিছু করার নেই। তাছাড়া আমার client এখন ডিভোর্সের মধ্যেই যেতে চাচ্ছেন না। She wants to go back to her own home.

গায়ত্রী বলল, বাঃ বেশ বলেছেন তো, own home. কাল অবধি তো সেটা ছিল some body's home. অর্জুন নামের এক ভদ্রলোকের। সে কিন্তু ভালবেসে হ্যাঁ ভালবেসেই একদিন লক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে এনেছিল। এবং এখনো তাকেই—

আমিও এখনো অর্জুনকে ভালোবাসি—

লক্ষ্মীর চোখ থেকে টপ্ করে একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

আন্নু মুখোমুখি এগিয়ে এলো, ভালবাসেন, সত্যি এখনো অর্জুনকে ভালোবাসেন?

হ্যাঁ বাসি—

তাহলে এই উকিল ভদ্রলোককে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে বলুন।

লক্ষ্মী চোখ মুছে উকিলের দিকে তাকালো, আপনি যান। আর কক্ষনো আসবেন না। আপনার ফি আমি পাঠিয়ে দেব—

অশোক ধর যাবার আগে চোখ তুলে অন্ধকারের মধ্যেই বুঝতে পারলো, লক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে এখন হাসছে।

গলা তুলে গায়ত্রী বলল, কাজল, কাজল শোন, এখানে আয়।

কাজল লক্ষ্মী আর গায়ত্রী দু'জনের মধ্যে এসে নীরবে দাঁড়াল।

কাজল লক্ষ্মীকে বল্।

কি বলবো?

যা সত্যি তাই বলবি—।

কাজল স্পষ্ট স্বরে বলল, যা সত্যি তা তো এই কার্ডেই লেখা আছে।

আন্নু বলল, আসল সত্যিটা আমি বলছি—

এই বিয়ের চিঠিটা মিথ্যে, কাজলের বিয়েটা মিথ্যে। আকাশের ওর কাছে শোয়াটাও মিথ্যে।

মিথ্যে!

লক্ষ্মীর কাছে কথাগুলো হেঁয়ালীর মতন শোনাচ্ছিল— তাও সে হেসে ফেলল।

গায়ত্রী বলল, তোমাকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই এটা একটা প্ল্যান। কাজলের সঙ্গে অর্জুনের বিয়েটার মতও ছাপানো বিয়ের কার্ডটাও মিথ্যে। তোমার উকিলও সব জানেন। আমাদের কথা মতই নকল বিয়ের কার্ড নিয়ে তিনি তোমার কাছে গিয়েছিলেন।

লক্ষ্মীর মধ্যে যে ভাঙার খেলাটা এখনো চলছিল সেটা থমকে দাঁড়ালো। এক পলকের মধ্যেই আকাশ থেকে সব মেঘ উধাও। এখন একটা পরিপূর্ণ অটুট সূর্য উঠে আসছে লক্ষ্মীর শরীরের আকাশ থেকে। কপালে তার আভা পড়েছে।

গায়ত্রীর দুহাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল লক্ষ্মী।

আধঘন্টা পর।

এখন ল্যাম্প পোষ্টের মাথায় কয়েকটা আলো ছাড়া সমস্ত পার্কটাকে ঘিরে অন্ধকারের রাজত্ব। হাওয়ায় শুকনো পাতার ওড়াউড়ির শব্দকে দীর্ঘশ্বাসের শব্দের মতন শোনাচ্ছে।

তিনমেয়ে অন্ধকার গায়ে মেখে নির্বাক বসে আছে।

একটু আগে এইখানে যে মিলনান্তক নাটকে শেষ দৃশ্য অভিনীত হলো, তা নিয়ে কেউ চুলচেরা বিচার করেনি। তবু কেন যেন আন্নু আর গায়ত্রীর মনে হচ্ছে কোথাও তাদের একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। নিছক একটা খেলাকে খেলা জানার পরেও সত্যি ভেবে বসেছিল কাজল।

এখন সে অনেক বিষণ্ণ, ম্লান এবং আত্মনিপীড়নের ভারে পীড়িত।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অন্নু তাকে প্রশ্ন করলো, তুই এখন কোথায় যাবি কাজল?

জানি না।

আন্নু দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ছিল। কেন যে ভীষণ রাগ হচ্ছে তার, কিন্তু কার ওপর রাগটা তা বুঝতে পারছে না।

বলল, সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবি কাজল, তাও খবরদার পাখির বাসায় যাসনে।

অন্ধকারের মধ্যে কাজল মাথা নেড়ে কি বলল বুঝতে পারলো না আন্নু।

তার মনে হলো কাজল তাকে বলল, একটা মিথ্যেকেই সত্যি করে দিলি তোরা।

আরও কিছুক্ষণ পর হাঁটতে হাঁটতে হাত তুলে গায়ত্রী কাজলের কাঁধে রাখলো। আস্তে করে বলল, কাঁদিসনি কাজল, please.

(৪৪)

সকালবেলা তখনো ভালো করে ঘুম ভাঙেনি বাড়িটার। প্রায় নিঃশব্দে একটা পুলিশের জিপ এসে গেটের বাইরে দাঁড়াল। তারপর তার থেকে নেমে এলো সন্দীপ। তার পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম। কোমরে রিভলবার। মুখে নির্মম কঠোরতা।

গেটে শব্দ শুনে দারোয়ান চোখ ডলতে ডলতে সামনে এসে থতমত খেয়ে দাঁড়াল—এত সকালে বাড়িতে পুলিশ—!

পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, সেলাম দারোগা সাব।

জয়তি মেমসাব হ্যায়?

জী—

বোলাও উসকো—

দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে বলল, আইয়ে, অন্দর আইয়ে সাব—

বাড়িটা বইরে থেকে দেখেই বোঝা যায় এ বাড়িতে লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষণে কোনো কৃপণতা নেই।

সন্দীপ জয়তিকে দেখেনি। গায়ত্রী তার ফটো দেখিয়েছে।

মোটামুটি সুন্দরী। ঐশ্বর্যের কারণে একটু অহংকারী বলে মনে হয়েছে তার। অবশ্য সন্দীপের মতে মেয়েদের একটু অহংকার না থাকলে তাদের ঠিক মানায় না।

আন্নু সহজ সুন্দর। তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে। তেমনি তার অহংকারও আছে।

ড্রইংরুমে ঢুকে বসেনি সন্দীপ। দাঁড়িয়েই থাকলো। ঘরে পাতা নরম কার্পেটে তার বুট ডুবে গিয়েছে। সতর্ক কান কারুর পায়ের শব্দ শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।

প্রায় নিঃশব্দে তার সামনে যিনি এসে দাঁড়ালেন তিনি একটি রাশভারি প্রৌঢ়। নিখুঁত ইংরিজি উচ্চারণে বললেন, Good morning Inspector please be seated......

সন্দীপ বলল, Good morning. আপনি?

আমি জয়তির বাবা। আপনি জয়তিকে খুঁজছেন শুনলাম। বলুন কি দরকার?

সেটা আমি জয়তিকেই বলবো।

Anything serious?

Certainly.

আমাকে বলা যাবে না?

না। ঠিক আছে, আপনি বসুন, আমি জয়তিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সন্দীপ না বসে দাঁড়িয়েই থাকলো। মনে মনে ঝালিয়ে নিল জয়তিকে কি বলবে।

এক একটা মুহূর্ত এক একটা ঘন্টার মতন মনে হচ্ছিল। নিজেকে দেখে সন্দীপের নিজেরই অবাক লাগছিল। এর আগে কতো খুনী চোর ও ডাকাতের মোকাবিলা করেছে সে।

সেই সব মুহূর্তে নির্মম কঠোর এক পুলিশ অফিসার হিসেবে নিজের চেহারা দেখে এখনকার মতো নিজেই অবাক হয়নি সে। আজকের এই ভূমিকায় ঠিক ঠিক পাশ না করলে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাইজটা তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। সে প্রাইজের নাম অনুরাধা।

একটু পরে যে মেয়েটি ঘরে এসে তার সামনে দাঁড়াল তার সঙ্গে তার দেখা ছবির অনেক তফাৎ। বলতে গেলে কোনো মিলই নেই। নম্র ধীর এবং লাজুক। মাথার চুল এলোমেলো করে বাঁধা। পরনে তাঁতের ডুরে শাড়ি। সাদা ঘটি হাতা ব্লাউজ। এই কার্টিং এর ব্লাউজ এখনকার কোনো মেয়েই আর পরে না। জয়তি পরেছে।

জয়তি দুহাত তুলে বলল, আমার নাম জয়তি। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না।

না বসার দরকার নেই, সন্দীপ কথা বলতে বলতে কোমরের রিভলবারে হাত রাখলো, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করেই চলে যাবো।

বলুন কি কথা?

আপনি বীরুকে কতোদিন থেকে চেনেন?

বীরু, একটু থমকে থেকে জয়তি বলল, বীরু বলে আমি কাউকে চিনি না।

সন্দীপের চোয়াল শক্ত হলো। চোখের দৃষ্টিতে উঠে এলো ধিক্কার, চেনেন। এখন বলছেন চেনেন না। চারবছরে ধরে তাকে আপনি মোট চিঠি লিখেছেন একশো সাতষট্টি খানা। All love letters কতকগুলো চিঠিতে আপনি এমন সব কথা লিখেছেন যেগুলো husband wife ছাড়া লেখা যায় না।

জয়তিকে কথা বলতে বলতে একদৃষ্টে দেখছিল সন্দীপ। মনে মনে আশা করছিল, তার প্রথম কথাতেই ভেঙে পড়বে জয়তি। তার বদলে টান টান হয়ে তীব্র স্বরে তার কথার প্রতিবাদ করলো জয়তি, আপনি কি চাইছেন বলুন তো? আমি কোনোদিন কাউকে কোনো চিঠি লিখিনি।

সন্দীপ বলল, বাঃ, চমৎকার, আপনার বেশ সাহস আছে। ওই চিঠিগুলো ছাড়াও তিন এ্যালবাম ভর্তি ছবিও আমি সিজ করেছি। তার দু'একখানা ছবি আমার সঙ্গেই আছে। দেখবেন নাকি?

জয়তির মুখ চোখ লাল। গলার কাছে একটা শিরা জেগে উঠেছে। রাগলে এক একজনকে বেশি সুন্দর লাগে। মনে মনে জয়তির রূপের প্রশংসা করলো সন্দীপ। বলল, আমি জানতাম সব কিছুই আপনি অস্বীকার করবেন। Any way, আপনাকে আমি arrest করলাম।

এ্যারেস্ট শব্দটা শোনার পর জয়তি এমন ভাবে তাকাল যেন এই শব্দটা জীবনে প্রথমবার শুনলো সে।

কিন্তু মুখে বলল, আপনি আমায় এ্যারেস্ট করবেন বললেন, কিন্তু কেন? চিঠি লিখেছি বলে না ছবি তুলিয়েছি বলে?

কারণটা কি আপনি এখানেই শুনতে চান, থানায় গিয়ে শুনলে ভালো হতো না?

এখানেই শুনতে চাই। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে জয়তি। সন্দীপ বলল, বীরু সুইসাইড করেছে। চিঠিতে লিখে রেখে গিয়েছে আপনিই তার মৃত্যুর কারণ।

এক মুহূর্ত জয়তি শান্ত চোখ তুলে থাকলো। তারপর চোখ নামালো। তার ঠোঁট দুটো বার কয়েক কেঁপে উঠে স্থির হলো। আবার কাঁপলো।

এবার একটা ক্ষীণ শব্দ উঠে এলো। শব্দটা কান্নার নয়। অগাধ বিস্ময় এবং বিমূঢ়তার। হাত দুখানা দূরের একটা অবলম্বনকে ধরার বিফল চেষ্টায় শূন্যে উঠে আবার নামলো। জয়তির সারা শরীর এখন টলছে— তার পায়ের নিচে ভূমিকম্পের টালমাটাল। সেটাও সামলে নিল সে।

বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে কেঁদে ফেলল।

মিনিট পাঁচেক পরে জয়তি জিপে উঠে বসার পর সন্দীপ স্টিয়ারিং-এ হাত রাখলো। জয়তি একটু আগেও অঝোরে কাঁদছিল। এখন চুপ করেছে কিন্তু তার সর্বাঙ্গ জুড়ে এখন বোবা কান্না।

জিপ স্টার্ট করার ঠিক আগে জয়তির বাবা সামনে এগিয়ে এলেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো—

কোথায় যাবেন?

সন্দীপের কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্য।

ভদ্রলোক বললেন, থানায়।

সন্দীপ বলল, আমরা থানায় যাচ্ছি না, এখান থেকে সোজা লালবাজারে যাবো। তার আগে আপনার মেয়ে রিকোয়েস্ট করেছে, ও একবার বীরুর বাড়ি যেতে চায়। অবশ্য আমি জানি না বীরুর ডেডবডি এখনো বাড়িতেই আছে, না পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বীরুর কথা উঠতেই আবার হু হু করে কেঁদে উঠলো জয়তি।

সন্দীপ জিপে স্টার্ট দিয়ে বলল, ইচ্ছে করলে আপনি লালবাজারে যেতে পারেন।

তার কথার উত্তর শোনার জন্যে আর দাঁড়াল না সে। মুহূর্তের মধ্যে জিপ তাদের দুজনকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বীরুর বাড়ির সামনে একটা ছোটখাটো ভিড়। দুজন কনস্টেবল লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দীপের জিপখানা থামার আগেই বীরুর ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে নিঃশব্দে সরে এলো গায়ত্রী।

জয়তির দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সন্দীপ বলল, নেমে আসুন—

সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে জয়তির। তাও সে সন্দীপের হাত ধরলো না। একাই জিপ থেকে নেমে এলো।

লাশ এখনো বাড়িতেই আছে। সন্দীপ বলল, আপনি কিন্তু বেশি দেরি করবেন না। একবার দেখতে চেয়েছিলেন তাই আমি আপত্তি করিনি। যান, বীরুর ডেডবডি ওর নিজের ঘরেই আছে।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে দাঁড়াল জয়তি। পেছন ফিরে সন্দীপকে দেখল

একবার। সন্দীপ মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওপর থেকে নিচে নামছিল গায়ত্রী। দ'জনে এক মুহূর্তের জন্যে মুখোমুখি দাঁড়াল।

তুমিই জয়তি—গায়ত্রী তার হাত ধরলো। যাও, ওপরে বীরুদার মা আছেন—সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। গায়ত্রী নিচে নেমে গেল।

সিঁড়ির শেষে ছোট্ট একটা জায়গা। জয়তি দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিল। তাও তার বুক ভরলো না। মনে হলো এখুনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে সে। কিন্তু কিছু ঘটার আগেই দুখানি হাত তাকে টেনে নিয়ে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো, আয়, আমার সঙ্গে আয়। কাঁদিস না, আমায় দেখ, আমি তো বীরুর মা, আমি কি কাঁদছি...

বীরুর ঘরের দরজা ভেজানো।

অল্প ঠেলাতেই দরজা খুলে গেল। দরজার ভেতরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল জয়তি—

ঘরের মাঝামাঝি চেয়ারখানা থেকে উঠে দাঁড়াল বীরু। সলজ্জ মুখে বলল, এসো, এসো জয়তি। আমি মরিনি।

বীরুর মা নিঃশব্দে সরে গেলেন। জয়তি আবার কেঁদে উঠলো। একই সঙ্গে তার দু' চোখের হাসির আভায় রামধনু হয়ে গেল।

নিচে দাঁড়ানো জিপের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল গায়ত্রী আর সন্দীপ।

গায়ত্রী ব্যস্ত হয়ে বলল, আমাদের কাজ শেষ। চলুন এবার পালাই এখান থেকে।

পালাবে, সন্দীপ জিপের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বীরুর মা দু' টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি করে খাবার এনেছেন, সেগুলো কে খাবে?

ইস্, হাতঘড়িতে চোখ রেখে গায়ত্রী বলল, এতক্ষণ হাসিদি নিশ্চয় পৌঁছে গেছে, Please আমাকে একটু পার্কে পৌঁছে দিন, তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি—

সামান্য পরে জিপ চালাতে চালাতে সন্দীপ প্রশ্ন করল এতো তাড়াতাড়ি কিসের গায়ত্রী। তোমাদের তিনজনের কিন্তু আজ হোস্টেলে ফিরে যাবার কথা—।

ফিরে যাবার কথা—সন্দীপের কথাটাকে মুখে নিয়ে অন্য একরকম করে তাকাল গায়ত্রী। এবং সেদিকে তাকিয়ে সন্দীপের কেন যেন হঠাৎ যাযাবর পাখিদের কথা মনে হলো। কিছু না বলে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল সে।

পার্কের সামনে এসে জিপ থেকে নামতে নামতে গায়ত্রী দেখল পার্কের গা ঘেঁসে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির ড্রাইভারটিকে তার চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। একটু পরেই তার মনে পড়ে গেল এই লোকটার ট্যাক্সিতেই তারা সেদিন সল্টলেকে এসে নেমেছিল। গায়ত্রী খেয়াল না করলেও সন্দীপের চোখ দূর থেকেই ট্যাক্সির মধ্যে বসে থাকা মানুষ দুটিকে চিনতে পারলো।

দ্রুত পায়ে সেদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। গুডমর্নিং স্যার—

হর্ষবর্দ্ধন সোম তার দিকে না তাকিয়ে পাশে চোখ ফেরালেন, এবার নেমে পড়ুন মিস মেনন। চলুন, আপনার মেয়েদের আপনার হাতে হ্যান্ডভার করবো।

চোখে রুমাল চেপে ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন কংসাবতী মেনন।

গায়ত্রী একদিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল।

অনেকদূরে দুটো সচল বিন্দুর ওপর নজর পড়ল তার। বিন্দু দুটি ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসার পর আন্নু আর স্বরাজ হয়ে গেল।

(৪৫)

কাজল, কাজল কোথায়—

ব্যস্ত হয়ে সন্দীপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কংসাবতী, আমার আর একটা মেয়ে—।

সন্দীপ হতাশ হয়ে মাথা নাড়লো, জানি না, জানি না। পাখির বাসা বাড়িতে খোঁজ নিয়েছি। ওখানে কেউ নেই, তালা দেওয়া।

কাউকে নয়, আন্নুকে নিজেকে শুনিয়েই ফিস ফিস করে বলল, আমি জানি কাজল কোথায়। আমি জানি—

মিনিট কয়েক পরেই ঝড়ের বেগে একখানা মস্ত বিদেশি গাড়ি এসে জিপখানার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো অলকানন্দা। তারপর গায়ত্রীর একখানা হাত শক্ত করে ধরে বলল, আয়, আয়, শিগগির আয়, ইস কতো দেরি হয়ে গেল—

সোম গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন, একি হাসি, ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? ও আমাদের সঙ্গে হোস্টেলে ফিরে যাবে।

না বাবা, হাসি গায়ত্রীর হাত ছাড়লো না। গায়ত্রী কোনদিনই হোস্টেলে ফিরে যাবে না। ও আমাদের স্কুলে জয়েন করেছে।

তুমি, তুমি এ সব কি বলছো হাসি—,

সোম সাহেবকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। অসহায় চোখ তুলে তিনি গায়ত্রীর দিকে তাকালেন।

বড় গাড়িটা থেকে একটা রোগা এবং লম্বা বিদেশী যুবক নেমে এলো। তার পরনে প্যান্টের ওপর হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবী। সে সোম সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, গুড আফটার নুন স্যার। আই অ্যাম রবার্ট—

সোম সাহেব তার হাত ধরে নিঃশব্দে ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিলেন।

হাসি বলল, বাবা আমরা এখন বর্ধমান যাচ্ছি। গায়ত্রী কদিন দিদির ওখানেই

থাকবে। তারপর ফিরে এসে আমাদের নতুন স্কুলটায় জয়েন করবে। ওহো, তোমাকে তো বলাই হয়নি। আমরা ওয়াটগঞ্জে সেক্স ওয়ার্কারদের পাড়ায় আর একটা স্কুল খুলেছি।

গাড়িটা তাদের তিনজনকে নিয়ে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না।

মৌনতা ভাঙলেন স্বরাজ। এই নিন ম্যাডাম, আপনার মেয়েকে নিয়ে যান।

কংসাবতী দুপা এগিয়ে সন্দীপের ওপর চোখ পড়তে দাঁড়ালেন।

স্বরাজ আন্নুর একখানা হাত ধরতে গিয়েও ধরলেন না। বললেন, কখনো যদি তোর আমাদের কথা মনে পড়ে তাহলে চলে আসিস। আর তোর মাসি একটা কথা বলতে বলেছে, বলবো কিনা ভাবছি।

আন্নু তাঁর মুখের ওপর থেকে চোখ নামালো না।

স্বরাজ বললেন, তোদের বিয়ের পর বরকে নিয়ে অবশ্যই আসবি। জানিস, কাল কতো রাত্তির পর্যন্ত আমরা দুজনা মিলে স্বপ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। তখনো, তখনো জানতাম না তুই আর একজনকে....... ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোকে আর লজ্জা পেতে হবে না— আমি এখন যাই বুঝলি, সে মানুষটা বাড়িতে একদম একা আছে— স্বরাজ পা বাড়ালেন।

আন্নু চারপাশে তাকিয়ে কাউকে বোধহয় খুঁজলো।

তারপব ছটফটে গলায় কংসাবতীকে বলল, আমি এক্ষুনি আসছি ম্যাম।

কোথায় যাচ্ছো তুমি?

একজনের সঙ্গে দেখা করতে — পা বাড়িয়ে বলল আন্নু। দু তিন মিনিট হাঁটার পর গ্যারেজটার সামনে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় ডেকে উঠলো— বাবলু, বাবলু।

বাবলু বাইরে এসে দাঁড়াল, একি দিদি আপনি?

কাজল কোথায় বাবলু?

কাজলদি, বাবলু ঢোক গিলে বলল, কাজলদিকে আমি এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি......হ্যাঁ বিশ্বাস করুন, কাজলদি বলেছে ও কারুর সঙ্গে দেখা করবে না।

কাজল আমার সঙ্গেও দেখা করবে না?

না—

ঠিক আছে বাবলু, ওকে বলো আমি হোস্টেলে ফিরে যাচ্ছি। সাতদিন পর সেখান থেকে আর এক জায়গায় চলে যাবো। আমি কোথায় যাবো কাজল তা জানে। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে আবার পার্কের সামনে ফিরে এলো আন্নু। কংসাবতীকে বলল, চলুন ম্যাম।

সন্দীপের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো সে।

কংসাবতী সোম সাহেবকে বললেন, আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন স্যার, আপনাকে লালবাজারে নামিয়ে দিয়ে যাবো—

তাই চলুন, সোম সাহেব দুপা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, এই যে শোনো—

ডাকটা সন্দীপকে।

ইয়েস স্যার, সন্দীপ সামনে এগিয়ে এলো—

এক মুহূর্তের জন্যে সোম সাহেবকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি— স্টুপিড —

স্যার—

আমাকে বলছি হে, আমাকে — ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি হলো বলতো? ধ্যাৎ, আমি না সেদিন তোমাকে কলেজ স্ট্রীটে বিয়ের কার্ড কিনতে দেখে, থাকগে সে সব কথা, বুঝলে হে, আমরা পুলিশ, আমাদের সেন্টিমেন্টাল হতে নেই—

কথা বলতে বলতে পকেটে হাত পুরে ছোট একটা বাক্স বার করলেন হর্ষবর্দ্ধন, ধরো এটা—

বাক্সটা সন্দীপের হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুত পায়ে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে বললেন, চলো হে ব্রাদার।

ট্যাক্সিটা পার্কটাকে ঘুরে বড় রাস্তায় ওঠার পর সোম সাহেব পেছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন সন্দীপ একটা পাথরের স্ট্যাচু হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

স্টুপিড—! কংসাবতীর চোখে চোখ রেখে হেসে ফেললেন হর্ষবর্ধন। বললেন, আমাকে বললাম।

ট্যাক্সিটা তখন সত্তর কিলোমিটারের চেয়ে বেশি বেগে ছুটছে।

———